শারিয়া

শারিয়া কি বলে আমরা কি করি

হাসান মাহমুদ

SUBARNA

শারিয়া কি বলে
আমরা কি করি

হাসান মাহমুদ
ডিরেক্টর, শারিয়া আইন ও প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট,
মুসলিম ক্যানাডিয়ান কংগ্রেস

প্রথম প্রকাশ :
ফেব্রুয়ারী ২০০৭

শারিয়া কি বলে
আমরা কি করি
হাসান মাহমুদ

© লেখক

hasan.mahmud@hotmail.com
http://www.BanglarIslam.com

....
....
বর্ণ বিন্যাস : এ. এস. মণ্ডল, টরণ্টো, অন্টারিও, ক্যানাডা

SHARIA KI BOLEY, AAMRA KI KORI
By Hasan Mahmud

বাংলাদেশ পরিবেশক : ....
আমেরিকা পরিবেশক : ....
যুক্তরাজ্য পরিবেশক : ....

উৎসর্গ

যুগে যুগে যে সব সংখ্যাহীন
মা-বোনের জীবন ধ্বংস করা হয়েছে
করুণাময় স্রষ্টার নামে,
তাঁদের এবং
সেই দুর্গম পথযাত্রীদের উদ্দেশ্যে —

মুখবন্ধ

"ইসলাম ও শারিয়া" নামে এ বই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ফেব্রুয়ারী ২০০৭ সালে। গত তিন বছরে এর তিনটে সংস্করণ শেষ হবার জন্য আল্লাহ'র কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। "ইসলাম ও শারিয়া" নামটা এ বইয়ের বক্তব্যকে স্পষ্ট করে না ব'লে নূতন নাম দেয়া হলো "শারিয়া কি বলে, আমরা কি করি"। ফলে এর পেছনে সময় দেয়ার আগে সবাই স্পষ্ট ধারণা পাবেন ও সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন এ বইয়ের বিষয়বস্তু তাঁদের কাছে আকর্ষণীয় বা প্রয়োজনীয় মনে হয় কি না। এই সাথে "ইসলাম ও শারিয়া" নামে কোনো নূতন সংস্করণ বন্ধ করা হলো।

পৃথিবীতে ধর্মের নামে সন্ত্রাস বাড়ছে। মানবজাতির মন-মানস এখন তপ্ত সন্ত্রাসের দিকে নিবদ্ধ, যেমন নিউ ইয়র্কে টুইন টাওয়ার ধ্বংস, ইউরোপে ও মিসরে বাস-ট্রেনে, স্কুলে বা রিসর্টে হত্যাযজ্ঞ, অযোধ্যা ও গুজরাটে মুসলিম-নিধন, ভারত-বাংলাদেশে জঙ্গীদের বোমাবাজী, পাকিস্তানে একের পর এক মসজিদে গণহত্যা, ইরাক-আফগানিস্তানে আমেরিকা-বিলেতের গণহত্যা, ইত্যাদি। কিন্তু সেই সাথে ধর্মীয় আইনের নামে শীতল সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সংগ্রামটাও কম জরুরী নয়। এ সন্ত্রাসে রক্তপাত কমই হয় কিন্তু অনেক বেশি মানুষের জীবন ধ্বংস হয় ও ধর্মের বদনাম হয়। প্রতিটি দেশের সংবিধানে অত্যাচারের বিরুদ্ধে আইন আছে। কিন্তু সেই অত্যাচার যখন ধর্মের খোলস প'রে আসে তখন রাষ্ট্রীয় আইন পেছনে হ'টে আসে। এটা মুসলিম বিশ্বে যেমন সত্য, তেমন সত্য উন্নত ব'লে কথিত ইউরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়াতেও। এর অবসান হওয়া দরকার। বিশ্বমুসলিমকে বুঝতে হবে স্বামী যদি ইচ্ছেমতো বিয়ে-তালাক বা স্ত্রীকে প্রহার না-ও করে তবুও তার সে অধিকারটাই নারীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাস। এ বইতে দেখানো হলো কিভাবে ওসব নারী-বিরোধী সন্ত্রাস ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এবং কিভাবে আমরা কোরাণ-রসুলের আলোকে তা থেকে বেরিয়ে আসতে পারি ॥

সূচিপত্র

ইসলাম ও শারিয়া / ... ৮

সর্বনাশা বৃহস্পতি / ... ৯

পোহালে শর্বরী / ... ১১

চার বৌ / ... ১৩

নেত্রীত্ব ও নেতৃত্ব / ... ১৭

হিলা বিয়ে ও তাৎক্ষণিক তালাক / ... ২০

মুরতাদ-হত্যার পক্ষে বিপক্ষে / ... ২৩

শারিয়ার রজম (প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড) / ... ২৭

শারিয়ায় নারী-সাক্ষী / ... ২৯

ইসলামে সঙ্গীত / ... ৩১

ইসলামে স্ত্রী-প্রহার / ... ৩৪

নারীর মুসলমানি / ... ৪০

ইসলামে নারীর বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার / ... ৪৪

শারিয়া আইনের উদাহরণ / ... ৪৭

শারিয়া, শারিয়া আইন ও আমাদের ইমামেরা / ... ৫২

শারিয়া আইনের উৎস / ... ৫৫

আইনে আইনে বিরোধ / ... ৫৭

শারিয়া কি এখন অচল ? / ... ৫৯

শারিয়া কি অপরিবর্তনীয় ? / ... ৬১

ইসলামের নামে ইসলাম লঙ্ঘনের পদ্ধতি / ... ৬২

ব্যাখ্যার ভয়াবহতা / ... ৬৫

পৃথিবীর প্রথম গঠনতন্ত্র / ... ৬৭

পাকিস্তানের শারিয়া – বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ / ... ৭৩

শারিয়া – অতীতের দলিল / ... ৭৯

শারিয়া আইন কি বিশ্ব-মুসলিমের ঐতিহ্য ? / ... ৮২

শারিয়া আল্লার আইন হলে... / ... ৮৪

শারিয়াপন্থীদের যুক্তি / ... ৮৬

ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম ধর্মহীনতা / ... ৯২

আল্ কোরাণ / ... ৯৫

ইসলাম কি, মুসলমান কে / ... ৯৬

শারিয়া ইসলাম / ... ১০১

ইসলামে নারী-অধিকার ও "সুস্পষ্ট নির্দেশ" / ... ১০৫

সংবিধান ও ধর্মীয় রাজনীতি / ... ১১০

আমেরিকায় গ্রাউণ্ডজিরো মস্ক ও শান্তির মূল্য / ... ১১৪

লাব্বায়েক্ ! / ... ১১৬

"যাহারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে আমি তাহাদিগকে ক্রমান্বয়ে পাকড়াও করিব এমন জায়গা হইতে যাহা তাহারা ধারণাও করিতে পারিবে না" (আল্ আরাফ ১৮২) ।

ইসলাম ও শারিয়া

হাজার বছরের ওপর হয়ে গেল ইসলাম প্রচারকদের দেয়া শান্তির ইসলাম দিয়ে আমাদের পূর্বপুরুষেরা ইসলামি জীবন কাটিয়েছেন, কারো সাধ্য হয়নি এ-কথা বলার যে তাঁরা মুসলমান ছিলেন না বা কারো চেয়ে কম মুসলমান ছিলেন। তাঁরা নিজেরাও কখনো বলেননি বৃটিশের রাজত্বে মুসলমান থাকতে তাঁদের কোন অসুবিধে হয়েছে। কিন্তু এখন বাংলায় এক নূতন ধরণের ইসলাম শক্তভাবে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। এর অনুসারীরা বিশ্বাস করেন ইসলামি রাষ্ট্র না হলে পুরোপুরি ইসলাম পালন করা যাবে না, ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতেই সব নবী-রসুলেরা দুনিয়ায় এসেছিলেন, রাজনীতি হল ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, শারিয়া-আইন হল ইসলামের প্রাণ, শারিয়া-আইন প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক চেষ্টা না করলে আল্লাহ্‌কে খুশী করার "আর কি উপায় আছে আমি জানি না" (মওলানা মওদুদি) ইত্যাদি।

এই ইসলাম এবং আমাদের হজরত নিজামুদ্দীন আওলিয়া, মঈনুদ্দীন চিশতি, শাহজালাল, শাহ মখদুম, শাহ পরাণ, হাজী দানেশমন্দ বায়েজীদ বোস্তামীর ইসলামের নাম এক হলেও এ-দু'টো সম্পূর্ণ দুই ধরণের ইসলাম—এদের মধ্যে সংঘর্ষ আছে। একটা শারিয়া-ভিত্তিক ; অন্যটায় শারিয়া, রাষ্ট্র, ফতোয়া এ-সব নেই। সুফি-ইসলামের অনেক কিছুকেই শারিয়া-ইসলাম অনৈসলামিক ও ইসলাম-বিরোধী মনে করে। সে-জন্যই শারিয়া-ইসলাম সুফি-ইসলামকে আঘাত করে এবং শক্তি পেলেই সে সুফি-ইসলামকে উচ্ছেদ করে দেবে। এ নিয়ে আলোচনা করা দরকার কারণ যা কিছু দিয়ে জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় সে-সব নিয়ে ক্রমাগত আলোচনার দরকার আছে যেমন ওষুধ, দ্রব্যমূল্য, রাষ্ট্র, আইন, অপরাধ, শাস্তি, আদালত, খাদ্য-ওষুধে ভেজাল ইত্যাদি। কারণ এ-গুলো দিয়ে জীবন মানবাধিকার রক্ষা হয় অথবা ধ্বংস হয়। মানবাধিকার তো কোন দর-কষাকষির ব্যাপার নয়, এমনকি ধর্মের নামেও নয়। তাই প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব দুনিয়ার যে-কোন জায়গার অন্যায়ের প্রতিবাদ করা। যে-কোন জায়গায় অন্যায় হলে তা সর্বত্র ন্যায়ের ওপর হুমকি। তাই আমরা বাংলাদেশে বসে প্যালেস্টাইন, কাশ্মীর, চেচনিয়া, গুজরাটের মুসলিম-নিধনের প্রতিবাদ করি, আফগানিস্তান-ইরাকে আমেরিকা-বৃটেনের হামলা-গণহত্যার প্রতিবাদ করি।

অন্যান্য ধর্মের মত ইসলামের নামেও কিছু অত্যাচার চিরকালই হয়েছে তা সবাই স্বীকার করেন। ভুলটা করেছে মানুষ, আর তার দায় পড়েছে ইসলামের ওপর। দলিল জানা নেই বলে সাধারণ মানুষ এ-অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে পারেন না। তাই আমি মূল ইসলামি কেতাব থেকে দু'পক্ষের কিছু দলিল দেখাব যাতে জনগণের মনে বিশ্বাসের শক্তি দৃঢ় হয়। মনে রাখতে হবে, "মানুষ তার স্রষ্টাকে তুষ্ট করতে যত সার্বিকভাবে ও যত উল্লাসের সাথে মানুষের ওপর নিষ্ঠুরতা করেছে ততটা সে অন্য কোন কারণে করেনি" (প্যাস্কেল "?")। ভারতের মন্দির-রাষ্ট্র, ইউরোপের গীর্জা-রাষ্ট্র তার উদাহরণ। এইসব "স্রষ্টার সৈন্যেরা" কখনোই মানবতার ডাকে সাড়া দেয়নি, অত্যাচারিতের ব্যথা বোঝেনি। ওদেরকে সর্বদাই রাষ্ট্রীয় আইন ও গণরোষের কালবৈশাখী দিয়ে উৎখাত করতে হয়েছে। বাংলার ঈশানে সেই কালবৈশাখীর মেঘ এখন দ্রুত ঘনায়মান। তাই এ-ব্যাপারে দলিলগুলো দেখার দরকার আছে ॥

সর্বনাশা বৃহস্পতি

বৃহস্পতিবার।

সেই এসেছিল একবার, মধ্যপ্রাচ্যে, সাড়ে তেরোশো বছর আগে। শত সহস্র বছরে ওই মাত্র একটা দিন, যা সংখ্যা হয়েও সংখ্যা নয়। দলিলের উল্লেখে যা সর্বনাশা বৃহস্পতিবার। হাজার বছরের দূরত্ব থেকে এখনো জ্বলন্ত দু'চোখে তাকিয়ে আছে বিশ্বময় মুসলমানের দিকে। সে মহা-অভিশাপের হাত থেকে পরিত্রাণ নেই বিশ্বের দেড়শো কোটি মুসলমানের। এক থেকে দুই, দুই থেকে চার। জীবন্ত কোষের মতো শেষ পর্যন্ত ৭৩ খণ্ডে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর (দঃ)-এর স্বপ্ন – বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ব।

কি হয়েছিল সেদিন ? কেন এই বৃহস্পতিবারের কথা বলতে গিয়ে কেঁপে গেছে সাহাবীর বুক ? কোন্ সে স্মৃতির বুকফাটা বেদনায় সত্যি সত্যি চোখের পানিতে মরুভূমির পাথর ভিজিয়েছেন ইবনে আব্বাস ? কে, কারা সেই নেপথ্য নায়ক যারা ইতিহাস থেকে কিছু ঘটনা, কিছু নাম, কিছু নির্দেশ মুছে দিতে চেষ্টা করেছে ? না-ঘটা ঘটনা ইতিহাসে ঢুকিয়ে দিয়েছে ?

লোকের আনাগোনা সর্বক্ষণ মসজিদে নবীর সংলগ্ন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ঘরে। অন্যান্য স্ত্রীদের অনুমতি নিয়ে সেখানে রয়েছেন আল্লাহ্‌র হাবিব (বন্ধু)। মৃত্যুশয্যায় শায়িত। কত কথা তাঁর মনে তখন। কত কত ঘটনা পেছনের তেষট্টি বছরে ! সেই ছোটবেলায় পশু চরানো, হেরা পাহাড়ের গুহায় সাধনা, সেই বক্ষ বিদারণ, সেই নবুয়ত প্রাপ্তি, সমাজের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ অত্যাচার, সেই অবরোধ। সেই তায়েফ, সেই হিজরত, বদর খন্দক ওহুদ, ইস্পাত-কঠিন সাহাবীদের সেই ৯৮টি যুদ্ধ, সেই হোদায়বিয়া, সেই বায়াতে রিজওয়ান। সেই মেরাজ, সেই বিদায় হজ্ব। সেই প্রাণবন্ত প্রশ্ন – 'আমি কি মহান আল্লাহ্‌র বাণী তোমাদেরকে পৌঁছাতে পেরেছি ?' লক্ষ লক্ষ কণ্ঠের সেই প্রাণবন্ত জবাব – 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, ইয়া রসুলুল্লাহ !' পরিতৃপ্ত পয়গম্বরের (দঃ) সেই দু'হাত তুলে প্রার্থনা – 'ইয়া আল্লাহ্‌, তুমি সাক্ষী থাকো।'

সেই সাধনা আজ সফল। প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে ইসলামি দর্শন। নিজের রক্তে গড়া সদ্য জন্মানো মেয়েকে বালুতে পুঁতে ফেলা জাতটা আজ জামাতে নামাজ পড়ছে। একে অন্যের যত্ন নিচ্ছে। বজ্রনির্ঘোষে 'আল্লাহু আকবর' হুঙ্কারে সংখ্যাগরিষ্ঠ শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। পরাজয় শব্দটা অভিধান থেকে মুছে দিয়েছে।

কিন্তু তবু কাঁটা বিঁধে থাকে মনে। অলক্ষ্যে ঘনিয়েছে মেঘ। অপেক্ষা করে আছে হিংসার কালনাগ। ওৎ পেতে আছে ক্ষমতার রাজনীতি। পর্দার আড়ালে প্রস্তুত হচ্ছে নট-নটি। এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছে কালবৈশাখী। তাঁর এত সাধের, এত পরিশ্রমের সৌধ—বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ব—ভেঙ্গেচুরে ছিন্নভিন্ন করে ধূলায় মেশাবার জন্য সে বদ্ধপরিকর। কেউ জানে না, শুধু জেনেছেন সেই অমিতজ্ঞানী। বিজয়দীপ্ত ইসলামের সামরিক দুর্ধর্ষ অগ্রগতি সবাই দেখছে। কিন্তু তার ভিত্তিপ্রস্তরে ওৎ পেতে বসে আছে যে কালসাপ, তা নির্ভুল ধরা পড়েছে শুধু তাঁরই অপরিমেয় ধীশক্তিতে। তাই তিনি উদ্বিগ্ন। জীবনের শেষ বছরগুলোতে তাই তিনি ব্যাকুল হয়ে কতবার কতভাবে সুস্পষ্ট আদেশ দিয়েছেন – "খবরদার, নিজেদের মধ্যে মারামারি খুনোখুনি করবে না। মনে রেখো, প্রত্যেক মুসলমান তোমার ভাই। তার রক্ত তোমার জন্য হারাম।"

ফিরে তাকালেন পয়গম্বর (দঃ)। ঘরের মধ্যে লোকজন, বিশ্বস্ত সাহাবীরা। আদেশ করলেন লিখবার সাজ সরঞ্জাম নিয়ে আসতে। কিছু একটা মনে হয়েছে তাঁর। মুখের কথা নয়, একেবারে লিখে দিয়ে যেতে চান তিনি। তিনি বললেন – 'যাতে তোমরা কখনো ভুল পথে না যাও' (সূত্র দেখুন)। সময় আর বেশি নেই। যা-কিছু শেষ নির্দেশ, গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরি, তা এর মধ্যেই দিয়ে যেতে হবে মুসলিম উম্মাকে।

— 'না !'

কে ? স্তম্ভিত ঘুরে দাঁড়ালেন ঘরের সাহাবীরা। কে কথা বলছে ! ঐ তো, হযরত ওমর (রাঃ)। ইসলামের সর্বোচ্চ সাহাবীদের একজন। প্রবল আপত্তিতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছেন তিনি। পয়গম্বর (দঃ)-কে লিখবার সরঞ্জাম দেয়া যাবে না। রোগের প্রকোপের ওপর লেখালেখি করতে গেলে শারীরিকভাবে আরো কষ্ট পাবেন। হজরত ওমর বললেন, 'লেখালেখির দরকারই বা কি, কোরাণ শরীফই তো আমাদের জন্য যথেষ্ট।' অবধারিত সমর্থক দাঁড়িয়ে গেলেন কয়েকজন। অবধারিত বিপক্ষে দাঁড়িয়ে গেলেন কয়েকজন। নবী (দঃ) চেয়েছেন, তা-ই যথেষ্ট। কাগজ দিতেই হবে। কষ্ট হবে কি হবে না তা বিচার করার তুমি কে ? শুরু হল চিৎকার, ঝগড়া, হট্টগোল। দিতেই হবে কাগজ। না, দেয়া যাবে না কাগজ। চিৎকার। চিৎকারের বিরুদ্ধে চিৎকার। অসুস্থ পয়গম্বর (দঃ)-এর ঘরে, তাঁর চোখের সামনে। চিন্তা করা যায় ! অমান্য হয়ে গেল পবিত্র কোরআনে আল্লার সুস্পষ্ট আদেশ – নবী (দঃ)-এর চেয়ে উঁচু গলায় কথা না বলতে। তাহলে সমস্ত কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং 'তোমরা টেরও পাবে না' (সুরা আল হুজরাত আয়াত ২)।

এরপরই যে দু'টো ঘটনা ঘটলো তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মুসলমানদের বিশ্বজোড়া

সামাজিক-ধর্মীয় বিবর্তনে এসব ঘটনার প্রভাব অসামান্য। হট্টগোলে বিরক্ত হয়ে নবীজী (দঃ) বললেন সবাইকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে। নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন সবাই। কেউ একটিবারও বললেন না যে এ-অবস্থায় তাঁকে ছেড়ে যাওয়া ঠিক নয়। কেন ? লিখিত নির্দেশে এমন কি অসুবিধে ছিল যা ঘর ছেড়ে যাবার বেলায় ছিল না ?

না, কোন জবাব নেই এ প্রশ্নের।

আর তারপর। কাগজ কলম দেয়া হল না বলে যে নির্দেশ লেখা গেল না, উম্মতের জন্য 'যাতে তোমরা কোনদিন পথভ্রষ্ট না হও'-এর মত চরম নির্দেশ না দিয়েই কি চলে যাবেন সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর (দঃ) ? তাই কি হয় ? না, হয় না। তাই (সূত্র দেখুন) সেই হট্টগোলের ঘটনার পরে, হুজুর (দঃ) সবাইকে কাছে ডাকলেন। তিনটে নির্দেশ দিলেন। সাহাবী বলছেন নবীজীর নির্দেশ —

- আরব উপদ্বীপ থেকে অমুসলমানদের সরিয়ে দিতে হবে।
- অন্য দেশের দূত-প্রতিনিধিদের ঠিক তাঁর দেখানো উদাহরণ অনুযায়ী সম্মান ও আতিথেয়তা দেখাতে হবে।
- তিন নম্বরটা মনে নেই। ভুলে গেছি।

কি-ঈ !! ভুলে গেছেন ?? যে পয়গম্বর (দঃ)-এর সামনে শতবার 'ইয়া রসুলুল্লাহ্ ! আপনার জন্য আমার পিতামাতা কোরবান' বলেছেন সেই রসুলুল্লাহ্ (দঃ)-এর মাত্র তিনটে কথার একটা ভুলে গেছেন ? সাধারণ অবস্থায় নয়, মৃত্যুশয্যার মাত্র তিনটে নির্দেশের একটা ভুলে গেছেন ! যে আপনাদের প্রচণ্ড স্মৃতিশক্তি ইতিহাসে বারবার প্রশংসিত, যে আপনারা শুনে শুনে মুখস্থ রেখেছিলেন বিশাল কোরাণ শরীফ, সেই আপনারা জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের শেষ সময়ের মাত্র তিনটে কথার একটি ভুলে গেছেন ?

না, আপনারা ভোলেননি। কোন মানুষের পক্ষে এটা ভোলা সম্ভবই নয়। কোন এক ক্ষমতাধরের স্বার্থে সেটা আপনাদের ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। মুখে তালা লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। হুজুর (দঃ)-এর মৃত্যুর পর শত শত বছরের রাজনীতিগুলো, লক্ষ লক্ষ মুসলমানের লাশ, কাবাশরীফের জ্বলন্ত চাদর আর ভাঙ্গা দেয়াল, পর পর তিন খলিফার খুন, কারবালার রক্তস্রোত, রমজান মাসে মুসলমান-মুসলমানের লড়াই-যুদ্ধ, এসবের দিকে তাকালে যে কোন লোক বুঝতে পারবে সত্য 'ভুলে যাওয়া' কাকে বলে।

যেমন আপনারা ভুলেছেন সেই তিনশো জনের নাম-ধামের তালিকা (বাংলা বোখারী – আজিজুল হক, ১ম খণ্ড পৃঃ ২৬৭)। 'আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিপর্যয় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী যত দলপতি দুনিয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত হইবে, যাহার দলে মাত্র তিনশত বা কিছু বেশি লোকও হইবে এরূপ একজন দলপতিকেও রসুলুল্লাহ্ (দঃ) বাদ দেন নাই। ঐরূপ প্রত্যেকজনের নাম, তাহার পিতার নাম, এবং তাহার গোত্রের নামও রসুলুল্লাহ্ (দঃ) বয়ান করিয়া গিয়াছেন।' এমনই অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ তালিকা আমাদের দিয়ে গেলেন আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ পথ-প্রদর্শক, সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু পয়গম্বর (দঃ)। এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ দলিল, চিহ্নিত শত্রুর তালিকা, সেটা কোরাণ শরীফের মতো দলিলবদ্ধ হয়ে পৃথিবীময় ছড়ালো না কেন ? কোন্ সে গদিনসীন শক্তিধরের নাম সে তালিকায় ছিল বলে, তার অসুবিধে হবে বলে সে দলিল লুকিয়ে ফেলা হয়েছে ? বাংলাদেশের জীবনমরণ মুক্তিযুদ্ধে কোন্ কোন্ চেনামুখের নাম সে তালিকায় থাকার সম্ভাবনা ছিল ?

কোনদিন, আর কোনদিনই সে দলিল পাওয়া যাবে না। যেমন পাওয়া যাবে না একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের আসল ইতিহাস যদি বাংলাদেশের সরকারি ক্ষমতায় আল্‌বদর থাকে ১৪০০ বছর। এজিদের বাবা মাবিয়া থেকে শুরু করে হাজার বছর খেলাফতের নামে রাজত্ব করেছে রাজা-বাদশারা। তখনি দরকার হয়েছে ইতিহাস বদলানোর। তাই, কোনদিন পাওয়া যাবে না ইসলামের, মুসলমানের শত্রু সেই তিনশো মোনাফেকদের তালিকা। আর পাওয়া যাবে না সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল (দঃ)-এর অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ সেই নির্দেশ – 'যাহাতে কোনদিন তোমরা পথভ্রষ্ট না হও', সেই সর্বনাশা বৃহস্পতিবারে। যে নির্দেশ লিখতে চেয়েও লিখতে দেওয়া হয়নি। বলে যাওয়ার পরেও 'ভুলে যাওয়া' হয়েছে।

কি হতে পারে সেই হারিয়ে যাওয়া রত্নগুলো ?

প্রধান সূত্র ঃ-
সহি বোখারি – বাংলা অনুবাদ – মওলানা আজিজুর হক (১ম খণ্ড পৃঃ ২৬৭)।
সহি বোখারি – ইংরেজী অনুবাদ – মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ মোঃ মহসীন খান (১ম খণ্ড – হাদিস নং ১১৪; ৪র্থ খণ্ড – হাদিস নং ২৮৮ এবং ৩৯৩)।
অন্যান্য সূত্র ঃ-
আশারা মোবাশশারা – মওলানা গরীবুল্লাহ ইসলামাবাদী।
মৃত্যুর দুয়ারে মানবতা – মওলানা আবুল কালাম আজাদ।
সুন্নত ও বিদয়াত – মওলানা মুহম্মদ আব্দুর রহিম – পৃঃ ৪৭।
ইসলাম ও মুসলমানের ইতিহাসের অন্যান্য বই।

পোহালে শর্বরী

মরুভূমি।

ধু-ধু বালু, এ-দিগন্ত থেকে ও-দিগন্ত। উত্তপ্ত মধ্যপ্রাচ্য। শত সহস্র বছর ধরে প্রচণ্ড মার্তণ্ড দহনে জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে তার মাটি। মাঝে-মধ্যে ধূসর সবুজ পাতার কাঁটাভরা কিছু বাবলা গাছ, তৃণগুল্ম। কিছু কীট-পতঙ্গ। আশ্চর্য! দিক দিগন্তরে এ-জ্বলন্ত মৃত্যুর মধ্যেও প্রবল বিদ্রোহে ওরা ধরে রেখেছে জীবনের চিহ্ন। এরই নাম প্রাণ। শত মৃত্যুর মাঝেও মাথা তুলে উঠে দাঁড়ায়। হাসে, কাঁদে, খেলা করে। আবার চারধার থেকে কালনাগিনীর ফণা তুলে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যু। পলকের জন্য হার মানে জীবন। তারপর সময় সুযোগ বুঝে স্বর্গীয় শিশুমুখের নির্মল হাসিতে আবার উঠে দাঁড়ায়, আবার অলঙ্কৃত করে বন্ধ্যা ধরণী। শাশ্বত একটা বৃত্তাকার গল্প।

এগিয়ে চলেছে একটা সুখী কাফেলা। মদিনা থেকে চলেছে মিশরের দিকে। পরিতৃপ্ত আরব বেদুইনের দল। মিশরের নতুন গভর্নর হিসেবে খলিফা হযরত ওসমান (রাঃ)-এর স্বাক্ষরিত খেলাফতের স্ট্যাম্প লাগানো নিয়োগপত্র নিয়ে কাফেলা সহ চলেছেন সাহাবি মুহম্মদ (রাঃ)। প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর ছেলে তিনি। সময়টা সুবিধের নয়। বিশাল ইসলামি রাষ্ট্র। মিশর থেকে ইরাক, সিরিয়া থেকে ইয়েমেন, এখানে ওখানে ঘনীভূত হচ্ছে ঘন কালো মেঘ। আকাশে জমে উঠছে সর্বনাশা বজ্র। এর কথাই কি বলে গিয়েছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর (দঃ)? হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন বার বার? সাবধান! সাবধান! মুসলমান তোমার ভাই। তার রক্ত হারাম তোমার জন্য। সাবধান!

চলছে কাফেলা। তিসরি মঞ্জিল পেছনে ফেলে। নিয়োগপত্র হাতে নূতন গভর্নর মুহম্মদ (রাঃ) ভাবছেন, মিশরের বর্তমান গভর্নর আবদুল্লাহ বিন সাদ তাঁর পদচ্যুতিকে কিভাবে নেবেন। এই সেই আবদুল্লাহ বিন সা'দ, যিনি ছিলেন নবীজীর ওহি লেখক, যিনি ইসলাম ছেড়ে মুরতাদ হয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন মক্কায়। নবীজী তাঁকে কোন শাস্তি দেননি, তিনি পরে আবার মুসলমান হয়েছিলেন। তিনি কি খলিফার নির্দেশ মাথা পেতে নেবেন? নাকি এখানে ওখানে ধূমায়িত হচ্ছে যে বিক্ষোভ, অসন্তোষ, সেই দলে গিয়ে যোগ দেবেন? যা দিনকাল পড়েছে, কাউকেই আগের মতো ভরসা করে উঠতে পারা যায় না। খারাপ, খুব খারাপ সময় এখন।

দূরে কে ঐ যায়? একলা একটা উটে একা একজন লোক! এত দ্রুত তো উট চালায় না কেউ! দুস্তর মরুভূমিতে একা কেউ এভাবে সাধারণতঃ যাতায়াত করে না। পথ হারাবার ভয়, অসুস্থ হবার ভয়। ধরে আনা হলো লোকটাকে। পকেট থেকে বেরুল খলিফা হযরত ওসমান (রাঃ)-এর আরেকটি সনদ। মিশরের বর্তমান গভর্নর আব্দুল্লাহ্‌র প্রতি। তাতে লেখা আছে, নূতন গভর্নরের নিয়োগপত্র নিয়ে তোমার ওখানে যাচ্ছে হজরত আবু বকরের ছেলে মুহম্মদ বিন আবু বকর। পৌঁছামাত্র তাকে যেন হত্যা করে ফেলা হয়। যে কোন প্রতিবাদকারীকে অবিলম্বে যেন বন্দি করা হয়। এটাতেও খলিফার সরকারী স্ট্যাম্প-মোহর লাগানো। এটাতেও খলিফা হযরত ওসমান (রাঃ)-এর স্বাক্ষর।

পুরো কাফেলা আকাশ থেকে পড়ল। তারপর পুরো আকাশটাই যেন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল তাদের মাথায়। এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা! এত বড় জঘন্য প্রতারণা! আগুন জ্বলে গেল বেদুইনের রক্তে। 'প্রতিশোধ' 'প্রতিশোধ' গর্জনে পেছনে মদিনার দিকে ছুটল কাফেলা। পথে যারাই পড়ছে সবাইকে দেখাচ্ছে দু-দু'টো উল্টো পরোয়ানা। যে-ই দেখছে, উন্মত্তের মতো যোগ দিচ্ছে কাফেলায়। মদিনায় যখন পৌঁছল, ক্ষুদ্র কাফেলা তখন জনসমুদ্রে রূপ নিয়েছে। ক্ষুব্ধ সে সমুদ্র সাইক্লোনের মতো এসে আছড়ে পড়ল মদিনার পথে পথে। ত্রস্তে বেরিয়ে এলেন নেতৃবৃন্দ – হযরত আলী (রাঃ), হযরত যুবায়ের (রাঃ), হযরত তাল্‌হা (রাঃ) এবং অন্যান্যরা। হাজার কণ্ঠের হুঙ্কার, হাজার তরোয়ালের বিদ্যুৎ চমকে 'বিশ্ব রহিল নিঃশ্বাস রুধি, নিভায়ে সূর্য্যতারা।'

চিৎকার করে উঠলেন নেতৃবৃন্দ, 'দাঁড়াও! লজ্জা করে না? জানো কার বিরুদ্ধে কথা বলছ? পয়গম্বর (দঃ)-এর দু-দু'জন কন্যার স্বামী যুন্নুরাইন তিনি। দুর্ভিক্ষে অনাহারক্লিষ্ট মুসলমানের মুখে এক হাজার উটের বয়ে আনা খাবারের দাতা তিনি। বদর যুদ্ধে যোগ না দিয়েও গণিমতের অংশীদার। বেঁচে থাকতেই আল্লাহ্‌র ঘোষণায় শহীদের মর্য্যাদাপ্রাপ্ত বেহেশতি তিনি। বহু জেহাদের প্রধান খরচ-বহনকারী, লক্ষ লক্ষ দিনার, হাজার হাজার উট হুজুর (দঃ)-এর পায়ে রেখে দেয়া সর্বত্যাগী ধনী সওদাগর। শুধু ওসমান নন, ওসমান বিন আফফান, ওসমান গণি তিনি। লজ্জা করে না?'

পলকের জন্য থমকে গেল সাইক্লোন। তাইতো! ওসমান তো অনেক আছে, কিন্তু যুন্নুরাইন তো ঐ একজনই! গণি তো ঐ একজনই!

কিন্তু চোখের সামনে হাতের মুঠোয় দু-দু'টো উল্টো সনদ আগুনের মতো জ্বলছে। তাকে তো আর অস্বীকার করা যায় না। স্বাভাবিকভাবেই খলিফার দরবারে ছুটল উত্তেজিত বিদ্রোহী দল। খলিফার সামনে খুলে ধরল দু'টো সনদ।

কি বলবেন হযরত ওসমান (রাঃ)? এত বড় বিস্ময়ের জন্য কি বিন্দুমাত্র প্রস্তুত ছিলেন সেই নম্রভাষী, বিনয়ী খলিফা? হতভম্ব হয়ে গেলেন, নির্বাক দু'চোখে তাঁর ফুটে উঠল অপার বিস্ময়। আমি? আমি করব এই জঘন্য প্রতারণা? নাউজুবিল্লাহ! রসুলুল্লাহ্ (দঃ)-এর দু-দু'টো মেয়ের জামাই হয়ে, ইসলামের জন্য সর্বত্যাগ করে, ইসলামের খলিফা হয়ে? ছি ছি ছি। নাউজুবিল্লা মিন জালেক্!

যা বুঝবার বুঝে গেল সবাই। আগে থেকেই টগবগ করে ফুটছিল বেদুইনের রক্ত। এবার তাতে তেল ঘি সব একযোগে পড়ল। হাজার তরোয়াল, হাজার বজ্রমুষ্ঠি উঠে গেল আকাশে। কোথায়, কে সেই শয়তান। কে সেই পাপিষ্ঠ ষড়যন্ত্রকারী, যে খলিফার সই জাল করে, সরকারী স্ট্যাম্প চুরি করি লাগিয়ে সর্বনাশা পরোয়ানা মিশরে পাঠাচ্ছিল, মুসলিম উম্মা'র মধ্যে আত্মঘাতি রক্তস্রোতের চেষ্টা করছিল। বসল তদন্ত কমিটি। ওই, ওই যে ধীরে ধীরে অন্ধকার ভেদ করে ফুটে উঠছে ষড়যন্ত্রকারীর চেহারা। হাজার হাজার

রক্তচক্ষু চলে এলো আরো কাছে, ভাল করে দেখবার জন্য। প্রথমে অস্পষ্ট, তারপর ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে অবশেষে প্রমাণিত হয়ে গেল সে চেহারা।

মারোয়ান। মারোয়ান বিন হাকাম। খলিফার চাচাতো ভাই। এবং তাঁর জামাইও বটে। আর সরকারী উপদেষ্টা। খলিফার বাড়িতেই তার অবস্থান। সে অবস্থানের পূর্ণ সুযোগই নিয়েছে সেই ঘরজামাই। খলিফার সই জাল করেছে, সরকারি স্ট্যাম্প চুরি করে লাগিয়েছে, মুসলমান সমাজে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার ষড়যন্ত্র করেছে।

বিদ্রোহীরা সগর্জনে অবরোধ করল খলিফার বাড়ি। হাজার কণ্ঠে চিৎকার উঠল 'মারোয়ানকে চাই। শয়তানকে চাই হাতের মুঠোয়।' আবার কেঁপে উঠল মদিনা। নেতৃবৃন্দ আপ্রাণ চেষ্টা করলেন সে ঝড় শান্ত করতে, কিন্তু বন্দী হবার ঝড় সে নয়। জীবনে এই প্রথম আলগা হয়ে গেল নেতাদের ও হযরত আলী (রাঃ)-এর নেতৃত্বের লাগাম। সে লাগাম ছিঁড়ে ছুটে বেরিয়ে গেল সাইক্লোন তার অনিবার্য ধ্বংসের দিকে। হাজার হাজার উন্মত্ত বিদ্রোহীদের দাবি, 'হয় মারোয়ানকে দাও, নতুবা সরে দাঁড়াও খলিফা পদ থেকে।' তাদের নেতৃত্বে রয়েছেন মুহম্মদ বিন আবুবকর, সাথে রয়েছে কেনানা, সওদান, এবং আমর।

এইখানে এসে থমকে গেছে ইতিহাস। থমকে যাব আমরাও। হযরত ওসমান (রাঃ) মারোয়ানকে বিদ্রোহীদের হাতে তুলে দিলেন না। বিচারও করলেন না, শাস্তিও দিলেন না। কেন ? জবাব নেই ইতিহাসে। সত্যের আড়ালে নিশ্চয়ই কোন সত্য লুকিয়ে আছে। বন্দিনী রাজকন্যার মতো এখনো হয়তো সে সত্য কোন আঁধারে অপেক্ষা করে আছে, কবে কোন রাজপুত্র এসে তাকে আলোর ভুবনে নিয়ে যাবে।

এদিকে ক্ষিপ্ত বিদ্রোহীদল দ্বারা ঘরবন্দি অনড় খলিফা, ওদিকে মক্কায় চলছে হজ্জ্ব। 'লাব্বায়েক, হে প্রভু ! তুমি ডেকেছ, এই যে আমি হাজির হয়েছি।' ভবিতব্য এড়াল না হযরত আলী (রাঃ)-এর চোখে। মদিনার বিদ্রোহের খবর ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে মক্কায়। হজ্জ্ব শেষ হলেই লক্ষ হাজীর বন্যা খলীফাকে রক্ষা করার জন্য পাগলের মতো ছুটে আসবে মদিনায়। হাতির পায়ের নিচে পিঁপড়ের মতো পিষে যাবে বিদ্রোহী দল। এটুকু বুঝবার মতো বুদ্ধি বিদ্রোহীরা রাখে। তাহলে তাদের সামনে একটাই খোলা পথ। শিউরে উঠলেন হযরত আলী (রাঃ)। দুই ছেলে হাসান-হোসেনকে পাঠিয়ে দিলেন তৎক্ষণাৎ। খলিফার বাড়ির সদর দরজায় তরবারি হাতে হিমালয় হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন ইসলামের সিংহ-তনয়রা। জোঁকের মুখে নুন পড়ল। সংখ্যায় মাত্র দুই কিন্তু ওজনে অসীম। বিশ্বের শুদ্ধতম রক্ত বইছে ওই দুই শরীরে। ওখানে হাত দিলে বিলক্ষণ অসুবিধা আছে। সাথে যোগ দিল হযরত তাল্হা (রাঃ) হযরত যোবায়ের (রাঃ)-এর ছেলেরাও।

প্রমাদ গুনল বিদ্রোহীরা। মক্কার বন্যা মদিনায় পৌঁছে গেছে প্রায়। আর সময় নেই। অলক্ষ্যে অট্টহাসি হাসল নিয়তি। অন্দর মহল লক্ষ্য করে চলল তীর। একটা তীর এসে আহত করল হযরত হাসান (রাঃ)-কে। এ-খবর বাইরে যাবার আগেই সক্রিয় হয়ে উঠল সন্ত্রস্ত বিদ্রোহীরা। পেছনের পাঁচিল টপকে ঢুকে পড়ল ভেতরে। নীচের তলায় তখন একা কোরাণ শরীফ পড়ছেন কোরাণ সঙ্কলনকারী হযরত ওসমান গণি (রাঃ)। বাকি সবাই ওপরের তলায়। বৃদ্ধ খলিফার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মুহম্মদ। ছোটবেলায় ওই কোলেই কত না খেলা করেছে সে। কি করে যে দিন বদলায় !

আক্রমণের মুখে বেদনার্ত খলিফা শুধু বলতে পারলেন, "ভাতিজা ! আজ তোমার বাবা বেঁচে থাকলে তুমি কি আমার সাথে এরকম করতে পারতে ?"

– "শুনিয়া মুহম্মদ লজ্জা পাইয়া চলিয়া গেলেন।" (একটা বইয়ের কথা)

– "শুনিয়া মুহম্মদ লজ্জিত হইয়া খলিফাকে ছাড়িয়া পিছু হটিয়া আসিলেন।" (আরেকটা বইয়ের কথা)

যাহোক, 'চলিয়া' গেলে তো ভালই, 'পিছু হটিয়া' এলেও অন্যেরা কি করল ? অস্ত্রের পর অস্ত্র বৃদ্ধ খলিফার অর্দ্ধাহার অনাহারক্লিষ্ট দুর্বল শরীর ছিঁড়ে ফুঁড়ে বেরিয়ে যেতে থাকল। তাঁর স্ত্রী হযরত নায়লা (রাঃ) চিৎকার করে ছুটে এলে তাঁর একটা আঙ্গুল কেটে মাটিতে পড়ল। সামনে তখনও খোলা রয়েছে পবিত্র কোরাণ। কোরাণের সঙ্কলনকারী যুন্নুরাইন হযরত ওসমান গণি (রাঃ)-এর পবিত্র রক্ত ছিটকে পড়ে ভিজিয়ে দিয়েছে সেই আয়াত – 'শুধুমাত্র আল্লাহ্-ই তোমার জন্য যথেষ্ট। তিনি শ্রোতা এবং বিজ্ঞ।' ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন।

দিগন্ত বিস্তৃত উত্তপ্ত মধ্যপ্রাচ্যে তখন ঘূর্ণিবায়ে হাহাকার করে ফিরছে লু হাওয়া। মরুভূমির প্রতিটি বালুকণা জেনে গেছে, এ তো সবে শুরু। অলক্ষ্যে বিশাল ফণা তুলে গত ছয় সাত বছর ধরে এধার ওধার দুলছিল যে কালনাগ, এ তার প্রথম ছোবল মাত্র। এরপর একের পর এক ক্রমাগত ছোবলে ছোবলে ছিন্নভিন্ন করবে সে মুসলিম উম্মা'র শরীর। এদিকে '৭১-এর আলবদরের মতো পালিয়ে গেছে মারোয়ান। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর রক্তাক্ত জামা আর হযরত নায়লা (রাঃ)-এ কাটা আঙুলও পাচার হয়ে গেছে সিরিয়ার গভর্নর মাবিয়ার কাছে। বাইশ বছর ধরে শক্ত শিকড় গেড়েছে মাবিয়া সেখানে। সে আঙুল, সে জামা আগুন জ্বালালো সিরিয়ায়। আগুন জ্বলল ইরাকে, মিশরে, ইয়েমেনে। ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ির মতো টগবগ করে ফুটতে লাগল মুসলিম বিশ্ব। একের পর এক চলল কালনাগিণীর মরণ ছোবল। নেমে এলো ঘোর অমানিশা, সঘন শর্বরী।

আর মারোয়ান ? তার কি হল ? সে কিন্তু মারা পড়েনি কারণ ফুল গাছের চেয়ে আগাছার প্রাণশক্তি অনেক বেশি। একটা সুন্দর প্রজাপতি অনেক সহজে মরে একটা অসুন্দর ইঁদুরের চেয়ে। বাংলার পলাশী যুদ্ধের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন – "বণিকের মানদণ্ড পেহালে শর্বরী, দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে।" আর, মুসলিম ইতিহাসে আমরা দেখি পাপিষ্ঠের পাপদণ্ড পোহালে শর্বরী, দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে।

হযরত আবুবকর, ওমর, ওসমান, আলী (রাঃ আনহুম)-এর পরে মুসলিম উম্মা'র অষ্টম খলিফার নাম – মারোয়ান বিন হাকাম। বিশ্বমুসলিমের নেতৃত্ব এই প্রথম চলে গেল ক্রিমিন্যালের হাতে, ১৪০০ বছর আগে। এখনো তার কিছুটা রয়ে গেছে ॥

চার বৌ

শারিয়ার তালাক এবং লেয়ান আইনে স্বামী তাৎক্ষণিকভাবে বৌকে তালাক দিতে পারে, কাউকে তার কারণ বলতে হবে না। আবার ওই শারিয়া আইনেই পুরুষ ইচ্ছেমত চারটে পর্যন্ত বিয়ে করতে পারে, কাউকে তার কারণ বলতে হবে না। অর্থাৎ সকাল-সন্ধ্যায় তালাক-বিয়ের নাটক চালিয়ে যাবার একটা চমৎকার ফ্রী লাইসেন্স দেয়া আছে স্বামীকে। লাইসেন্সটার ফায়দা অতীত-বর্তমানে অনেকে তুলেছেও বেশ। তার মানেই হল ব্যাপারটার মধ্যে কোথাও নিশ্চয়ই নারী-বিরোধী একটা ফাঁক আছে। যে নারীর মাথায় সেটা পড়ে বজ্রাঘাত হয়েই পড়ে। এ-আইনের ঘোর সমর্থকরাও নিজের মেয়ে-বোনের জন্য অবশ্যই অবিবাহিত বর খোঁজেন। তাতে করে আবারও প্রমাণ হল এতে নারীদের প্রতি অমানবিকতাও আছে। কিন্তু ইসলাম তো কোন অমানবিক প্রথাকে সমর্থন করতে পারে না। তাহলে ফাঁকটা কোথায় ?

ফাঁকটা বহুবিবাহে নয়, বহুবিবাহের পদ্ধতিতে। ফাঁকটা কোরাণের পুরুষতান্ত্রিক স্বার্থপর ব্যাখ্যায়। প্রতিটি মুসলিম নারীকে সারাটা জীবন এ-আশঙ্কা বা সম্ভাবনার মধ্যে কাটাতে হয় এটা অবশ্যই তাদের অপমান। এগুলো কোরাণের নির্দেশ হবার কথা নয়। সেজন্যই বহু মুসলিম দেশে শক্ত আইন করে বহুবিবাহকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। ওখানকার মওলানারা তো আর জেনেশুনে ইসলামের বিরুদ্ধে যাননি। যেমন সেনেগাল, মরক্কো, তিউনিসিয়া ইত্যাদি (WLUML পৃঃ ৭০)। ওসব দেশে বহুবিবাহ করতে গেলে রীতিমত সরকারের কাছে দরখাস্ত করতে হয়, তদন্ত হয়, তারপর অনুমতি মেলে বা দরখাস্ত নাকচ হয়। পাকিস্তানেও প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান এরকম কিছু আইন করেছিলেন (১৯৬১) যা এখনও বলবৎ আছে কিন্তু শুধু কাগজে-কলমে।

চলতি প্রথা কেন ইসলাম-বিরোধী তা দেখার আগে দেখা যাক অনিয়ন্ত্রিত চার বিয়ের সমর্থনে কি কি যুক্তি দেখান হয়।

১। মেয়েরা বাঁজা হতে পারে।
২। মেয়েদের এমন অসুখ হতে পারে যাতে শারীরিক সংসর্গ সম্ভব নয়।
৩। মাসে এক সপ্তাহ এবং বাচ্চা জন্ম দেবার ব্যাপারে লম্বা সময় ধরে মেয়েদের সাথে শারীরিক সংসর্গ সম্ভব নয়।
৪। মেয়েরা আগেই বুড়িয়ে যায়।
৫। পুরুষের শারীরিক চাহিদা নারীর চেয়ে ৯৯গুণ বেশী – বড়পীর সাহেবের বই "গুনিয়াতুত ত্বালেবীন" পৃঃ ৯৮।
৬। কোন কোন মেয়ে এটা পছন্দ করেন – (আমেরিকার বিখ্যাত ইসলামি নেত্রী আমিনা আস্‌সিলমির ভিডিও)।
৭। সমাজের ভালোর জন্য পাশ্চাত্যের উন্মুক্ত-যৌনতার চেয়ে এ-ইসলামি আইন ঢের ভালো।
৮। দুনিয়ায় মেয়েদের সংখ্যা পুরুষের চেয়ে বেশি।

১ ও ২ নম্বর কারণ দু'টো ধোপে টেকে না কারণ ওগুলো পুরুষের ক্ষেত্রেও হতে পারে। ৩ নম্বরটা কোন যুক্তিই নয়। ও-কারণটা পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ স্বামীদের ক্ষেত্রেও ঘটেছে, আমাদের বাবা-মায়ের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। কিন্তু তাঁরা ইন্দ্রিয়পালনের চেয়ে কবিতার মত নিজের পরিবার গড়ে তোলার আনন্দেই জীবন কাটিয়েছেন। ৪ নম্বরটা কুযুক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। ৫ নম্বরটা নিয়ে আলোচনা-বিতর্ক অর্থহীন। কে কার চেয়ে কত চাঙ্গা তা সংখ্যা গুনে বলা সম্ভব নয়। এর সাথে নারীর হরমোন ইঞ্জেকশন আর পুরুষের ভায়াগ্রা যোগ করলে ও-যুক্তির হালে আরোই পানি থাকবে না। ৬ নম্বরটার কথা মেয়েরাই ভাল বলতে পারবেন, তবে আমার ছোট বোনকে প্রশ্নটা করায় সে রান্না করার গরম হাতা নিয়ে সগর্জনে আমাকে তাড়া করেছিল। ৭ নম্বর এক-কথায় সেরে নিচ্ছি। কোন মুসলিম সমাজেই বহুবিবাহ দিয়ে কোনকালেই অবৈধ সম্পর্ক কমেওনি, বন্ধও হয়নি। সেই অবৈধ সম্পর্ক, আর পশ্চিমের অবাধ যৌনতা, এ-দু'টোই হল গিয়ে পচা ডিম। দু'টো পচা ডিমের মধ্যে কোন্‌টা বেশি পচা তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। পরীক্ষায় একশ'র মধ্যে পাঁচ পাওয়া ছাত্রের চেয়ে পঁচিশ পাওয়া ছাত্র "ঢের ভালো" কিন্তু দু'জনেই ফেল। পাশ্চাত্যের চেয়ে "ঢের ভালো" হবার জন্য ইসলাম আসেনি, চরম ভালো দাবি নিয়েই এসেছে।

এবারে ৮ নম্বর। জাতিসঙ্ঘের ১৯৬৪ সালের তালিকায় আছে কোরিয়া, রাশিয়া, বিলাত, ফ্রান্স, জার্মানী, চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী, এবং আমেরিকায় মেয়েরা গড়পড়তায় ৫২%, পুরুষ ৪৮% ("উয়োম্যান অ্যাণ্ড হার রাইট্‌স্" পৃঃ ২৪৬ – আল্লামা মুতাহ্‌হেরি)। কিন্তু এ-তত্ত্ব মানলে তো চার পর্যন্ত যাবার দরকারই নেই, ৫২কে ৪৮ দিয়ে ভাগ করলে যা হয় সেই ভগ্নাংশ বিয়ে করতে হয়। সেটা কিভাবে সম্ভব ? ইরাণের মত দেশে কি হবে ? কারণ ঃ "ইরাণ ব্যতিক্রম। সেখানে গত জরীপে পুরুষের সংখ্যা নারীর চেয়ে বেশি দেখা গেছে" (পৃঃ ২৪৭)। কিন্তু তবু ইরাণে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ তো নয়ই বরং গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মত মু'তা বিয়েও সরগরম চালু আছে। তাই, হিসেবে মিলছে না বলে ৮ নম্বরটা নিজে থেকেই বাতিল হয়ে যায়।

সতীনের সংসার মানে প্রায়ই নরক। তবু যেহেতু কখনো কখনো এটা ছাড়া চলে না তাই কোরাণ একে শর্ত-সাপেক্ষে অনুমতি দিয়েছে মাত্র একটা জায়গায়, সুরা নিসা'র ৩ নম্বর আয়াতে – "এতিমদের তাদের সম্পদ বুঝাইয়া দাও। খারাপ মালামালের সাথে ভালো মালামালের অদল-বদল করিও না। আর তাহাদের ধনসম্পদ নিজেদের ধনসম্পদের সাথে সংমিশ্রিত করিয়া তাহা গ্রাস করিও না। নিশ্চয় ইহা বড়ই মন্দ কর্ম।

আর যদি তোমরা ভয় কর যে এতিম মেয়েদের হক যথাযথভাবে পূরণ করিতে পারিবে না, তাহা হইলে সেই সব মেয়েদের মধ্য হইতে যাহাদিগকে ভাল লাগে তাহাদিগকে বিবাহ করিয়া নাও দুই, তিন বা চারিটি পর্যন্ত। আর যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে তাহাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত আচরণ বজায় রাখিতে পারিবে না তবে একটিই"।

আয়াত ১২৯ – "তোমরা কখনও নারীদিগকে সমান রাখিতে পারিবে না যদিও ইহা চাও" -এর ভিত্তিতে কিছু মওলানা চিরকাল দৃঢ়ভাবে দাবি করেছেন যে, কোরাণ বহুবিবাহ বাতিল করে এক স্ত্রী বহাল রেখেছে। কারণ "ন্যায়সঙ্গত" অর্থাৎ "আদ্ল"-এর মধ্যে প্রেম-ভালবাসাও অন্তর্ভুক্ত যা সমান ভাগে ভাগ করা যায় না। তাঁরা বলেন বিত্তশালী স্বামী চার বৌকে ওজনদরে সমান বাড়ি-গাড়ি দিয়ে রাখলেই বা কি ? সেখানে কি ভালবাসার তাজমহল গড়ে ওঠা সম্ভব ? ভালবাসা কি ভাগাভাগি করার জিনিস ? প্রেমে ভাগীদার গজালে তো মানুষ খুন পর্যন্ত করে ফেলে।

হাজার বছর ধরে নারী ছিল বস্তুসমান। ওরাও যে মানুষ, ওদেরও যে কিছু স্বপ্ন কিছু অধিকার থাকতে পারে তা শুধু পুরুষ কেন, নারীর মাথায়ও ছিল না। যত খুশি বিয়েতে অভ্যস্ত পুরুষ ওতে খারাপ কিছু দেখতেও পেত না। তাই আয়াত ৩ নাজিল হলে তারা কিছুটা ছাড় চেয়েছিল নবীজীর কাছে। কিন্তু তাদের এই আবদার পাত্তা দেয়নি কোরাণ, তখনই নাজিল হয় আয়াত ১২৭ – "আর তাহারা আপনার কাছে নারীদের বিবাহের অনুমতি চায়। বলিয়া দিন ঃ আল্লাহ তোমাদিগকে তাহাদের সম্পর্কে অনুমতি দেন এবং কোরাণে তোমাদিগকে যাহা পড়িয়া শোনানো হয় তাহা ঐ-সব পিতৃহীনা নারীদের বিধান যাহাদিগকে তোমরা নির্ধারিত অধিকার প্রদান কর না অথচ বিবাহ করিবার বাসনা রাখ।"

শব্দগুলো খেয়াল করুন – "বিবাহের অনুমতি চায়...যাহা পড়িয়া শোনানো হয়।" বিয়ে সম্পর্কে কি পড়ে শোনানো হয়েছে আগে ? শোনানো হয়েছে "সেই সব মেয়েদের মধ্য হইতে বিবাহ করিয়া নাও।" এই যে "সেই সব মেয়ে" – এরা কারা ? এরা "ঐ-সব পিতৃহীনা নারী" ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

পিতৃহীনা নারী মানে বাপ-মরা মেয়ে ছাড়া আর কিছুই নয়। ওহুদ যুদ্ধে অনেকে নিহত হলে এতিমের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল, তাদের স্বার্থরক্ষা করার দরকার ছিল। কিন্তু ইরাণের বা ক্যানাডার মেয়েকে বিয়ে করলে তো আর বাংলাদেশের এতিমের স্বার্থরক্ষা হল না। তারই সমাধান দিয়েছিল এই আয়াত। দেখুন মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ মুহসিন খানের বোখারি-অনুবাদ ৭ম খণ্ড, হাদিস ৩৫, ৫৯ ও ৬২। কিংবা দেখুন বাংলাদেশ লাইব্রেরীর প্রকাশিত আবদুল করিম খানের সঙ্কলিত সহি বোখারি পৃঃ ৬৭৮, হাদিস ২৪২৮। প্রতিটি শব্দ খুব খেয়াল করে পড়বেন ঃ –

"আয়েশা (রাঃ)-কে আয়াতটি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন – অনেক সময় এতিম মেয়ে ধনশালী ও সুন্দরী হইলে অভিভাবক নিজেই উপযুক্ত মোহর না দিয়া তাহাকে আপনার হওয়ার সুবাদে বিবাহ করে কিন্তু এতিম বালিকা ধনবান না হইলে বা সুন্দরী না হইলে সেইরূপ করে না। এই অন্যায় রহিত করণার্থেই এই আয়াত নাজেল হইয়াছে। **এতিম মেয়ে সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা নাজেল হওয়ার পর লোকেরা রসুল (দঃ)-কে শিথিলতার আশায় জিজ্ঞাসা করিলে পূর্ব কড়াকড়ি বহাল থাকার ঘোষণা করিয়া আয়াত নাজেল হইল (আয়াত ১২৭) – "তাহারা আপনার নিকট মেয়েদের সম্পর্কে মসআলা জিজ্ঞাসা করিতেছে। আপনি বলিয়া দিন, – আল্লাহ তোমাদিগকে তাহাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা দান করিতেছেন এবং পিতৃহীনা নারীগণ সম্বন্ধে** তোমাদের প্রতি কেতাব হইতে পাঠ করা হইয়াছে যে, তাহাদের জন্য যাহা বিধিবদ্ধ তাহা তোমরা প্রদান কর না এবং তাহাদিগকে বিবাহ করিতে বাসনা কর।" (উদ্ধৃতি শেষ)

"এই অন্যায় রহিত করণার্থেই এই আয়াত নাজেল হইয়াছে" কথাটার মানেই হল যেখানে "এই অন্যায়" নেই সেখানে খাটাবার জন্য কোরাণ এ-নির্দেশ দেয়নি। তাছাড়া – "তাহাদের জন্য যাহা বিধিবদ্ধ তাহা তোমরা প্রদান কর না "– এ-কথাটা দুনিয়ার অন্যান্য নারীর ক্ষেত্রে খাটে না কাজেই বহুবিবাহের নির্দেশটা এতিম বালিকাদের বাইরে খাটে না। খোদ আল্লাহ'র রসুল এই একই উদাহরণ রেখে গেছেন আমাদের জন্য। দেখুন একই বাংলা-সহি বোখারি, পৃঃ ৬৮৭, উদ্ধৃতি ঃ –

হাদিস ২৪৭২ – "আলী (রাঃ) আবু জহলের কন্যাকে বিবাহ করার পয়গাম পাঠাইয়াছে জানিতে পারিয়া ফাতেমা (রাঃ) রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর নিকট গিয়া বলিলেন – আপনার আত্মীয়স্বজনগণ বলিয়া থাকে যে আপনি আপনার মেয়েদের পক্ষ হইয়া একটু রাগও দেখান না। ঐ দেখুন আলী (রাঃ) আবু জহলের কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহিতেছে। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন...'নিশ্চয় ফাতেমা আমার কলিজার টুকরা। তাহার ব্যথায় আমি ব্যথিত হই। নিশ্চয়ই আমি হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল করিতে চাহি না। অবশ্য এই কথা বলিতেছি যে, আল্লাহর কসম ! আল্লাহর রসুলের কন্যা এবং আল্লাহর শত্রুর কন্যা একই ব্যক্তির বিবাহে একত্রিত হইতে পারিবে না।' এই ভাষণের পর আলী (রাঃ)বিবাহের প্রস্তাব পরিত্যাগ করিলেন।" এটা আছে মুহসিন খানের অনুদিত বোখারী ৪র্থ খণ্ড হাদিস ৩৪২ ও ৫ম খণ্ড হাদিস ৭৬।

এখানে বিবি ফাতেমা'র আপত্তি স্পষ্ট। কোরাণ অনিয়ন্ত্রিত বহুবিবাহ জায়েজ করলে তিনি অবশ্যই আপত্তি করতেন না। তাছাড়া "তাহার ব্যথায় আমি ব্যথিত হই" নবীজীর নিজের মুখের কথা। অর্থাৎ সতীনের ঘরে মেয়েদের ব্যথা আছে, নিশ্চয়ই আছে। যে-কারণে সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর আল্লাহ'র কসম খেয়ে "হারাম"-এর মত কঠিন শব্দে দ্বিতীয় বিয়ে নাকচ করেছিলেন, কি কারণ সেটা ? সে কি আল্লাহর শত্রুর মেয়ে এই কারণে ? না, তা অবশ্যই নয়। নীচে দেখুন ঃ –

হাদিস ২৪৭৩, সূত্র হজরত মেসওয়ার ইবনে মাখরামা (রাঃ)। "আমি রসুলুল্লাহ

(আঃ)-কে মিম্বরে বসিয়া বলিতে শুনিয়াছি – হিশাম ইবনে মুগীরা আলী ইবনে আবু তালেব (রাঃ)-এর নিকট তাঁহার মেয়ে বিবাহ দেওয়ার জন্য আমার নিকট প্রস্তাব করিয়াছে। কিন্তু আমি অনুমতি দিই নাই এবং আলী (রাঃ) আমার কন্যা ফাতেমা (রাঃ)-কে তালাক না দেওয়া পর্যন্ত আমি অনুমতি দিব না। কেননা ফাতেমা হইতেছে আমার শরীরের অংশ। আমি ঐ জিনিস ঘৃণা করি যাহা সে ঘৃণা করে এবং তাহাকে যাহা আঘাত করে তাহা আমাকেও আঘাত করে।" হাদিসটা এখানেও পাবেন, মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ মহসিন খানের অনুদিত সহি বুখারি, ৭ম খণ্ড, ১৫৭।

যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল বিশ্বনবী, দুনিয়ার প্রতিটি মুসলিম নারী তাঁর কলিজার টুকরা। তিনি তাঁর অনাগত অগণিত সমস্ত কলিজার টুকরাকে সতীনের সম্ভাবনায় ঠেলে দেবেন এবং নিজের মেয়েকে রক্ষা করবেন এমন ব্যাখ্যা যাঁরা দেন তাঁরা নবীজীর মর্যাদার খেলাফ করেন। বিবি ফাতেমা কোরাণের বিরুদ্ধে যাবেন এটাও অসম্ভব। এ-দু'টো মিলিয়ে আমরা কি পাচ্ছি ? মুগীরা নিজেই বিয়ের প্রস্তাব করেছিল কাজেই সে মেয়ে তখনো এতিম হয়নি, মুগীরা তখনো বেঁচেই ছিল। হজরত আলী অতুলনীয় মর্যাদা ও শান-এর অধিকারী বলেই বুঝি মুগীরা তাঁকে জামাই করতে চেয়েছিল। কিন্তু নবীজী অনুমতি দেননি। এটা জানার পরেও টাকাকড়ি-জমিজমা বা বাহ্যিক শান-শওকতের লোভে কোন লোভী পিতা তাঁদের আদরের কন্যাকে সতীনের ঘরে পাঠালে সেটা সরাসরি ইসলাম-বিরোধী হতে বাধ্য। শুধু টাকার জোরে কেউ শখের বহুবিবাহ করলে সেটাও ইসলাম-বিরোধী হতে বাধ্য। নীচে কয়েকটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ

১। এ.ভি.মীর আহমেদের কোরাণ-অনুবাদে ব্যাখ্যা ঃ "আয়াত ১২৭ সরাসরি আয়াত ৩-এর সহিত সম্পর্কিত। এইখানে নারীদের যে অধিকারের কথা বলা হইয়াছে উহা আয়াত ৩-এ বলা আছে, ... ইয়াতামান-নিসা অর্থ হইল "পিতৃহীনা বালিকা।"

২। "মওলানা ওমর আহমদ ওসমানীর মতে সুরা নিসার ৩ নম্বর আয়াতে বলা হইয়াছে শুধু পিতৃহীনা বালিকা ও বিধবার কথাই, অন্যান্য নারীগণের নহে। 'আল্ নিসা' শব্দের বিশেষ 'আল্' শব্দটি 'শুধুমাত্র ইয়াতাম' অর্থাৎ এতিমের নির্দেশ করে। নতুবা শুধু 'নিসা' শব্দটিই অন্যান্য নারীগণকে বুঝানোর জন্য যথেষ্ট ছিল। এই বিবাহ করিতে হইলে শুধুমাত্র বিধবা বা এতিমের মধ্য হইতেই করিতে হইবে। একমাত্র এই পটভূমিতেই বহুবিবাহের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।" (Women's Rights in Islam – Mohd. Sharif Chowdhury).

৩। "বহুবিবাহের অনুমতির প্রকৃতি কিছুতেই অবাধ নহে" – জাস্টিস আফতাব হোসেন। ("Status of Women in Islam").

৪। কোরাণের আয়াত ১২৯ – "তোমরা কখনও নারীদিগকে সমান রাখিতে পারিবে না যদিও ইহা চাও।" অন্যান্য আয়াতের পরে এর ভিত্তিতে কোরাণ বহুবিবাহ বাতিল করে এক স্ত্রী বহাল রেখেছে। কারণ "ন্যায়সঙ্গত" অর্থাৎ "আদ্ল্"এর মধ্যে প্রেম-ভালবাসাও অন্তর্ভুক্ত যা সমান ভাগে ভাগ করা যায় না।" আমীর আলী – স্পিরিট অব্ ইসলাম – ইউনিভার্সিটি প্রেস লণ্ডন, ১৯৬৪, পৃঃ ২২৯-২৩২।

অষ্টম শতাব্দীর কট্টরপন্থী খলিফা মুতাওয়াক্কিল যুক্তিভিত্তিক মু'তাজিলা মুসলিম সম্প্রদায়কে উচ্ছেদ করে সমাজকে যুক্তিহীন ভক্তিবাদের আত্মঘাতী পথে চালিত করেন। সেই গোলকধাঁধায় আমরা আজও এমনভাবে অন্ধ হয়ে ঘুরে মরছি যে আমাদেরই মা-বোনের অশ্রু চোখে পড়ছে না। অথচ শারিয়ার হাজার বছর আগের মানুষ কি গভীর মমতায়, কি কঠোর হস্তে মাতৃজাতিকে সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছিল তা দেখলে প্রশংসা না করে পারা যায় না। নিয়ন্ত্রিত বহুবিবাহের উদ্ধৃতি দিচ্ছি আসিরিয়ান (প্রায় ২০০০ থেকে ২৫০০ বছর আগে) ও ব্যাবিলনিয়ান হাম্মুরাবী আইন (প্রায় চার হাজার বছর আগে) থেকে – সূত্র ঃ ড্রাইভার অ্যাণ্ড মাইল্স-এর "ল'জ ফ্রম মেসোপটমিয়া অ্যাণ্ড এশিয়া মাইনর" এবং ওমস্টেড-এর "হিস্ট্রি অব্ আসিরিয়া"; উৎস আইনের অধ্যাপক ডঃ আনোয়ার হেকমত-এর "উইমেন অ্যাণ্ড দ্য কোরাণ" পৃঃ ১৫৩ ও ২৪১-২৪৩।

১। সাধারণ আইন ঃ

ক। যদি স্ত্রী সন্তানধারণ করিতে পারে তবে স্বামী তাহাকে তালাক দিতে পারিবে না।

খ। যদি স্ত্রী সন্তানধারণ না করে তবে স্বামী তাহার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারিবে কিন্তু স্বামী তাহাকে ঐ সকল কিছুই ফিরাইয়া দিবে যাহা কিছু সেই স্ত্রী বিবাহকালে আনিয়াছিল, এবং সারাজীবন স্ত্রীর খরচ বহন করিবে।

গ। যদি স্ত্রী সন্তানধারণ না করে তবে সে স্বামী বিবাহ করিতে পারে কিন্তু দ্বিতীয় স্ত্রী কোন ব্যাপারেই মর্যাদায় প্রথম স্ত্রীর সমান হইবে না।

ঘ। যদি স্ত্রী সন্তানধারণ না করে তবে সেই স্ত্রী স্বামীকে মাত্র একবার একটি দাসী উপহার দিতে পারে। যদি সেই দাসী সন্তানধারণ করে, তবে সেই ব্যক্তি দ্বিতীয় বিবাহ করিতে পারিবে না।

ঙ। যদি কেহ স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া উধাও হইয়া যায় তবে সে স্ত্রী যখন ইচ্ছা দ্বিতীয় বিবাহ করিতে পারিবে এবং প্রথম স্বামী ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীকে দাফব করিতে পারিবে না।

চ। স্ত্রী যদি বন্ধ্যা, পঙ্গু বা অনারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় তবে স্বামী অন্য নারীকে বিবাহ করিতে পারে কিন্তু প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত একই বাড়িতে থাকিবে এবং তাহার যত্ন লইবে।

ছ। স্ত্রী যদি অনারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় ও নিজের গোত্রে ফিরিয়া যাইতে চায় তবে স্বামী তাহাকে ঐ সকল কিছুই ফিরাইয়া দিবে যাহা কিছু সেই

স্ত্রী বিবাহকালে আনিয়াছিল।

এই হল মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার সত্যিকারের উদাহরণ, মুখে মিষ্টি উপদেশ আর আইনে হিংস্রতার ঠকবাজি নয়। তাই বুঝি ওরা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল তাদের সেই প্রাচীন সভ্যতাগুলোকে। ওরা জানত, মাতৃজাতিকে অপমান করে পঙ্গু করে জাতির উন্নতি অসম্ভব। কারণবিহীন শখের বহুবিবাহ এক মারাত্মক সামাজিক অভিশাপ। স্বামী বহুবিবাহ করুক বা না করুক, তার এই ফ্রী লাইসেন্সটাই নারীর অপমান। তাই, একে নিয়ন্ত্রণ করে কোরাণে ফিরে আসতে হবে। দেখুন একটা এলাকার চেহারা ঃ "বহুবিবাহ প্রথা আজও বিদ্যমান। এলাকায় বেশির ভাগ লোকের একাধিক স্ত্রী। যে-বছর গোলায় বেশি ধান মেলে নূতন বিয়ের আকাঙ্ক্ষাও বেড়ে যায়। বিয়ে করতে হবে এমন মানসিকতা বিরাজ করে। (প্রথম) স্ত্রী বাধা দিলে উচ্চারিত হয় তালাক" – পৃঃ ৬৩, ফতোয়া ১৯৯১-১৯৯৫ – শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, ঢাকা। নারী-নিপীড়নের এই অভিশাপ ইন্দোনেশিয়াতে সম্প্রতি ফিরে এসেছে "পলিগ্যামী রেস্টুরেন্ট"-এর চার-তরকারির খাবারে আর চালু হয়েছে চার টপিং দিয়ে 'পলিগ্যামী পিজা।' ঠাট্টা আর বলে কাকে !

অথচ বহুবিবাহকে আমরা মুসলিম দেশ সেনেগাল, মরক্কো, তিউনিসিয়ার মতো আইন দিয়ে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, ইজতহাদ করে আমরা বহুবিবাহের মধ্যে এতিম ছাড়াও অনাথ দরিদ্র নারী অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। তাতে ইসলামের নাম উজ্জ্বলই হবে। দুনিয়ার তাবৎ মুসলমান পুরুষ মহান হৃদয় নয়, এ কলিকালে বহু কুলাঙ্গার সব সমাজেই আছে। পুরুষ যেখানে পুরুষ, সেখানে নারীদেহে তার চূড়ান্ত স্বার্থ আছে।

কোরাণ সেটা জানে, রসুল সেটা বিলক্ষণ জানতেন। তাই তাঁরা নারী-অত্যাচারের ফ্রী লাইসেন্স কাউকে দেননি। আজ ইসলামের নামে যত অনৈসলামিক বিধান আমরা দেখি, সবগুলো নবীজীর অনেক পরে পুরুষতন্ত্রের বানানো ॥

নেত্রীত্ব ও নেতৃত্ব

বাংলাদেশে-পাকিস্তানে-ইন্দোনেশিয়ায় প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন বেগম শেখ হাসিনা, বেগম খালেদা জিয়া, বেগম বেনজির ভুট্টো, ও বেগম সুকর্ণপুত্রী। এতে মনে হতে পারে নারী-নেত্রীত্ব নিয়ে ইসলামে যে বিতর্ক ছিল তার সমাধান হয়ে গেছে।

কিন্তু ব্যাপারটা আসলে তা নয়। গত ১৮ই জানুয়ারী (২০০৬) ভয়েস অব্ আমেরিকা রেডিওর আলোচনায় আমার বিপক্ষে বাংলাদেশ জামাতের সিনিয়র অ্যাসিস্টেন্ট জেনারেল-সেক্রেটারী জনাব কামরুজ্জামান মিয়া অংশ নিয়েছিলেন। বলা দরকার, জামাতে ইসলামি বাংলাদেশের প্রধান ধর্মীয়-রাজনৈতিক দল, বেগম জিয়ার সংসদে এ-দলের দু'জন মন্ত্রী ছিলেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, শারিয়া-মোতাবেক জামাত বহু বছর ধরে নারী-নেত্রীত্বের বিরোধী ছিল কিন্তু তাহলে বেগম খালেদা জিয়ার প্রধানমন্ত্রীত্ব মেনে নিল কি করে। উনি জবাব দিয়েছিলেন – "পরিস্থিতির কারণে জামাত নারী নেত্রীত্ব মেনে নিয়েছে।" অর্থাৎ পরিস্থিতির কারণে যদি এতকালের হারামকে যাঁরা হালাল করেছেন, ভবিষ্যতে তাঁরা আবারও পরিস্থিতির কারণেই সে হালালকে হারাম করবেন। এবং সেই পরিস্থিতি কখন কোথায় কিভাবে হবে সেটাও তাঁরাই ঠিক করবেন। এ-এক মারাত্মক আত্মঘাতী প্রবণতা। এ-রকম ঘটনা ঘটেছেও। মওলানা মওদুদি বহু আগে লিখেছেন – "কোরাণ-হাদিসের সুস্পষ্ট নির্দেশকে কেউ বিন্দুমাত্র বদলাতে পারবে না, পৃথিবীর সব মুসলিম মিলেও না" (ইসলামিক ল' অ্যাণ্ড কন্সটিটিউশন পৃষ্ঠা ১৪০)। কিন্তু নারী-নেত্রীত্বের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট হাদিসের পরেও সেই মওদুদিই ষাট দশকে ফাতিমা জিন্নাকে সমর্থন করেছেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের বিরুদ্ধে জাতীয় নির্বাচনে। আবার সেই মওদুদিপন্থী বাংলাদেশের জামাত একসময় বলেছে নারী-নেত্রীত্ব হারাম, এবং এখন বলছেন "পরিস্থিতির কারণে জামাত নারী-নেত্রীত্ব মেনে নিয়েছে!" ইসলাম নিয়ে এ কালখেলার অনেক মূল্য দিয়েছে বিশ্ব-মুসলিম, এখনো দিচ্ছে।

জাতির বর্তমান দাঁড়িয়ে থাকে তার ইতিহাসের ওপর। মুসলমানেরও তাই। সে ইতিহাসে আছে উন্নত মুসলিম-সভ্যতা, শত শত যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিদ্রোহ-বিপ্লব, রাজা-রাণী, মোল্লা-মওলানা। আছে মিশর, ইয়েমেন, মালদ্বীপ, ইন্দোনেশিয়ার সার্বভৌম রাণীরা। আছেন রত্ন-মাণিক-খচিত রাজ-পোশাকে অষ্টাদশী সুন্দরী সুলতানা রাজিয়া। মানুষের ইতিহাসের একমাত্র অবিবাহিতা সম্রাজ্ঞী তিনি। পুত্রদের হাতে না দিয়ে আঠারো বছরের কন্যার হাতে রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও ক্ষমতা তুলে দিয়েছিলেন রাজিয়ার পিতা বিশাল ভারতবর্ষের সম্রাট ইলতুৎমিস ১২৩৬ সালে।

তখনকার খলীফার সমর্থনও পেয়েছিলেন সুলতানা রাজিয়া, তাঁর সার্বভৌম রাজত্বকালে চালু মুদ্রায় খোদাই করা আছে ঃ "সুলতান ইলতুৎমিসের কন্যা মালিকা ইলতুৎমিস, যিনি আমিরুল মু'মেনিনের সম্মান বাড়ান।" এ-মুদ্রা এখনও রাখা আছে কোলকাতার মিউজিয়ামে। একই সময়ে ১২৫০ সালে মিশরের রাণী সাজারাত আল্ দু'র-এর নামেও মুদ্রা ছিল, মামলুক খেলাফতের সমর্থনও পেয়েছিলেন তিনি। শুধু তা-ই নয়, মসজিদে তাঁর নামে খোৎবা পড়াতেন মওলানারা। রাজিয়ার সময়ের মওলানারাও নারী-নেত্রীত্বের প্রতিবাদ করেননি। ("দ্য ফরগট্ন কুইন্স্ অব্ ইসলাম" – বিশ্ববিখ্যাত ইসলামি বিশেষজ্ঞ ফাতিমা মার্নিসি, পৃষ্ঠা ৯০-৯১)।

এরই নাম ইতিহাস, বিন্দু-বিন্দু সত্যের রাজকন্যা। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কণাগুলো একসাথে মিলিয়ে নিলে এত শতাব্দী পরেও অশ্রুসিক্ত চোখে ফিসফিস করে কথা বলে ওঠে সে। ইতিহাসে সার্বভৌম মুসলিম রাণীদের অপরূপ কাহিনী শোনায়। আজকের বদ্ধবোধের অন্ধকূপে বন্দি মুসলমানদের কিছু বলতে চায় বুঝি! তাঁরা রাজদণ্ডধারী প্রবল রাজাদের অলঙ্কার-মার্কা মোমের পুতুল রাণী ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন রাজদণ্ডধারিণী শাসনক্ষমতার অধিকারিণী মুসলিম রাণী, নিজের নামে মুদ্রা ছিল তাঁদের কারো কারো, তাঁদের নামে মওলানারা দোয়া করতেন মসজিদে মসজিদে। উদাহরণ দিচ্ছি একই সূত্র থেকে ঃ-

১। ১২৩৬ সাল, দিল্লী। সুলতানা রাজিয়া।

২। ইরাণের তুরকান অঞ্চলের রাণী তুরকান খাতুন, ১২৫৭ থেকে ১২৮২ পর্যন্ত একটানা ২৬ বছর। মসজিদে তাঁর নামে খোৎবা।

৩। তুরকান খাতুনের কন্যা পাদিশা খাতুন। নামাঙ্কিত মুদ্রা।

৪। ইরাণের সিরাজ অঞ্চলে আব্‌শ খাতুন। ১২৫৩ থেকে ১২৮৭, একটানা ২৫ বছর। খোৎবা এবং নামাঙ্কিত মুদ্রা, দু'টোই।

৫। ইরাণের লুরিস্থান অঞ্চলের ১৩৩৯ সালের মুসলিম রাণী (নাম জানা নেই)।

৬। রাণী তিন্দু, ১৪২২ থেকে ১৪১৯ পর্যন্ত, ৯ বছর। (জায়গা সম্বন্ধে মতভেদ আছে)।

৭, ৮, ৯। মালদ্বীপের সুলতানারা ঃ খাদীজা, মরিয়ম, ও ফাতিমা। ১৩৪৭ থেকে ১৩৮৮, একটানা ৪১ বছর। এক সময়ে ইবনে বতুতা সেখানকার সরকারি কাজী ছিলেন।

১১০, ১১। ইয়েমেনের সুলায়হি (শিয়া-খেলাফত?) বংশের দুই রাণী আসমা ও আরোয়া, প্রায় ৫০ বছর রাজত্ব করেছেন। আসমার নামে খোৎবা হত।

১২। ১২৫০ সালে মিশরের রাণী সাজারাত আল্ দু'র। তাঁর নামে মুদ্রাও ছিল, মামলুক খেলাফতের সমর্থনও পেয়েছিলেন তিনি এবং মসজিদে তাঁর নামে খোৎবাও পড়াতেন মওলানারা।

১৩। সুলতানা ফাতিমা, মধ্য এশিয়ায় কাসেমী খেলাফতের শেষ সার্বভৌম সুলতানা, শাসন করেছেন ১৬৭৯ থেকে ১৬৮১ দু'বছর।

১৪ – ১৭। ইন্দোনেশিয়ায় ১৬৪১ থেকে ১৬৯৯ পর্যন্ত ৫৮ বছর ধরে একটানা শাসন করেছেন সুলতানা শাফিয়া, সুলতানা নূর নাকিয়া, সুলতানা জাকিয়া, ও সুলতানা কামালাত শাহ। ওখানকার মোল্লারা এর বিরোধীতা করেছেন। তাঁরা

নারী-নেত্রীত্বের বিরুদ্ধে মক্কা থেকে ফতোয়া এনে সুলতানাদের উৎখাত করার চেষ্টা করেও পারেননি – নিশ্চয়ই রাণীদের জনপ্রিয়তার জন্যই। বিখ্যাত পর্যটক মার্কো পলো'র লেখা থেকেও আমরা এর কিছুটা বিবরণ পাই।

"১৫৯১ হইতে ১৯২৫, প্রায় তিনশ' তিরিশ বছরে পুরুষ রাজারা দেশের রাস্তাঘাট দালানকোঠা মসজিদ-গম্বুজে যাহা উন্নতি করিয়াছিলেন, সম্রাজ্ঞী আসমা ও আরোয়া তাহা হইতে অনেক বেশি উন্নতি করিয়াছিলেন।" কত বছরে করিয়াছিলেন ? মাত্র ৫০ বছরে। অর্থাৎ রাণীরা শুধু মওলানাদের আর ইসলামি খলীফার সমর্থনই পাননি, শাসনও করেছেন যথেষ্ট সাফল্যের সাথে। এবারে আসা যাক সেই হাদিসে। সমস্ত সহি হাদিসে নারী-নেত্রীত্বের বিরুদ্ধে নাম-ধাম সহ সুস্পষ্ট হাদিস আছে মাত্র একটি, মাত্র একজন সাহাবীর বলা।

নবীজীর তায়েফ আক্রমণের সময় (৮ হিজরিতে) কিছুতেই তায়েফের দুর্গ ভাঙ্গা যাচ্ছিল না। তখন তিনি ঘোষণা করে দিলেন, দুর্গের ভেতর থেকে যে সব ক্রীতদাস পালিয়ে আসবে তারা সবাই মুক্ত হবে। শুনে অনেক ক্রীতদাস তায়েফ দুর্গ থেকে পালিয়ে আসে, ফলে দুর্গের পতন হয়। বালক আবু বাকরা (হজরত আবু বকর রাঃ নন) ছিলেন সেই ক্রীতদাসের একজন। তারপর দীর্ঘ চব্বিশ বছর চলে গেছে, নবীজী দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, সেই ক্রীতদাস বালক এখন বসরা নগরের গণ্যমান্য নাগরিক। তখন ঘটে গেল মুসলমানের ইতিহাসে প্রথম রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধ, হজরত ওসমান খুন হবার পরে হজরত আলীর বিরুদ্ধে হজরত আয়েশা-তালহা-যুবায়ের দলের। উট শব্দটার আরবি হল "জামাল।" বিবি আয়েশা উটে চড়ে হজরত আলীর বিরুদ্ধে সৈন্য-পরিচালনা করেছিলেন বলে এ-যুদ্ধের নাম হয়েছে "জামাল-যুদ্ধ।" এধারে-ওধারে বারো হাজার সাহাবি খুন হয়েছেন এ-যুদ্ধে।

হজরত আলী 'জামাল-যুদ্ধে' জয়লাভ করে বিবি আয়েশাকে সসম্মানে মদীনায় পাঠিয়ে দেবার পর বসরায় প্রবেশ করে শহরের গণ্যমান্য লোকদের ডেকে পাঠান। আবু বাকরা তখন হজরত আলীকে এই হাদিস শোনান। নবীজীর সময় ৬২৯ থেকে ৬৩২ সাল পর্যন্ত রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের আক্রমণে ইরাণে খুব বিশৃঙ্খলা হয়েছিল। তখন সেখানে দু'জন নেত্রীর আবির্ভাব হয়েছিল। সে-কথা শুনে নবীজী নাকি আবু বাকরাকে এ-হাদিস বলেছিলেন। হাদিসটা হল – "আবু বাকরা বলিয়াছেন, জামাল-যুদ্ধের সময় আমি সাহাবীদের সহিত যোগ দিয়া (বিবি আয়েশার পক্ষে) যুদ্ধে প্রায় নামিয়া পড়িয়াছিলাম, কিন্তু নবী (দঃ)-এর একটি কথায় আল্লাহ আমাকে বড়ই উপকৃত করিয়াছেন। যখন নবীজী (দঃ)-কে বলা হইল যে (পারস্য সম্রাট) খসরুর মৃত্যুর পরে পারস্যের লোকেরা তাহার কন্যার উপর নেত্রীত্ব অর্পণ করিয়াছে, তখন তিনি বলিলেন – 'কখনও উন্নতি করিবে না সেই জাতি যে জাতি তাহাদের নেতৃত্ব অর্পণ করে নারীর উপরে" (সহি বোখারীর ইংরেজী অনুবাদ, পঞ্চম খণ্ড, হাদিস নম্বর ৭০৯)।

এটা বোখারীর যে কোন বাংলা অনুবাদে পেয়ে যাবেন, হাফেজ মোঃ আবদুল জলিলের ৯০ পৃষ্ঠার ২২২ নম্বরে তো পাবেনই, আজিজুল হক সাহেবের বোখারীর চতুর্থ খণ্ডের ২২৬ পৃষ্ঠাতেও পাবার কথা। অর্থাৎ আমরা পেলাম ঃ

১। এ হাদিস জানার পরেও তিনি বিবি আয়েশা (রাঃ)-র পক্ষে যুদ্ধে "প্রায় নেমে পড়ছিলেন," পরে হঠাৎ মত পরিবর্তন করেন। অর্থাৎ হাদিসটা প্রথমে তাঁর মনে পড়েনি।
২। এ হাদিস আবু বাকরা প্রকাশ করেছেন হজরত আয়েশা (রাঃ) পরাজিত হবার পরে, আগে নয়।
৩। এ হাদিস অনুসারে তাঁর উচিত ছিল বিবি আয়েশা (রাঃ)-র বিপক্ষে হজরত আলী (রাঃ)-র পক্ষে যুদ্ধ করার। তা তিনি করেননি।
৪। বলেছেন নবীজীর মৃত্যুর সুদীর্ঘ ২৪ বছর পর, তার আগে একবারও বলেননি।
৫। এ হাদিসে তিনি বড়ই উপকৃত হয়েছেন বলে জানান।
৬। তিনি হজরত আলী (রাঃ)-কে বলেছেন, অন্য কাউকে না জানালেও তিনি নাকি শুধু হজরত আয়েশা (রাঃ)-কে জামাল-যুদ্ধের আগে চিঠি লিখে এ-হাদিসের কথা জানিয়েছিলেন। (অর্থাৎ তাঁকে নেত্রীত্ব ছাড়তে বলেছিলেন)।
৭। অনেক গুরুত্বপূর্ণ হাদিস নবীজী বর্ণনা করেছেন অনেক সাহাবীকে, কিন্তু যে-হাদিসের সাথে বিশ্বের সমস্ত মুসলিম নারীদের সম্মান ও অধিকার কেয়ামত পর্যন্ত বাঁধা, সেই অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ হাদিস নবীজী বলেছেন শুধু তাঁকেই, আর কোন সাহাবীকেই নয়, বিদায় হজ্বের খোৎবাতেও নয়।

এবার কিছু সহজ হিসেব করা যাক।

১। আবু বাকরা বলেছেন "আমি বড়ই উপকৃত হইয়াছি।" কিভাবে ? তিনি কোন নেতা বা রাজা বাদশা ছিলেন না, কিভাবে তিনি ব্যক্তিগতভাবে বড়ই উপকৃত হলেন। প্রশ্নই ওঠে না। তিনি তো বিবি আয়েশার বিরুদ্ধে হজরত আলীর পক্ষে যুদ্ধও করেননি।
২। জামাল-যুদ্ধে যদি আয়েশা (রাঃ) জিতে যেতেন, তবে কি তিনি এ-হাদিস প্রকাশ করতেন ? কে জানে!!
৩। জামাল-যুদ্ধ যদি না হত তবে তিনি এ-হাদিস বলতেন কি ? বোধহয় না, কারণ তিনি সুদীর্ঘ ২৪ বছরে এ-হাদিস বলেননি।

এবারে প্রমাণ।

১। চিঠিতে এ-হাদিস কথা জানাবার পরেও বিবি আয়েশা (রাঃ) নেত্রীত্ব ছেড়ে দেননি, যুদ্ধের নেত্রীত্ব দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি এ-হাদিস বিশ্বাস করেননি।
২। মওলানারা এ-হাদিস জানতেন না, এটা হতে পারে না। যুগে যুগে বেশির ভাগ মুসলিম সুলতানাদের সময় মওলানারা বিরোধীতা করেননি। অর্থাৎ তাঁরা এ-হাদিস বিশ্বাস করেননি।

৩। মুসলিম জাহানের খলীফাদের দরবারে কোরাণ-হাদিসের প্রচণ্ড চর্চা হত। এ-হাদিস নিশ্চয়ই তাঁরা জানতেন। মুসলিম জাহানের খলীফারাও এ-হাদিস বিশ্বাস করেননি। তাঁদের সমর্থন ছাড়া সুলতানাদের মুদ্রা ও খোৎবা সম্ভব হত না।

অর্থাৎ ইসলামের ইতিহাসে বেশির ভাগ লোক এ-হাদিস বিশ্বাস করেনি। আইয়ুবের বিরুদ্ধে নির্বাচনে ফাতিমা জিন্নার সমর্থক মওলানা মওদুদিও বিশ্বাস করেনি। কেন ? কারণটা তাঁরা হয়ত জানতেন, এ-হাদিস জাল-হাদিস। মাত্র তিনটি সূত্র দিচ্ছি, আরও বহু জায়গায় পেয়ে যাবেন ঃ-

সূত্র ১। আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার অপরাধে আবু বাকরাকে শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল ("দ্য ফরগট্‌ন কুইন্‌স্ অব্ ইসলাম" – বিখ্যাত ইসলামি বিশেষজ্ঞ ফাতিমা মার্নিসি)।

সূত্র ২। এই হাদিসের অসত্যতা সুপ্রমাণিত শুধু ইতিহাসেই নয়, বরং ইহাও সত্য যে আবু বাকরা সম্বন্ধে মুসলমানের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার অপরাধে তাহাকে জনসমক্ষে শাস্তি দেয়া হইয়াছিল। – উইমেন'স রাইট ইন ইসলাম – শরীফ চৌধুরী।

সূত্র ৩। ইহার বর্ণনাকারী আবু বাকরাকে নারী-ব্যাভিচারের মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার অপরাধে হজরত ওমর শাস্তি দিয়াছিলেন। – উইমেন অ্যাণ্ড পলিটিক্স ইন্ ইসলাম – www.submission.org/women/politics.html

এইবার কোরাণ শরীফ খুলে সুরা ২৪-এর আয়াত ৪ দেখে নিন – "যাহারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর স্ব-পক্ষে চারজন পুরুষ-সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাহাদিগকে আশিটি বেত্রাঘাত করিবে এবং কখনও তাহাদের সাক্ষ্য কবুল করিবে না। ইহারাই না-ফরমান।"

এই না-ফারমান আবু বাকরা'র কথাতেই হানাফি-শাফি-মালিকি-হাম্বলি শারিয়া আইনে নারী-নেত্রীত্ব সরাসরি নিষেধ করা আছে। সময়ের সাথে সাথে সবাই উন্নতি করে। কিন্তু শারিয়ার বিবর্তন হচ্ছে শামুকের গতিতে। ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত বাংলায় বিধিবদ্ধ আইন-এর ৩য় খণ্ডের ১৯৭ পৃষ্ঠায় ধারা ৯০০-তে "রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার যোগ্যতা" আইনে যে আটটা শর্ত আছে পুরুষ হওয়া তার অন্যতম। ব্যাখ্যায় আছে "রাষ্ট্রপ্রধানের পুরুষ হওয়াও অপরিহার্য শর্ত।" কিন্তু তার পরে পরেই "অপরিহার্য শর্ত"টা ততটা অপরিহার্য থাকেনি, বলা হয়েছে যদি "ইসলামি রাষ্ট্রের বিশেষজ্ঞ ফকিহ্‌গণ কোন বিশেষ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে জাতির সার্বিক কল্যাণ বিবেচনা করিয়া উক্ত সর্বোচ্চ পদ নারীর জন্য অনুমোদন করিতে পারেন।" অর্থাৎ অনুমোদনের সার্টিফিকেট তাঁরা ছাড়বেন না। তাঁদেরকে কে অনুমোদন করে তার ঠিক নেই, অথচ তাঁদের অনুমোদন ছাড়া যোগ্য নারীও রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারবেন না। এভাবেই শারিয়া হয়েছে রাজনৈতিক ক্ষমতার হাতিয়ার।

খোদ কোরাণের নির্দেশটাই দেখি না কেন আমরা। পড়ে দেখুন সুরা নামল আয়াত ২৩ – "আমি এক নারীকে সাবা-বাসীদের উপর রাজত্ব করতে দেখেছি।" সেই রাজত্ব করা রাণী যখন ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হল তখন ? তখন কোরাণ কি বলেছে তাকে সিংহাসন থেকে তাড়িয়ে দেয়া হল ? মোটেই নয়, মোটেই নয়, পড়ে দেখুন আয়াত ৪৪।

তাহলে ? দেখলেন ইসলামের নামে নারী-বিরোধী পুরুষতন্ত্রের কোরাণ-বিরোধী ষড়যন্ত্র ? কিন্তু সব ষড়যন্ত্রই দুর্বল হতে বাধ্য, ভেঙে চুরমার হতে বাধ্য যদি প্রতিরোধ করা যায়।

আমাদের নারীরা জীবনের বিষয়ে পুরুষের সমান কৃতিত্ব রাখছেন। কিন্তু তবু তাঁদের অবদানের প্রতিদান তো দূরের কথা, স্বীকৃতিটুকু দেয়া হয়নি। অথচ নিজেদেরই নারীদের এমন অপমান করে পঙ্গু করার পদক্ষেপ নিয়ে দুনিয়ার মুসলমানকে এক আত্মঘাতী ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছে। হাদিসটার মূলে না গিয়ে কতভাবে কত-গবেষণায় 'প্রমাণ' করার চেষ্টা হয়েছে যে নারীরা নেত্রীত্বের যোগ্য নয়। খুলে দেখুন মওলানা মুহিউদ্দীনের বাংলা কোরাণ, পৃষ্ঠা ৯৯৩ ঃ "আলেমগণ এ-বিষয়ে একমত যে, কোন নারীকে শাসনকর্তৃত্ব, খেলাফত অথবা রাজত্ব সমর্পণ করা যায় না ; বরং নামাজের ইমামতের ন্যায় বৃহৎ ইমামতি অর্থাৎ শাসন-কর্তৃত্বও একমাত্র পুরুষের জন্যই উপযুক্ত।" কে, কারা এই আলেমগণ ? মুসলিম-নারীদের চিরকালের জন্য এ-ভাবে অপমান ও পঙ্গু করার অধিকার এঁরা কোত্থেকে পেলেন ? আরও দেখুন পৃষ্ঠা ১২২০, নবীজী নাকি বলেছেন – "যখন তোমাদের শাসকবর্গ তোমাদের মন্দ ব্যক্তি হইবে, তোমাদের বিত্তশালীরা কৃপণ হইবে এবং তোমাদের কাজকর্ম নারীদের হাতে ন্যস্ত হইবে – তারা যে-ভাবে ইচ্ছা কাজ করিবে, তখন তোমাদের বসবাসের জন্য ভূপৃষ্ঠ অপেক্ষা ভূগর্ভই শ্রেয়ঃ হইবে।" (রূহুল মা'আনি)।

লজ্জাটা কম নয়, কিন্তু সমস্যাটা তারও বড়। নারী-পুরুষের মিলিত অবদান ছাড়া সমাজের অগ্রগতি সম্ভব নয়। তাই, কোন মহাপুরুষ তাঁর অনুসারী নারীদের চিরকালের জন্য এ-ভাবে অপমান ও পঙ্গু করে রাখতে পারেন না।

বিশ্ব-নবী তো ননই ॥

হিলা বিয়ে ও তাৎক্ষণিক তালাক

"একসাথে তিন-তালাক বা রাগের মাথায় তালাক বৈধ নয়"– বাংলাদেশের শারিয়া-তত্ত্বগুরু শাহ্ আব্দুল হান্নান - খবর আলোচনা ফোরাম – ৮ ও ১০ জুলাই, ৩৮ মুক্তিসন (২০০৮)।

হিলা বিয়ে জানেন না এমন বাংলাদেশী হয়ত একজনও খুঁজে পাওয়া যাবে না। বাংলায় এটা কোনকালেই ছিল না কিন্তু এখন গত পনেরো বিশ বছর ধরে এটা খবরের কাগজে প্রায়ই ওঠে। গ্রাম-গঞ্জের মুরুব্বীরা মিলে ফতোয়ার তাৎক্ষণিক আদালতে বিভিন্ন মামলার শারিয়া-মাফিক বিচার করে রায় ঘোষণা করেন। রাষ্ট্রীয় বৈধতা না থাকলেও সে-রায় প্রচণ্ড সামাজিক শক্তিতে অপরাধীর ওপরে প্রয়োগ করা হয়। হিলা হল এরই একধরনের শারিয়া-মামলা যাতে কোন কারণে শারিয়া-আদালত কোন দম্পতির বিয়ে বাতিল ঘোষণা করেন। তারপর তাদের আবার বিয়ে দেবার শর্ত হিসেবে স্ত্রীকে অন্য লোকের সাথে বিয়ে ও সহবাসে বাধ্য করেন। দ্বিতীয় স্বামী স্বেচ্ছায় তালাক দিলে তবে সে আবার আগের স্বামীকে বিয়ে করতে পারে। এটা ঘটে প্রধানত স্বামী রাগের মাথায় স্ত্রীকে একসাথে তিনবার তালাক বলে ফেলেছে বলে, তার কথা শোনার সাক্ষী কখনো থাকে, কখনো থাকে না।

কয়েকমাস আগে ভারতে খুব হৈহল্লা হয়েছিল কারণ এক স্বামী ঘুমের ঘোরে তিনবার তালাক বলে ফেলেছিল। এ-খবর চাউর হলে স্থানীয় মওলানারা তাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘোষণা করেন। বাংলাদেশে এমনও হয়েছে যে, কোন নারী প্রথম স্বামী থেকে তালাক হয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করে কয়েকবছর ঘর-সংসার করার পর হঠাৎ মুরুব্বীরা ঘোষণা দিয়েছেন, কোন কারণে আগের তালাক বৈধ নয়। সুতরাং দ্বিতীয় স্বামীর সাথে স্ত্রীর বিয়েও অবৈধ বলে তারা দৈহিক সংসর্গের অপরাধে অপরাধী। অনেক ঘটনার এ-সব দলিল ধরা আছে 'শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র'-এর বইতে 'ফতোয়া ১৯৯১-১৯৯৫'। এ অপরাধে শারিয়া আইন হল বিবাহিত / বিবাহিতাদের জন্য জনসমক্ষে পাথরের আঘাতে মৃত্যুদণ্ড, অবিবাহিতা / অবিবাহিতাদের জন্য চাবুক।

অবৈধ সম্পর্কের শাস্তির আইনটা কোরাণ-মাফিক কিনা তা অন্য নিবন্ধে দেখিয়েছি। এবারে তাৎক্ষণিক তালাকের কথায় আসা যাক। সুরা বাকারা আয়াত ২২৯ মাফিক তালাক দিতে চাইলে স্বামীকে অন্তত দু'বার 'তালাক' উচ্চারণ করতে হয়, তারপর ইদ্দত পার হলে আর উচ্চারণ না করলেও তৃতীয় তালাক প্রয়োগ হয়ে বিয়ে বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু সে উচ্চারণ একসাথে তিনবার করলে তালাক পুরো হয় কিনা সেটাই প্রশ্ন। কারণ হিলা বিয়ের শুরুটাই সাধারণত হয় সেটা দিয়ে। তাই চলুন আমরা দেখি এ-ব্যাপারে শারিয়া, রসুল ও কোরাণ কি বলে।

"স্বামী তাহার স্ত্রীকে একই সময়ে একই বাক্যে অথবা পৃথক পৃথক সময় ও বাক্যে তিন-তালাক দিলে তৎক্ষণাৎ বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায় এবং স্বামী তাহাকে ফিরাইয়া লইতে পারে না ... স্বামীর সুস্পষ্ট বাক্যে অথবা পরোক্ষ বক্তব্যে অথবা ইশারা-ইঙ্গিতে অথবা লিখিতভাবে প্রদত্ত তালাক সঙ্ঘটিত হইবে ... তালাক বলার সময় স্বামীর মনের সংখ্যা বা দেখানো আঙুল দিয়া তালাকের সংখ্যা ধরা যায় ... যদি স্বামী বলে তোমাকে তালাক দিলাম, তবে বলিবার সময় স্বামীর মনে যে সংখ্যা থাকে তাহাই বলবৎ হইবে"– সূত্র ১। অর্থাৎ শারিয়া আইনে স্বামী তার স্ত্রীকে তাৎক্ষণিক পুরো তালাক দিতে পারে। কিন্তু রসুলের কিছু হাদিসে আমরা দেখতে পাই উল্টোটা, যেমন ঃ

(ক) "এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন-তালাক একসাথে দিয়েছে শুনে রসুল (দঃ) রাগে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, তোমরা কি আল্লাহর কিতাবের প্রতি ঠাট্টা করছ? অথচ আমি এখনও তোমাদের মধ্যেই রয়েছি ! ... (অনেক ইমামের নাম) এ-হাদিসকে মুসলিম শরিফের সূত্রে সঠিক বলেছেন" – সূত্র ২।

(খ) "এক সাহাবি তার স্ত্রীকে একসাথে তিন-তালাক বলেছে শুনে রসুল (দঃ) বললেন – 'এই তিন তালাক মিলে হল এক-তালাক। ইচ্ছে হলে এই তালাক বাতিল করতে পার।' – সূত্র ৩।

এ-ব্যাপারে বিপরীত হাদিসও আছে, যেমন, "একই সঙ্গে তিন-তালাক দিয়ে নিষ্কৃতি লাভ করা যদিও রসুল (সঃ)-এর অসন্তুষ্টির কারণ, যা পূর্ববর্তী বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, এ-জন্য সমগ্র উম্মত একবাক্যে একে নিকৃষ্ট পন্থা বলে উল্লেখ করেছে এবং কেউ কেউ নাজায়েযও বলেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি কেউ এ পদক্ষেপ নেয়, তবে এর ফলাফলও তাই হবে বৈধ পথে অগ্রসর হলে যা হয়। অর্থাৎ তিন-তালাক হয়ে যাবে, এবং শুধু প্রত্যাহার নয়, বিবাহবন্ধন নবায়নের সুযোগও আর থাকবে না... হুজুর (সঃ)-এর মীমাংসাই এ-ব্যাপারে বড় প্রমাণ যে, তিনি অসন্তুষ্ট হয়েও তিন-তালাক কার্যকরী করেছেন। হাদিস গ্রন্থে অনুরূপ বহু ঘটনার বর্ণনা রয়েছে" – সূত্র ৪।

অর্থাৎ, হাদিসে আমরা একই ব্যাপারে বিপরীত কথা পাচ্ছি, শারিয়া-সমর্থকদের মধ্যেই এ-ব্যাপারে মতভেদ আছে। এটা নূতন কিছু নয়, হাদিসে এ-রকম বহু স্ব-বিরোধীতা আছে। কিন্তু তালাকের মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে বিপরীত সুন্নত আমাদের জন্য যতটা লজ্জার কথা তার চেয়ে বেশি বিপজ্জনক। ভারতের মুসলিম ল' বোর্ডও ২৬শে ডিসেম্বর ২০০৫ তারিখে বলেছে, "এই হঠাৎ-তালাক হল গুনাহ্।" তাঁরা এ-ও বলেছেন, গুনাহ্ হলেও তাৎক্ষণিক তালাক বৈধ। এইসব উল্টোপাল্টা কথার জন্য সেখানে নারীরা উইমেন মুসলিম ল' বোর্ড বানিয়েছেন। আমরা বিশ্বাস করি যে-কর্ম গুনাহ্, তার ফলাফল বৈধ হতে পারে না।

কখনো কখনো স্বামী পরে দাবি করে যে, আসলে তালাক দেবার নিয়ত তার ছিল না, ওটা রাগের মাথায় মুখ দিয়ে বের হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে ফল হয় না, কারণ হিসেবে যা বলা আছে তা নবী রসুল তো দূরের কথা কোনো বিবেকবান মানুষকেও শোভা পায় না। "রসুল (সঃ) এরশাদ করেছেন তিনটি বিষয় এমন রয়েছে যে, হাসি-তামাশার মাধ্যমে করা ও বাস্তবে করা দুই-ই সমান। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে তালাক...হাসি-ঠাট্টার ছলে হলেও এবং অন্তরে বিয়ে, তালাক ও তালাক-প্রত্যাহারের ইচ্ছা না থাকলেও মুখের কথা দ্বারা বিয়ে, তালাক এবং প্রত্যাহার বাস্তবায়িত হয়ে যাবে...জবরদস্তি অবস্থায় যদিও সে তালাক দিতে আন্তরিকভাবে সম্মত ছিল না, অক্ষম হয়ে তালাক শব্দ বলে দিয়েছে, তবুও তালাক হয়ে যাবে" – সূত্র ৫। আমরা এটা মানি না। এ-আইনও আছে যে, স্বামী যদি অত্যাচারের চাপে, বা নেশার ঘোরে, বা রোগের কষ্টে অধীর হয়ে, বা হাসি-ঠাট্টায়, নোট লিখে বা টেলিফোনের অ্যান্সারিং মেশিনেও তালাক বলে রাখে তবু তালাক পুরো হয়ে যায় – সূত্র ৬। আমরা এটাও মানি না। ভারতের ও মালয়েশিয়ার শারিয়া আইনে এটা চালু আছে, এ-মামলার দলিলও আমাদের কাছে আছে। এতে বহু নারীর জীবন ধ্বংস হয়।

কিন্তু মুসলিম নারীর জীবন ও সন্তান-সংসার এতটুকু সুতোর ওপর ঝুলে থাকতে পারে না এবং মাতৃজাতিকে এ-ভাবে অপমান পঙ্গু করে কোন জাতি উন্নতি করতে পারে না। মানুষ তো মানুষ-ই, নবী-রসুল তো নয়। মানুষ রাগের মাথায় ভুল করতেই পারে, তাকে সে ভুল সংশোধনের সুযোগ দিয়ে ভালমানুষ বানানোই ইসলাম। অনেক কঠিন অপরাধের তওবার সুযোগ দিয়েছে ইসলাম, দিয়েছেন রসুল (সঃ)। তাই, মুখ ফস্‌কে দু'টো কথা বের হয়ে গেলে তার আর মাপ নেই, এটা হতে পারে না। নিরপরাধ নারীর জীবন ধ্বংস করে কিতাবের অক্ষর বাঁচানোটা ইসলাম-বিরোধী।

দু'পক্ষের আইনই দেখলাম আমরা। এবার মূল দলিলে আসি। আসলে শারিয়ার এ-আইন বানানো হয়েছে নবীজীর অনেক পরে। এ-কথা বলেছেন কিছু বিশ্ব-বিখ্যাত শারিয়া-সমর্থকরাই। যেমন, "নবীজীর মৃত্যুর বহু পরে তালাকের এক নূতন নিয়ম দেখা যায়। স্বামী একসাথে তিন-তালাক উচ্চারণ করে বা লিখিয়া দেয়। এই তালাকে অনুতাপ বা পুনর্বিবেচনার সুযোগ নাই। অজ্ঞ মুসলমানেরা এইভাবে গুনাহ্ করে। নবীজী তীব্রভাবে ইহাতে বাধা দিয়াছেন" – সূত্র ৭। আরও দেখুন – "নবীজীর সময় থেকে শুরু করে হজরত আবু বকর ও হজরত ওমরের সময় পর্যন্ত একসাথে তিন-তালাক উচ্চারণকে এক-তালাক ধরা হত। কিন্তু যেহেতু লোকে তাড়াতাড়ি ব্যাপারটার ফয়সালা চাইত তাই হজরত ওমর একসাথে তিন-তালাককে বৈধ করেন এবং এই আইন চালু করেন" – সূত্র ৮। এই একই কথা বলেছেন অন্যান্য বহু ইসলামি বিশেষজ্ঞও। ইতিহাসে পাওয়া যায় কেউ তিন-তালাক একসাথে দিলে হজরত ওমর সেই স্বামীকে শাস্তিও দিয়েছেন। কিন্তু তিন-তালাক দেনেওয়ালা স্বামীর কোন শাস্তির আইন কোন শারিয়া কেতাবেই নেই। কারণ আইনটা পুরুষের পক্ষে পুরুষেরই বানানো।

তাৎক্ষণিক-তালাকে বিপরীত দু'ধরনের হাদিস থাকায় সিদ্ধান্ত নিতে বিশ্ব-মুসলিমের অসুবিধে হয়েছে। হবারই কথা। সহি হাদিসে এমন বৈপরীত্য আছে শত শত। এ-ক্ষেত্রে কি করতে হবে তা ইমাম শাফি' বলেছেন ঃ "পরস্পর-বিরোধী দুইটি হাদিসের মধ্যে কোন্‌টি বেশি নির্ভরযোগ্য তাহার বিচার অন্য সুন্নত দ্বারা বা কোরাণ দ্বারা হইবে" – সূত্র ৯।

এবার তাহলে কোরাণ।

এ-কথা সবাই স্বীকার করবেন যে, অপরাধ হোক বা না-হোক, সেটা করেছে স্বামী। অথচ হঠাৎ-তালাক হলে নিরপরাধ স্ত্রীর জীবন ধ্বংস হয়ে যায়। সে হারায় তার স্বামী-সংসার ও সন্তান যদি ছেলের বয়স ৭-বছর ও মেয়ের ৯-বছরের নীচে হয়। কিন্তু একজনের অপরাধে অন্যের শাস্তি হওয়া চরম অন্যায়। সে-জন্যই কোরাণ কি চমৎকার বলেছে – "কেউ, অন্য কাহারো দোষের ভাগী হইবে না" – বাকারা ২৩৪ ; "তাহাদের কর্ম সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হইবে না" – বাকারা ১৪১ ; এবং "একে অপরের কৃতকর্মের জন্য দায়ী হইবে না" – নজম ৩৮। অর্থাৎ স্বামীর অপকর্মের জন্য স্ত্রীকে শাস্তি দেয়া যায় না। হঠাৎ-তালাক যে কতটাই কোরাণ-বিরোধী তা প্রমাণ হয় পদে পদে। নাসুজ অর্থাৎ প্রকাশ্য অশ্লীল কর্ম (অর্থাৎ পরকীয়া) না করা পর্যন্ত স্ত্রীকে অন্য কোন-কারণেই তালাক দেয়া যাবে না এটা কোরাণেরই সুস্পষ্ট নির্দেশ ঃ "যদি তারা কোন সুস্পষ্ট নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত না হয় তবে তাদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করো না এবং তারাও যেন বের না হয়, – এগুলো আল্লাহ'র নির্ধারিত সীমা"– (সুরা ত্বালাক ১)। গৃহ থেকে বহিষ্কার করো না মানে তালাক দিও না – এছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

এবারে তালাকের সাক্ষী।

সাধারণত গ্রামগঞ্জের ফতোয়া-আদালত হিলা বিয়েতে স্বামীর তালাক উচ্চারণের সময় কোন সাক্ষী আছে কিনা তার ধার ধারা হয় না। কারণ শারিয়ার আইনটা হল, "বিয়ে ব্যতীত অন্য সব-ব্যাপারে সমাধা করার জন্য সাক্ষী শর্ত নয়" – সূত্র ১০। আরও দেখুন ঃ "তালাক সঙ্ঘটিত হওয়ার জন্য সাক্ষী শর্ত নহে" – সূত্র ১১।

এ-সব আইন কোরাণ শরীফের ঘোর বিরোধী। দেখুন আল্ কোরাণ সুরা ত্বালাক আয়াত ১ ও ২, আর সুরা বাকারা ২২৯ ও ২২৮ ঃ "তোমরা যখন স্ত্রীদিগকে তালাক দিতে চাও তখন ইদ্দত গণনা করিও। অতঃপর তাহার যখন ইদ্দতকালে পৌঁছে, তখন তাহাদিগকে উপযুক্ত পন্থায় ছাড়িয়া দিবে বা রাখিয়া দিবে এবং তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন সাক্ষী রাখিবে...তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখিবে তিন হায়েজ পর্যন্ত।"

তাই তাৎক্ষণিক-তালাক এবং তাৎক্ষণিক-দ্বিতীয় বিয়ে সম্পূর্ণ কোরাণ-বিরোধী।

কোরাণ মোতাবেক কোন নারীকে বিয়েতে বাধ্য করার অধিকার কারো নেই, সেই সময়ে নারীকে এ-অসাধারণ অধিকার দিয়েছে কোরাণ। সে-জন্যই মরক্কো, সিনেগাল, তিউনিসিয়া প্রভৃতি বহু মুসলিম দেশ আইন করে তাৎক্ষণিক-তালাক বেআইনি করেছে – সূত্র ১২। আমাদের মুসলিম আইনের ৭ নম্বর ধারা মোতাবেকও এটা বেআইনি (বিচারপতি গোলাম রব্বানী)। তফাৎটা হল ঐসব দেশে আইন ভাঙলে তার "খবর আছে," আর আমাদের দেশে মা-বোনদের জীবন ইসলামের নামে যে ধ্বংস হয় কোন ইসলামি দলের কানে সে আর্তনাদ সে কান্না পৌঁছে বলে মনে হয় না। আমরা এমনই বিবেকহীন হয়ে গেছি।

যে স্ত্রীকে তাৎক্ষণিক-তালাকের মধ্যে পড়তে হয় তার অপমান-অসম্মান, তার ক্ষোভ-দুঃখ, তার মনের অবস্থা কবে আমরা বুঝব ? এ-কোন্ ইসলাম যে নিরপরাধের জীবন এত নিষ্ঠুরভাবে ধ্বংস করে ? মায়ের জাতিকে এ-ভাবে অসম্মান ক'রে আমরা কোনদিনই উন্নতি করতে পারব না। কবে সরকার আইন প্রয়োগ করার মত শক্তিশালী হবে, কবে আমাদের ইসলামি দলগুলো এ-অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে, কবে গ্রামেগঞ্জের ইমাম-চেয়ারম্যানেরা এর বিরুদ্ধে শক্ত হয়ে দাঁড়াবে, কবে মাদ্রাসা-শিক্ষকেরা এ-সব তত্ত্ব-তথ্য সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করবেন জানি না। তবে যতদিন তা না হবে ততদিনই আমাদের মা-বোনেরা জাতির চোখের সামনে নিপীড়িতা হতে থাকবেন এবং ততদিনই আমরা পিছিয়ে থাকব।

আমি ইসলামি দলগুলোকে আহ্বান করছি এখনই এই নিষ্ঠুর অনৈসলামিক প্রথা বন্ধ করতে। আর মা-বোনদের আহ্বান জানাচ্ছি প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলতে, আমরা সাথে আছি।

আচ্ছা, পুরো তালাকের পর স্বামী-স্ত্রীর পুনর্বিবাহের ওপরে কি কোরাণের অন্য কোনো নির্দেশ আছে যা দিয়ে আমাদের ইমামরা মা-বোনের ওপর এই অপমান আর অত্যাচার বন্ধ করতে পারেন ?

আছে। অবশ্যই আছে।

আবার সুরা বাকারা ২৩০-এর পরপরই আয়াত ২৩২। মওলানা মুহিউদ্দিন খানের অনুবাদ ঃ "আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও এবং তারপর তারাও নির্ধারিত ইদ্দত পূর্ণ করতে থাকে, তখন তাদেরকে পূর্বস্বামীদের সাথে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নিয়মানুযায়ী বিয়ে করতে বাধা দান ক'রো না।"

তাহলে ? মওলানারা কেন এ আয়াতটা প্রয়োগ তো দূরের কথা, উল্লেখ পর্যন্ত করেন না ? কোন শরিয়া বইতে এ আয়াতের উল্লেখ নেই কেন ? এ আয়াতের বিষয়ে তাঁর তাফহিমুল কুরাণ-এ তাঁদের নেতা মওলানা মউদুদিও তো না বলে পারেননি – "যখন কোনো স্বামী তাহার স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং ইদ্দতের আগে তালাক প্রত্যাহার করে না, সেই দম্পতি যদি চায় তবে তাহাদের পুনর্বিবাহে বাধা দেয়া সেই নারীর আত্মীয়স্বজনদের উচিত নহে" –
http://www.quranenglish.com/tafheem_quran/002-10.htm
স্পষ্টতই, বাধা দেয়া আত্মীয়স্বজনের উচিত নহে হলে কারো জন্যই উচিত নহে।

এবারে আপনাদের একটা প্রশ্ন সামনে দাঁড় করিয়ে শেষ করব। ভেবে দেখুন তো, ওই নির্দেশ দু'টোর কোন্টা মানবাধিকার-সচেতন অগ্রসর সমাজের জন্য চিরকালীন হতে পারে, আর কোন্টা সেই মানবাধিকার-অচেতন পশ্চাৎপদ সমাজের শতাব্দী-প্রাচীন প্রথার ওপরে তাৎক্ষণিক নির্দেশ হতে পারে ?

নিয়ত ! নিয়ত !! কোরাণ-রসুলের নারী অধিকার বহু আগেই ডাকাতি হয়ে গেছে ঐ কোরাণ-রসুলের নামেই। কিন্তু নিয়ত যদি ঠিক থাকে তাহলে ঐ কোরাণ-রসুল দিয়েই আমাদের মওলানারা কোরাণ-রসুলের দেয়া নারী অধিকার আবার প্রতিষ্ঠা করতে পারেন ॥

সূত্র ১। বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৭, ধারা ৩৫১; পৃঃ ৪৮৩ ধারা ৩৫১; পৃঃ ৪৭৮ ধারা ৩৪৩; হানাফি আইন পৃঃ ৮১; শাফি'ই আইন পৃঃ ৫৬০ আইন নং এন.৩.৫; মওলানা মুহিউদ্দীনের বাংলা-কোরাণের তফসির পৃঃ ১২৮; মওলানা আশরাফ আলী থানভী'র "দ্বীন কি বাঁতে" পৃঃ ২৫৪ আইন #১৫৩৭, ১৫৩৮, ১৫৪৬ ও ২৫৫৫; ইউরোপিয়ান ফতোয়া কাউন্সিল ও ক্যানাডার মওলানার ফতোয়ায় (United Muslims) ওয়েব সাইট Sunnipath.com ইত্যাদি।

সূত্র ২। মওলানা মুহিউদ্দিনের অনুদিত বাংলা-কোরাণের তফসির পৃঃ ১২৭।

সূত্র ৩। বিশ্ব-বিখ্যাত শারিয়া-সমর্থক মওলানা ওয়াহিদুদ্দিনের "Women in Islami Sharia"-তে ফতহুল বারী'র সূত্রে - পৃঃ ১০৮ ও ১০৯।

সূত্র ৪। মওলানা মুহিউদ্দিনের অনুদিত বাংলা-কোরাণের তফসির পৃঃ ১২৭-১২৯।

সূত্র ৫। মওলানা মুহিউদ্দিনের অনুদিত বাংলা-কোরাণের পৃঃ ১২৮ ও ৭৫৮।

সূত্র ৬। বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ১ম খণ্ড ধারা ৩৪৭, ৩৪৯; হানাফি আইন, মওলানা আশরাফ থানভি'র বেহেশতি জেওর থেকে শুরু করে মকসুদুল মু'মেনিন পর্যন্ত বহু কেতাব।

সূত্র ৭। বিশ্ব-বিখ্যাত শারিয়াবিদ ডঃ আবদুর রহমান ডোই-এর "শারিয়া দি ইসলামিক ল' " – পৃঃ ১৭৯।

সূত্র ৮। বিশ্ব-বিখ্যাত মওলানা ওয়াহিদুদ্দিনের "Women in Islami Sharia" পৃঃ ১১০।

সূত্র ৯। ইমাম শাফি'র বিখ্যাত কেতাব "রিসালা" পৃঃ ১৮২। এটিকে সমস্ত শারিয়া-বিজ্ঞানের মূল কেতাব বলে ধরা হয়।

সূত্র ১০। মওলানা মুহিউদ্দিনের অনুদিত বাংলা-কোরাণের তফসির পৃঃ ১২৪।

সূত্র ১১। বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ১ম খণ্ড ধারা ৩৪৪ পৃঃ ৪৭৮।

সূত্র ১২। "Documenting Women's Right Violations by Non-State Actors" by WLUML পৃঃ ৭০।

মুরতাদ হত্যার পক্ষে-বিপক্ষে

(ইসলাম কোন ইঁদুর-মারা কল নয় যে এতে ঢোকা যাবে কিন্তু বেরুনো যাবে না)

মুরতাদ তাকে বলা হয় যে আগে মুসলমান ছিল কিন্তু এখন ইসলাম ছেড়ে দিয়েছে। মুরতাদ দু'রকমের, ফিত্‌রি ও মিলি। ফিতরি – ফিতরা মানে স্বভাবজ। স্বাভাবিকভাবে মুসলিম হয়ে জন্মে ইসলাম ছেড়ে দিলে হয় মুরতাদ ফিত্‌রি। মুরতাদ মিলি হলো সে, যে অন্য ধর্ম থেকে ইসলাম গ্রহণ ক'রে তারপর ইসলাম ছেড়ে দিয়েছে। শারিয়া আইনে মুরতাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া আছে। সম্প্রতি প্রচণ্ড আন্তর্জাতিক চাপে আফগানিস্তানের মুরতাদ আবদুর রহমানকে ছেড়ে দেয়া হল। এর আগে শারিয়ায় শাস্তি-প্রাপ্ত নাইজেরিয়ার আমিনা লাওয়াল ও সাফিয়া, পাকিস্তানের ডঃ ইউনুস ও জাফরান বিবিকেও ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এ-রকমভাবে আন্তর্জাতিক চাপের মুখে বারবার শারিয়া পরাজিত হচ্ছে। এই পরাজিত হওয়াটাই প্রমাণ করে ওগুলো আল্লার আইন নয়। আল্লার আইন হলে এ-ভাবে পরাজিত হত না। আমরা এখন দেখব এই শারিয়া আইনের পক্ষে-বিপক্ষে কি কি যুক্তি আছে।

মূল শব্দটা হল 'রাদ্'। কোন কোন বিশেষজ্ঞ বলেন, এর সাথে সম্পর্কিত শব্দগুলো ইরতাদা, রিদ্দা এবং মুরতাদ সবই হল স্বকর্ম। নিজে থেকে না বললে বা না করলে বাইরে থেকে কেউ কাউকে স্বকর্ম করাতে পারে না। যেমন আত্মহত্যা। আত্মহত্যা যে করে সে-ই করতে পারে, অন্যেরা খুন করতে পারে কিন্তু কাউকে আত্মহত্যা করতে পারে না। ঠিক তেমনি মুরতাদও নিজে ঘোষণা করতে হয়, অন্য কেউ করিয়ে দিতে পারে না। মুরতাদের ওপরে কোরাণে কোথাও কোন পার্থিব দণ্ড নেই বরং এর ভেতরে মানুষের নাক গলানো নিষেধ করা আছে। আল্লাহ বলেছেন তিনি নিজেই তাকে শাস্তি দেবেন। কিছু উদাহরণ ঃ ইমরান ৮২, ৮৬, ১০৬, নাহ্‌ল ১০৬, মুনাফিকুন ৩, তওবা ৬৬ ও ৭৪, নিসা ৯৪ – "যে তোমাকে সালাম করে তাহাকে বলিও না যে, তুমি মুসলমান নও।" বাকারা ২১৭ – "যদি কেহ বিশ্বাস হইতে ফিরিয়া যায় ও অবিশ্বাসী হিসাবে মরে, তবে ইহকাল পরকালে তাহাদের সমস্ত কাজ বৃথা হইবে ও তাহারা আগুনে জ্বলিবে।" সবশেষে নিসা ১৩৭ – "যাহারা একবার মুসলমান হইয়া পরে আবার কাফের হইয়া গিয়াছে, আবার মুসলমান হইয়াছে এবং আবার কাফের হইয়াছে এবং কুফরিতেই উন্নতিলাভ করিয়াছে, আল্লাহ তাহাদেরকে না কখনও ক্ষমা করিবেন, না পথ দেখাইবেন।"

অর্থাৎ কোরাণ মুরতাদকে ইসলামে ফিরে আসার সুযোগ দিয়েছে। তাকে খুন করলে 'আবার মুসলমান' হবার সুযোগ সে পাবে না, সেই খুন সরাসরি কোরাণ লঙ্ঘন হয়ে যাবে। নবীজীর ওহি-লেখক আবদুল্লা বিন সা'আদ-ও মুরতাদ হয়ে মদিনা থেকে মক্কায় পালিয়ে গিয়েছিল। এ হেন মহা-মুরতাদকেও নবীজী মৃত্যুদণ্ড দেননি (ইবনে হিশাম-ইশাক পৃঃ ৫৫০) বরং হজরত ওসমান পরে তাকে মিশরের গভর্নর করেছিলেন। আরও বহু আয়াত মুরতাদ-হত্যার বিপক্ষে, যেমন ঃ

ইউনুস ৯৯ – "তুমি কি মানুষের উপর জবরদস্তি করিবে ইমান আনিবার জন্য?"
কাহ্‌ফ ২৯ – "যার ইচ্ছে বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যার ইচ্ছা অমান্য করুক।"
নিসা ৮০ – "আর যে লোক বিমুখ হইল, আমি আপনাকে (হে মুহম্মদ!) তাহাদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করি নাই।"
নিসা ৯৪ – "যে তোমাদেরকে সালাম করে তাহাকে বলিও না যে তুমি মুসলমান নও।"
বাকারা ২৫৬ – "ধর্মে জোর-জবরদস্তি নাই।" ইত্যাদি।

তবে মুরতাদ-হত্যার বিরুদ্ধে কোরাণের সবচেয়ে স্পষ্ট নির্দেশ আছে সুরা ইমরান-এর ৮৬ নম্বর আয়াতে। হারিথ নামে এক মুসলমান মুরতাদ হলে তার ওপরে নাজিল হয়েছিল এ আয়াত ঃ "কেমন করে আল্লাহ এমন জাতিকে হেদায়েত দেবেন যারা ইমান আনার পর ও রসুলকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেবার পর ও তাদের কাছে প্রমাণ আসার পর কাফের হয়েছে ?" নবীজী তাকে মৃত্যুদণ্ড কেন, কোন শাস্তিই দেননি (ইবনে হিশাম-ইশাক পৃঃ ৩৮৪)।

শারিয়ার অন্য একটি ভয়ানক আইন হল, মুরতাদকে যে কেউ রাস্তাঘাটে খুন করতে পারে, তাতে খুনীর মৃত্যুদণ্ড হবে না (বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন ১ম খণ্ড, ধারা ৭২)। অর্থাৎ কোন ধর্মান্ধ মোল্লা-মুফতি কাউকে মুরতাদ ঘোষণা করলে তাকে খুন করতে অন্য ধর্মান্ধকে উৎসাহিত করা হয়। মুসলিম-বিশ্বে এমন ঘটনা ঘটেছে এবং খুনীর শাস্তি হয়নি। মুরতাদের বিয়ে, সাক্ষ্য ও উত্তরাধিকারও বাতিল হয়ে যায়। পুরুষ-মুরতাদকে হত্যার সমর্থনে নামকরা বই হল মওদুদির "দ্য পানিশমেন্ট অব্ দি অ্যাপোস্টেট অ্যাকর্ডিং টু ইসলামিক ল'।"

এ-বইতে প্রথমে মওদুদি বলেছেন, "কোরাণ ও সুন্নাহ এ-ব্যাপারে বিশেষ ব্যাখ্যা দেয় না।" কথাটা মিথ্যা, কারণ ওপরে কোরাণ-রসুলের স্পষ্ট উদাহরণ দেখানো আছে। তিনি বরং তাঁর তাফহিমুল কুরাণ-এ সুরা বাকারা ২১৭ আয়াতের সমর্থনে বলতে বাধ্য হয়েছেন যে মুরতাদকে শুধুমাত্র "পরকালে আগুনে নিক্ষেপ করা হইবে।" এরপরেও তিনি কেন এই কোরাণ-বিরোধী আইনকে সমর্থন করলেন তা নীচে উল্লেখ করা হল। তিনি মুরতাদ-হত্যাকে সমর্থনের জন্য বহুদিক দিয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। সুরা তওবা-র আয়াত ১১ ও ১২-এর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি দাবি করেছেন যে ওখানে মুরতাদ হত্যার বিধান আছে। আয়াত দু'টো হল – "যদি প্রতিশ্রুতির পর তাহারা তাহাদের শপথ ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে বিদ্রূপ করে তবে কুফর-প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর। কারণ ইহাদের

কোন শপথ নাই যাহাতে তাহারা ফিরিয়া আসে...এখানে 'শপথ ভঙ্গ' কোনমতেই রাজনৈতিক চুক্তি হইতে পারে না। বরং ইহার পটভূমি নির্দেশ করে যে, ইহার অর্থ 'ইসলাম গ্রহণ ও পরে ইসলাম ত্যাগ করা'।" উদ্ধৃতি শেষ।

মওদুদির এই কথা সরাসরি কোরাণের বিপক্ষে যায়। সুরা তওবা'র উল্লেখ্য চুক্তি ও চুক্তিভঙ্গে মুরতাদের কোন কথাই নেই। এর পটভূমি হল মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে যুদ্ধবিরতি, যুদ্ধ-চুক্তিভঙ্গ ও যুদ্ধ-চুক্তি বাতিল। এ পটভূমি ধরা আছে ইসলামের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দুই সূত্র ইবনে হিশাম/ইশাক আর তারিখ আল্ তাবারিতে এবং বহু ইসলামি ওয়েবসাইটেও। তবে উদ্ধৃতি দিচ্ছি মওলানা মুহিউদ্দিনের অনুবাদ করা বাংলা কোরাণ থেকে যেন সবার পক্ষে মিলিয়ে নিতে সুবিধে হয়। ৫৫৩ ও ৫৫৬ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃতি ঃ "সুরা তওবার সর্বত্র কতিপয় যুদ্ধ, যুদ্ধ-সংক্রান্ত ঘটনাবলী এবং এ-প্রসঙ্গে অনেকগুলো হুকুম-আহাকাম ও মাসায়েলের বর্ণনা রয়েছে। যেমন আরবের সকল গোত্রের সাথে কৃত সকল চুক্তি বাতিলকরণ, মক্কা বিজয়, হোনাইন ও তাবুক যুদ্ধ প্রভৃতি...ষষ্ঠ হিজরী সালে ...তাদের সাথে হোদায়বিয়ায় সন্ধি হয়...এরপর পাঁচ-ছয় মাস অতিবাহিত হলে এক রাতে বনু বকর গোত্র বনু খোজা'র উপর অতর্কিত হামলা চালায়...অর্থাৎ হোদায়বিয়ার সন্ধি বাতিল হয়ে যায়, যাতে ছিল দশবছরকাল যুদ্ধ স্থগিত রাখার চুক্তি...এখানে (১১নং আয়াতে) বলা হয় যে, কাফেররা যত শত্রুতা করুক, যত নিপীড়ন চালাক, যখন সে মুসলমান হয় তখন আল্লাহ (যেমন) তাদের কৃত অপরাধগুলো ক্ষমা করেন...আলোচ্য দ্বাদশ আয়াতে বলা হচ্ছে যে, এরা যদি চুক্তি সম্পাদনের পর শপথ ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং ইসলামও গ্রহণ না করে, অধিকন্তু ইসলামকে নিয়ে বিদ্রূপ করে, তবে সেই কুফর-প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর।" উদ্ধৃতি শেষ। এত চমৎকার আয়াতের বিকৃত ব্যাখ্যা করেছেন মওদুদি।

দুনিয়াবি শাস্তিদানের ব্যাপারে কোরাণের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। আল্লাহ কখনও মুসলমানকে সরাসরি বলেছেন বিপক্ষকে আঘাত করতে বা হত্যা করতে (সুরা মুহম্মদ ৪ ইত্যাদি)। আবার কখনও স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, বিপক্ষকে আল্লাহ মুসলিমদের হাতে শাস্তি দেবেন (সুরা তওবা আয়াত ১৪, ইত্যাদি)। মুরতাদকে হত্যা করার বিধান থাকলে সেটা এ-রকম সুস্পষ্ট শব্দে কোরাণে অবশ্যই থাকত, মওদুদির ভাবের গরুকে জবরদস্তি গাছে ওঠাতে হত না। কোরাণে এ-ও আছে – "মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে যারা আল্লাহ'র সে দিনগুলো সম্পর্কে বিশ্বাস রাখে না যাতে তিনি কোন সম্প্রদায়কে কৃতকর্মের প্রতিফল দেন" (সুরা জাসিয়া ১৪)। সুরা তওবা ছাড়া আর মাত্র একটা সুরাকে মওদুদি মুরতাদ হত্যার সমর্থনে টানার চেষ্টা করেছেন, সেটা হল নিসা আয়াত ৮০। কিন্তু মওদুদির বোধহয় মনে নেই যে তিনি নিজেই তাঁর তফহিমুল কুরাণে সুরা নিসা ৮০-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন – "নবীজী'র প্রতি দায়িত্ব দেয়া হইয়াছে **শুধুমাত্র** আল্লাহ'র আদেশ-নির্দেশ লোকদের কাছে পৌঁছানো এবং তিনি তাহাতে ভালভাবেই সফল হইয়াছেন। তাহাদিগকে সত্যপথে বাধ্য করা তাঁহার দায়িত্ব ছিল না।"

কিন্তু তাহলে যে লোক মুসলমান থাকতে চায় না তাকে খুন করার ভয় দেখিয়ে মুসলমান রাখা সরাসরি কোরাণ-লঙ্ঘন ও নবীজী'র অপমান নয়?

তাছাড়া, তাঁর ব্যাখ্যাটি কোরাণের এত এত আয়াতের বিরুদ্ধে কেন গেল সেটা মওদুদির বলা উচিত ছিল। কোরাণে বিশেষ সুবিধে করতে না পেরে মওদুদি আঁকড়ে ধরেছেন হাদিস। তাঁর প্রথম হাদিস "নবীজী বলিয়াছেন যে ব্যক্তি ধর্মত্যাগ করে তাহাকে হত্যা কর" (বোখারী ২৮৫৪ নং হাদিস- মওলানা আবদুল জলিলের অনুবাদ) নিয়ে মওলানাদের মধ্যেই মহা-বিতর্ক আছে কারণ তাহলে যারা তাদের ধর্ম ত্যাগ ক'রে ইসলাম গ্রহণ করে তাদেরকেও খুন করতে হয়। নবীজীর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য জীবনী "সিরাত"-এ (ইবনে হিশাম/ইশাক) উবায়রাক ছাড়াও আমরা নবীজীর সময়ে তিনজন মুরতাদের দলিল পাই। তারা হল হারিথ, নবীজীর ওহি লেখক ইবনে সা'দ, এবং উবায়দুল্লাহ – পৃষ্ঠা ৩৮৪, ৫২৭ ও ৫৫০। এ তিনজনের কাউকে মৃত্যুদণ্ড কেন, কোনো শাস্তিই দেননি রসুল। তিনি মনে কষ্ট পেয়েছেন, তবু সর্বদা মেনে চলেছেন লা-ইকরাহা ফিদ্দিন, – ধর্মে জবরদস্তি নাই – বাকারা ২৫৬। দলিলে এ-সব ঘটনা আছে নামধাম, তারিখ, ঘটনার বিবরণ সহ। দেখুন সহি বুখারি ৯ম খণ্ড হাদিস ৩১৮ ঃ জাবির বিন আবদুল্লা বলেন, এক বেদুইন আল্লাহ'র রসুলের কাছে বায়াত গ্রহণ করিল। পরে মদিনায় তাহার জ্বর হইলে সে আল্লাহ'র রসুলের নিকট আসিয়া বলিল 'হে আল্লাহ'র রসুল, আমার বায়াত ফিরাইয়া দিন।' রসুল সম্মত হইলেন না। তারপর সে আবার আসিয়া বলিল 'হে আল্লাহ'র রসুল, আমার বায়াত ফিরাইয়া দিন।' রসুল সম্মত হইলেন না। তারপর সে আবার আসিয়া বলিল 'হে আল্লাহ'র রসুল, আমার বায়াত ফিরাইয়া দিন।' রসুল সম্মত হইলেন না। তারপর সে মদিনা ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ইহাতে আল্লাহ'র রসুল বলিলেন– "মদিনা একটি উনুনের মতো, – ইহা ভেজালকে বাহির করিয়া দেয় এবং ভালোকে পরিষ্কার ও উজ্জ্বল করে।"

এই যে স্বয়ং নবীজীর সামনে প্রকাশ্যে ইসলাম ত্যাগ – মৃত্যুদণ্ড তো দূরের কথা, কোথায় হুঙ্কার বা কোথায় শাস্তি? আমাদের শারিয়াপন্থীরা কি ভেবে দেখেছেন কার বানানো শারিয়া আর কার বানানো 'ইসলাম'-এর শিকার হয়েছেন তাঁরা?"

মওদুদির দেখানো আটটি হাদিসে নামধাম সহ কোন ঘটনারই উল্লেখ নেই, শুধু "নবীজী বলিয়াছেন মুরতাদকে খুন কর" এইধরনের বায়বীয় কথা আছে। একটিমাত্র উদাহরণ মওদুদি পেয়েছেন নবীজীর প্রায় সাড়ে তিনশ' বছর পরে লেখা ইমাম বায়হাকি থেকে, এক নারী-মুরতাদের মৃত্যুদণ্ডের ঘটনা। তারও নামের ঠিক নেই, বলা আছে উম্মে রুমান বা উম্মে মারোয়ান। ইমাম বায়হাকির এ-হাদিস নির্ভরযোগ্য নয় কারণ ইমাম আবু হানিফা নারী-মুরতাদের শাস্তি রেখেছেন বন্দিত্ব – হত্যা নয়। এবং ইমাম আবু হানিফা ইমাম বায়হাকি'র অনেক আগের লোক, নবীজীর কাছাকাছি সময়ের লোক। বায়হাকির এ-তথ্য একেবারেই ভিত্তিহীন, তা দলিল ধরে

ধরে দেখিয়েছেন পাকিস্তানের ইসলাম গবেষণা কেন্দ্রের (আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং ইসলাম) পরিচালক ডঃ জাভেদ ঘামিদি। তাছাড়া কোরাণ-হাদিসে বিরোধ হলে কোরাণই জিতবে এটা তাঁর মতো মওলানাদেরই দাবি সেটাও মওদুদি নিজেই মানেননি।

এবারে মওদুদি নির্ভর করেছেন হজরত আবু বকরের ওপরে। তিনি বলেছেন, দূরের কিছু গোত্র মুরতাদ হয়েছিল এবং হজরত আবু বকর সৈন্য পাঠিয়ে তাদের পরাজিত করেছেন। কথাটা এত সহজ নয়, এর মধ্যে কথা আছে। মওদুদি হজরত আবু বকরের চিঠি উল্লেখ করে তাঁকে এক হালাকু খান বানিয়ে ছেড়েছেন। হজরত আবু বকর নাকি তাঁর সিপাহসালারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন – 'ইসলাম কবুল না করলে কাউকে জীবন্ত ছাড়বে না, আগুন জ্বালিয়ে তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেবে এবং তাদের নারী ও শিশুদেরকে ক্রীতদাস বানিয়ে রাখবে।' তাহলে হজরত আবু বকর কি কোরাণ লঙ্ঘন করলেন ? কোথায় গেল নবীজীর নির্দেশ – নারী ও শিশুদের হত্যা করবে না – সহি ইবনে মাজাহ ৪র্থ খণ্ড ২৮৪১, ২৮৪২ ? কোথায় গেল বাকারা ২৫৬ ("ধর্মে জোর-জবরদস্তি নাই") ? এভাবেই মওদুদি হজরত আবু বকরের চরিত্রহনন করেছেন। নবীজীর ওফাত-এর পর স্বভাবতই কিছু বিশৃঙ্খলা হয়েছিল। কেউ কেউ হজরত আবু বকরের সামাজিক নেতৃত্ব মানতে চাইল না। যারা নিরুপায় হয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মুসলমান হয়েছিল তারা তাদের ধর্মে ফিরে গেল। কেউ কেউ নবীত্ব দাবি করে বসল, তাদের কিছু 'সাহাবি'ও গজাল। তবে প্রধান কারণ হল, কিছু গোত্র মনে করত নবীজীর গাদির-এ খুম মাঠের বক্তৃতা ও অন্যান্য বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে হজরত আলীর প্রথম খলিফা হবার কথা। তাই তারা প্রথমে হজরত আবু বকরের সরকারকে অবৈধ সরকার হিসেবে জাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল, ইসলাম ত্যাগ করেনি।

হজরত আবু বকরের এ-যুদ্ধ ছিল রাজনৈতিক। এর প্রমাণও আছে। সরকার প্রধান হিসেবে তিনি সরকার-বিরোধীদের সাথে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন। সবচেয়ে বিখ্যাত যুদ্ধটা হয়েছিল তাঁর পাঠানো সেনাপতি কুরাইশ গোত্রের খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং মুসলমান গোত্র বনু ইয়ারবু-য়ের নেতা মালিক বিন নুয়াইরাহ-য়ের মধ্যে। মৃত্যুর আগে নবীজী মালিককে তার গোত্র থেকে জাকাত আদায় করতে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর হজরত আবু বকর খলিফা হলে মালিক তাঁর সরকারকে অবৈধ সরকার হিসেবে জাকাত দিতে অস্বীকার করে। যুদ্ধের ময়দানে মালিক খালিদকে স্পষ্টই বলে যে সে মুসলমান কিন্তু হজরত আবু বকরকে মানে না কারণ খলিফা হবার কথা হজরত আলী'র। যুদ্ধে সে পরাজিত হয় এবং তার মাথার খুলিতে খালিদ বহুদিন খেয়েছে। মুসলমানের সাথে মুসলমানের যুদ্ধ ও খুন এই প্রথম, সারা মুসলিম সমাজ এতে আতঙ্কে শিউরে উঠেছিল। এমনকি হজরত ওমর পর্যন্ত খাপ্পা হয়ে বলেছিলেন "মুসলমানকে খুন করার জন্য খালিদের শাস্তি হওয়া উচিত" (সূত্র ঃ উৎস তারেক ফাতাহ্ লিখিত অসাধারণ বই "Chasing a Mirage" – অর্থাৎ "মরীচিকার পেছনে ছোটা" থেকে মুসলিম ইতিহাসের বিখ্যাত লেখক আলী আবদুল রাজিক-এর "ইসলাম অ্যাণ্ড দ্য ফাণ্ডামেন্টাল্স্ অব্ অথরিটি" পৃষ্ঠা ৫২০।

এবারে মওদুদি সমর্থন নিয়েছেন অতিতের ইমামদের থেকে। হ্যাঁ, প্রায় প্রতিটি শারিয়া-ইমামই মুরতাদ-হত্যার পক্ষে রায় দিয়েছেন। কিন্তু আমরা সেটা প্রত্যাখ্যান করি কোরাণের ভিত্তিতে। আসল কথাটা হল, পরকীয়ার প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের মত মুরতাদ-হত্যার আইনও এসেছে ইহুদী কেতাব ডিউটেরনমি থেকে। উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ "(যদি কেহ) বলে 'চল আমরা অন্য স্রষ্টাকে সেবা করি' ... তবে তোমরা নিশ্চয় তাহাকে হত্যা করিবে ... তাহাকে প্রস্তরের আঘাতে হত্যা করিবে ..." ইত্যাদি।

এ-আইনের ইহুদী-সূত্র ও কোরাণ-বিরোধীতা জেনেও মওদুদি কেন একে সমর্থন করলেন তার সুগভীর কারণ আছে। তাঁর আতঙ্ক আসলে অন্য জায়গায়। জনগণ যদি একবার জেনে ফেলে শারিয়ায় কোরাণ-বিরোধী আইন আছে তাহলে তারা শারিয়াকে সন্দেহ করা শুরু করবে। ধীরে ধীরে তারা শারিয়ার বাকি অনেক আইনেরও কোরাণ-বিরোধী চরিত্র জেনে ফেলবে, শারিয়া 'আল্লার আইন' এ-কথার পায়ের নীচে মাটি থাকবে না। তখন শারিয়া-ভিত্তিক ইসলামি রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠাও অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাই তিনি প্রাণপণ শারিয়ার সব আইনকে সমর্থন করেছেন। ওই বইতে তিনি বলেছেন (সংক্ষিপ্ত) – "মুরতাদের মৃত্যুদণ্ডের ব্যাপারে কোন অস্পষ্টতা কোনকালেই ছিল না। যে-ব্যাপারে ক্রমাগত ও অবিচ্ছিন্ন সাক্ষ্যের সমর্থন রহিয়াছে উহার প্রতি যদি সন্দেহ জন্মায় তাহা হইলে সে সন্দেহ একটি বা দুইটি সমস্যায় সীমাবদ্ধ থাকিবে না ... ইহা এমন পর্যায়ে চলিয়া যাইবে যে, মুহম্মদের জীবনের উদ্দেশ্য পর্যন্ত প্রশ্নের সম্মুখীন হইবে।"

কথাটা মিথ্যা। শারিয়ার এ-আইন কোরাণ-বিরোধী তা সবাই জানে, তাই চিরকাল বহু বহু সুফি-দরবেশ ও ইসলামি বিশেষজ্ঞ এর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করেছেন। বিশ্ব-জামাতিরা ভালভাবেই জানেন যে মুরতাদ-হত্যা কোরাণ-বিরোধী। ইউরোপিয়ান ফতোয়া ও গবেষণা কাউন্সিলের সদস্য বিশ্ব-বিখ্যাত শারিয়া সমর্থক ডঃ জামাল বাদাওয়ী পর্যন্ত এটা স্বীকার করে বলেছেন – "কোরাণের কোন আয়াতেই মুরতাদের দুনিয়ায় শাস্তির বিধান নাই। কোরাণ বলে, এই শাস্তি শুধুমাত্র পরকালেই হইবে" – (ফতোয়া কাউন্সিলের ওয়েবসাইট)। এমনকি আমাদের বাংলাদেশ শারিয়ার তাত্ত্বিক গুরু জনাব শাহ আবদুল হান্নান-ও বলেছেন – "অতিতের অনেক ইসলামি বিশেষজ্ঞের মতে সৈয়িদ মওদুদি প্রাচীন মতে (অর্থাৎ মুরতাদের মৃত্যুদণ্ডে – *লেখক*) বিশ্বাস করিতেন। বর্তমানের বেশির ভাগ ইসলামি বিশেষজ্ঞ এই বিষয়ে তাঁহার সহিত বা প্রাচীন বিশেষজ্ঞের সহিত একমত নহেন। যখন কোন বিষয়ে মতভেদ হয় বা একাধিক মতামত হয় তখন কোন একজন বিশেষজ্ঞের ইজতিহাদকে মানিতে কেহ বাধ্য নহে। ব্যক্তিগতভাবে আমি এই বিষয়ে সৈয়িদ মওদুদির সহিত একমত নহি" (ইন্টারনেট, বাংলারনারী আলোচনা ফোরাম – ৭ এপ্রিল, ২০০৬)। বিশ্বের সেরা জামাতি ডঃ ইউসুফ কারজাভি আগে এই শারিয়া আইনের সমর্থক ছিলেন (http://en.wikipedia.org/wiki/European_Council_for_Fatwa_and_Research),

সম্প্রতি তিনি মত বদলিয়ে এর বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছেন (দৈনিক সংগ্রাম ২৮শে মার্চ ২০০৬ ও দৈনিক ইনকিলাব ১৪ই এপ্রিল ২০০৬)। ২০০5 সালে উৎপাটিত ক্যানাডায় শারিয়া-কোর্টের পক্ষে সবচেয়ে বিখ্যাত মওলানা আল্ আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা মুবিন শেখ। ক্যানাডার শারিয়া কোর্টের বিরুদ্ধে আমরা যখন আন্দোলন শুরু করি তখন তিনি টেলিভিশনে আমার সাথে বিতর্ক করেন। সেই টেলিভিশন প্রোগ্রামে তিনিও বলেছেন মুরতাদ হত্যার শারিয়া আইন কোরাণ-বিরোধী।

রাজনৈতিক, সামরিক বা অন্যান্য প্রতিপক্ষকে মুরতাদ ঘোষণা করে খুন, হেনস্থা বা দেশছাড়া করার ঘটনায় মুসলিম ইতিহাস ভর্তি। কিন্তু অন্য ঘটনাও আছে। ১৭২৮ সালের শারিয়া-কোর্টের সিসিল দলিলে আমরা দেখি মুফতি'র কাছ থেকে ফতোয়া এনে জয়নাবের পিতা মোস্তফা কোর্টে বলেন যে জয়নাবের স্বামী ইব্রাহীম ইসলামি ধর্ম ও ধর্মবিশ্বাসকে অভিশাপ দিয়েছে, কাজেই তাদের তালাক হওয়া উচিত। দু'জন সাক্ষী দ্বারা এটা প্রমাণিত হলে কোর্ট বিয়ে বাতিলের রায় দিয়ে ইব্রাহীমকে আদেশ দিয়েছে মোহরের অর্থ ফিরিয়ে দিতে (উইমেন, দ্য ফ্যামিলি অ্যাণ্ড ডিভোর্স ল'জ্ ইন্ ইসলামিক হিস্ট্রি – ডঃ আমিরা আজহারী সনবল, পৃষ্ঠা ১১৯।

এ ফতোয়া বা রায়ে আমরা মৃত্যুদণ্ড দেখি না।

কোরাণের অপব্যাখ্যা করে বিশ্ব-মুসলিমকে কি ভয়ানকভাবে পৃথিবীর সমস্ত অমুসলিমদের বিপক্ষে যুদ্ধংদেহী করে দাঁড় করানো হয়েছে দেখলে আতঙ্কিত হতে হয়। যেমন, কোরাণ সুরা আরাফ-এর আয়াত ১৭২-কে অপব্যাখ্যা করে বলা হয়, পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ মুসলমান হয়ে জন্মায় (বহু সূত্র, এবং দৈনিক ইনকিলাব, ১৫ই মে, ২০০৬)। যাঁরা এ অপব্যাখ্যা করেন তাঁরা কি খেয়াল করেছেন, এ-ব্যাখ্যায় পৃথিবীর প্রতিটি অমুসলিম 'মুরতাদ' হিসেবে শারিয়া মোতাবেক হত্যার যোগ্য ? কোরাণের অপব্যাখ্যা মাঝে মাঝে এত উদ্ভট ও হাস্যকর হয় যে বলার নয়। যেমন, মওলানা মুহিউদ্দিন খানের অনুদিত বাংলা-কোরাণে সুরা ওয়াক্বেয়া'র ৩৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা করা আছে এভাবে – "জান্নাতের নারীদের এমনভাবে সৃষ্টি করা হবে যে, প্রত্যেক সহবাসের পর তারা আবার কুমারী হয়ে যাবে" – পৃষ্ঠা ১৩২৭। সেটা কি-ভাবে সম্ভব, এবং এ-খবরটা তাঁকে কে দিল, জানা দরকার। এগুলো আসলে ইসলামের নামে মুসলমানকে কামুক করার চেষ্টা, তাদের সামনে টোপ ফেলার চেষ্টা।

ইসলাম কি ইঁদুর-মারা কল যে এতে ঢোকা যাবে কিন্তু বেরুনো যাবে না ? যেখানে অসংখ্য অমুসলিম মুসলমান হচ্ছে সেখানে দু'চারজন ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেলে সেটা উপেক্ষা করলেই তো "লা ইকরাহা ফিদ্বীন" (ধর্মে জবরদস্তি নেই)–এর মর্যাদা রক্ষা হয় ! এ-মর্যাদা নবীজী কিভাবে রক্ষা করেছেন তা দিয়ে শেষ করছি, – প্রতিটি শব্দ খেয়াল করে পড়বেন ঃ

"উসামা বিন জায়েদ বলিয়াছে – 'যখন আমি ও এক আনসার তাহাকে (মিরদাস বিন নাহিক নামে এক অমুসলিমকে যার গোত্রের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ চলছিল—লেখক) আমাদের অস্ত্র দিয়া আক্রমণ করিয়া পাকড়াও করিলাম তখন সে কলমা উচ্চারণ করিল। কিন্তু আমরা থামিলাম না এবং তাহাকে হত্যা করিলাম।' রসুলের নিকট আসিয়া আমরা এই ঘটনা বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেন – 'কলমার দায় হইতে কে তোমাকে রক্ষা করিবে, উসামা ?' আমি বলিলাম, 'লোকটি শুধু মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচিবার জন্য কলমা উচ্চারণ করিয়াছে।' কিন্তু তিনি প্রশ্নটি করিতেই থাকিলেন এবং করিতেই থাকিলেন। তখন আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম এবং বলিলাম আমি আর কখনোই তাহাকে খুন করিব না যে কলমা উচ্চারণ করিয়াছে। তিনি বলিলেন – 'আমার (মৃত্যুর) পরেও তুমি এইকথা বলিবে তো ?' আমি বলিলাম, 'বলিব'।"(রসুলের সবচেয়ে বিখ্যাত জীবনী ইবনে হিশাম ইবনে ইশাক থেকে, পৃষ্ঠা ৬৬৭)। অর্থাৎ নবীজী মুরতাদ-ঘোষণার বিরুদ্ধে ভবিষ্যতের গ্যারান্টি চেয়েছেন। সে গ্যারান্টি দিতে হবে প্রতিটি মুসলমানকে।

কলমার দায় বড় দায়, কলমার অপমান ইসলামের অপমান ! অন্য সূত্রে ইমাম হাম্বলের মসনদ ৬ষ্ঠ খণ্ড ২৬০-র উদ্ধৃতিতে পাওয়া যায় নবীজীর তীক্ষ্ণ প্রশ্ন – 'তুমি কি তাহার বক্ষ চিরিয়া দেখিয়াছ ?'-(বহু হাদিসের সুত্রে ডঃ ত্বাহা জাবির আল্ আলওয়ানী – "দি এথিক্স অব্ ডিসএগ্রিমেন্ট ইন্ ইসলাম)। আজ যাঁরা মুরতাদ ঘোষণার হুঙ্কার দেন তাঁদেরকে মনে করিয়ে দিতে চাই নবীজীর বড় বেদনা বড় কষ্টের সেই উচ্চারণ ঃ 'তুমি কি তাহার বক্ষ চিরিয়া দেখিয়াছ ?' কলমার দায় হইতে কে তোমাকে রক্ষা করিবে, হে মুরতাদ-ঘোষণাকারী ?

শারিয়ার রজম !

(প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড)

ব্যভিচার কি ? ব্যভিচার বা পরকীয়া হলো যার সাথে বিয়ে হয়নি তার সাথে অবৈধ দৈহিক সম্পর্ক। পশ্চিমের আইনে নর-নারী রাজি থাকলে পরকীয়া অপরাধ নয়, তাই সেখানে আজকাল পরকীয়া খুব বেড়ে গেছে। এর ফলে পশ্চিমে পারিবারিক বন্ধন নষ্ট হবার পথে। কোরাণে ব্যভিচারকে বর্জন করার সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে (সুরা বনি ইসরাইল ৩২, মুমতাহানা ১২, ইত্যাদি)। ব্যভিচারিণীদের শাস্তি হিসেবে বলা আছে আজীবন ঘরে বন্দি রাখতে অথবা আল্লাহ্ অন্য কোন পথ নির্দেশ না করা পর্যন্ত – সুরা নিসা, আয়াত ১৫। আর আছে ব্যভিচারী নারী-পুরুষকে একশ' করে চাবুক মারতে – সুরা নূর, আয়াত ২। অথচ শারিয়া আইনে আছে বিবাহিত বা বিবাহিতা অপরাধীর শাস্তি জনগণের সামনে পাথরের আঘাতে মৃত্যুদণ্ড, যাকে রজম বলা হয়। আর যার বিয়ে হয়নি তাকে একশ' চাবুক – (সূত্র ঃ হানাফি আইন হেদায়া পৃষ্ঠা ১৭৮, বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ১ম খণ্ড, ধারা ১২৯, পাকিস্তানের হুদুদ আইন ৭-১৯৭৯, অর্ডিন্যান্স ২০-১৯৮০ দ্বারা পরিবর্তিত, আইন নম্বর ৫ (২)-এর "অ" ইত্যাদি)। অর্থাৎ এ-আইন কোরাণকে লঙ্ঘন করেছে।

অনেকে এ-আইনের সমর্থনে হাদিস পেশ করেন মিশকাত (২৬ অধ্যায়ের ১ম পরিচ্ছেদ) আর সহি বোখারী থেকে (হাফেজ মহাম্মদ আবদুল জলিল সম্পাদিত বাংলায় বোখারি শরীফের মোটামুটি হাদিস নম্বর ১২৩৪ থেকে ১২৪৯ পর্যন্ত, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসিন খানের অনুবাদ ও মওলানা আজিজুল হক সাহেবের অনুবাদ ২৬৮ নম্বর হাদিস)। এ-সব হাদিসে বলা আছে, নবীজী বিবাহিত/তা-দের মৃত্যুদণ্ড, আর অবিবাহিত/তা-দের একশ' চাবুক ও এক বছরের নির্বাসন দিয়েছিলেন।

তাহলে আমরা দেখছি, কোরাণের আয়াতের সাথে হাদিসগুলো মিলছে না। কেন এমন হচ্ছে ? তাহলে নবীজী কি সুরা নূর নাজিল হবার আগে পরকীয়ায় বিবাহিত/তা-দের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন ? এ-প্রশ্নের জবাব আছে ১২৪২ নম্বর হাদিসে, সাহাবী বলেছেন তিনি তা জানেন না। আমরা ধরে নিতে পারি যে নবীজী রজম করে থাকলে এ-সব আয়াত নাজিল হবার আগেই করেছিলেন, পরে নয়। কেননা পরে করলে তা কোরাণের বিপক্ষে যেত, সেটা সম্ভব নয়।

এবারে একটা বিখ্যাত হাদিস দেখা যাক। সহি বোখারি হাদিস ১২৩৭, ১২৩৮, ১২৩৯, এবং মিশকাত ২৬-এর ১ ("মুসলিম জুরিসপ্রুডেন্স অ্যাণ্ড দ্য কোরাণিক ল' অফ ক্রাইম্স্" থেকে) হাদিস থেকে আমরা দেখি ঃ

১। মায়াজ নামের সাহাবি নবীজীকে বলল তাকে পবিত্র করতে।
২। নবীজী তাকে হাঁকিয়ে দিলেন এই বলে – দূর হও, অনুতাপ কর ও ক্ষমা চাও।
৩। মায়াজ ফিরে গিয়ে আবার ফিরে এসে একই কথা বলল। নবীজী একই কথা বললেন।
৪। তিনবার এটা ঘটার পর নবীজী জিজ্ঞেস করলেন – ব্যাপার কি। মায়াজ বলল সে ব্যভিচার করেছে।
৫। তারপর নবীজী জিজ্ঞাসা করলেন, মায়াজ কি পাগল ? নেশা করেছে ? লোকেরা বলল, না।
৬। নবীজী জিজ্ঞাসা করলেন – মায়াজ কি বিবাহিত ? লোকেরা বলল, হ্যাঁ।
৭। তখন নবীজী তাকে পাথর মেরে হত্যা করতে নির্দেশ দিলেন।

এ-হাদিস সত্যি হলে নবীজী অন্তত তিনবার তাকে অনুতাপ-ক্ষমার দিকে ঠেলেছেন, শাস্তি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন, শেষে একান্ত বাধ্য হয়েই রজম ঘোষণা করেছেন। শারিয়ার আইনে এই সুন্নত মেনে কোন 'অপরাধী'-কে তিনবার ফিরিয়ে দেয়ার নিয়ম নেই। পাগলামি বা নেশার কথা জিজ্ঞেস করাও নেই। আমরা জানি মানুষ ভ্রান্তিময়, অপরাধ এক হলেও সব অপরাধী এক হয় না। একই অপরাধ কেউ করে অভাবে, কেউ করে স্বভাবে, খাসলতে। একই অপরাধ কেউ করে উত্তেজনার গরম মাথায়, কেউ করে পরিকল্পনা করে ঠাণ্ডা মাথায়। সে-জন্যই একই অপরাধের সর্বদা একই শাস্তি হতে পারে না। অথচ শারিয়ার হুদুদে ঠিক তাই'ই হয়, হঠাৎ-অপরাধ ও খাসলতের অপরাধে বিচারককে একই শাস্তি দিতে হয়, তাঁর হাত-পা বাঁধা থাকে।

লোকেরা মায়াজকে পাথর মারা শুরু করতেই ব্যথার চোটে হতভাগার মনে হল যে পবিত্র হয়ে এখনই পটল তোলার চেয়ে তওবা টওবা করে আরও কিছুদিন বেঁচে থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। লেজ তুলে সে দিল দৌড়। কিন্তু লোকেরা ওকে ধরে মেরে ফেলল। এ-ঘটনা শুনে নবীজী কি বললেন ? কি করলেন ? মৃদুকণ্ঠে উচ্চারিত হল তাঁর লিখিত আইন ভাঙ্গা অলিখিত আইন – "লোকটাকে তোমরা যেতে দিলে না কেন ?" – মিশকাত ২৬-এর ১, সহি ইবনে মাজাহ ৪র্থ খণ্ড হাদিস ২৫৫৪ ও সহি সুনান আবু দাউদ হাদিস ৪৪০৫ ও ৪৪০৬। এই হলেন রহমতুল্লিল আল্ আমিন, এই হল ভ্রান্তিময় অনুতপ্ত মানুষের প্রতি তাঁর অগাধ দরদ, অসীম ক্ষমা। তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি শুধু শাস্তির দিকেই নয়, ক্ষমার দিকেও। স্বভাব-অপরাধীর খাসলত আর ভালো মানুষের হঠাৎ পা পিছলে যাবার মধ্যেকার বিরাট ফারাকটা জানেন বিশ্বনবী।

আবার কোরাণে ফিরে আসি। সুরা নিসা, আয়াত ১৬ ঃ "তোমাদের মধ্য হইতে যেই দুইজন সেই কুকর্মে লিপ্ত হয়, তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান কর। অতঃপর যদি উভয়ে তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে, তবে তাহাদের হইতে হাত গুটাইয়া নাও।"

কোথায় পাথর, কোথায় মৃত্যুদণ্ড ? মেরে ফেলার পর তার লাশ কি তওবা করবে নাকি, নিজেকে সংশোধন করবে নাকি ? এর চেয়েও কঠিন প্রমাণ আছে কোরাণে ঃ সুরা নিসা, আয়াত ২৫ – দাসী-স্ত্রী পরকীয়া করলে তাকে "স্বাধীন-নারীদের অর্ধেক শাস্তি" দিতে হবে। এ-আয়াতের ব্যাখ্যায় শারিয়াপন্থীরা বলেন স্বাধীন নারী মানে স্ত্রী নয়, অন্য অবিবাহিতা নারী

যাকে একশ' চাবুক মারার বিধান আছে। কিন্তু চাবুক মারার আয়াত আছে তো সব ব্যভিচারীর বেলায়। আয়াতটা পড়ে দেখুন, স্পষ্ট বোঝা যায় দাসী নয় এমন নারীকে বিয়ে করা স্ত্রীর কথাই বলা হচ্ছে। তাকে মৃত্যুদণ্ড দিলে দাসী-স্ত্রীর কি শাস্তি হবে ? মৃত্যুদণ্ডের তো অর্ধেক হয় না।

আসলে পরকীয়ার মৃত্যুদণ্ডের বিধান এসেছে ইহুদী-কেতাব ডিউটেরোনমি থেকে। "যদি কাহাকে অন্য লোকের স্ত্রীর সহিত বিছানায় দেখা যায় তবে তাহাদিগকে মরিতে হইবে ... তখন তোমরা উহাদিগকে নগরের ফটকে লইয়া আসিবে এবং পাথর দ্বারা আঘাত করিবে যাহাতে তাহারা মরিয়া যায় ...।"

শারিয়ার পক্ষে হজরত ওমরের নামে বিখ্যাত এক হাদিস আছে, সহি মুসলিম ২য় খণ্ডের ৬৫ পৃষ্ঠাতে (মুহিউদ্দীন খানের বাংলা-কোরাণ, পৃষ্ঠা ৯২৬) আর সহি বোখারী ১২৪৩ ও ১২৪৯ (হাফেজ আবদুল জলিল), বোখারী ৮ম খণ্ড হাদিস ৮১৭ (ডঃ মুহসিন খান, মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়) এবং ইবনে হিশাম/ইশাক -৬৮৪ পৃষ্ঠায় ঃ "আল্লাহতালা যাহা নাজেল করিয়াছেন তাহার মধ্যে রজমের আয়াতও রহিয়াছে ... রসুলুল্লাহ (দঃ) রজম করিয়াছেন তাই আমরাও তাঁহার পরে রজম করিয়াছি ... রজমের আয়াত পাঠ মনসুখ (বাতিল) হইয়া গিয়াছে কিন্তু হুকুম ও বিধান চালু রহিয়াছে।" কিন্তু সেই বাতিল আয়াতটা কি ? কোথায় সেটা উধাও হল ? আয়াতটা হল -"কোন বয়স্ক নর ও নারী ব্যভিচার করিলে তাহাদিগকে পাথর মারিয়া হত্যা কর" – সহি ইবনে মাজাহ্ ৪র্থ খণ্ড হাদিস নং ২৫৫৩। কিন্তু এর মধ্যে ফাঁক আছে। কারণ আইন বাতিল হলে তার শাস্তি চালু থাকতে পারে না। আয়াতটা কোথায় উধাও হল তা লেখা আছে ইমাম হাম্বলের দলিলে আর সহি ইবনে মাজাহ ৩য় খণ্ড হাদিস নং ১৯৪৪-এ। এ-এক মারাত্মক হাদিস, দেখুন – "বর্ণিত আছে যে বিবি আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, "রজমের আয়াত নাজিল হইয়াছিল। অবশ্যই ইহা একটি কাগজের উপরে লিখা হইয়াছিল যাহা আমার কুশনের নীচে রাখা ছিল। রসুল (দঃ)-এর ইন্তেকালের পর আমরা যখন তাঁহার সৎকার করিতে ব্যস্ত ছিলাম তখন একটি গৃহপালিত ছাগল ঘরে ঢুকিয়া উহা খাইয়া ফেলে।" এর ফটোকপি দেয়া হলো।

> ١٩٤٤ - حدثنا أَبو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَـــنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَـــةَ. و عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: لَقَدْ نَزَلَـــتْ آيَـــةُ الرَّجْمِ ، وَرَضَاعَةُ الْكَبِيرِ عَشْرًا. وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِي. فَلَمَّـــا مَاتَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَتَشَاغَلْنَا بِمَوْتِهِ ، دَخَلَ دَاجِنٌ فَأَكَلَهَا.

> 168 *Sunan Ibn-i-Mãjah Vol. III*
>
> **1944. 'Ã'isha** (Allah be pleased with her) is reported to have said, "The verse concerning stoning the fornicator to death (*rajm*) and ten suckling of a young man have been revealed Indeed it was recorded on a piece of paper lying under my cushion. When Allah's Messenger (peace and blessings of Allah be upon him) breathed his last, we were occupied by his death, a domestic goat entered and ate it up (swallowed it)."

বিশ্ব-মুসলিমের জন্য এ-এক মারাত্মক হাদিস। কারণ সুরা হিজ্‌র, আয়াত ৯-এ আল্লাহ সুস্পষ্ট বলেছেন – "আমিই এই উপদেশগ্রন্থ নাজিল করিয়াছি এবং আমিই উহা সংরক্ষণ করিব।" আল্লাহ পাক-এর কালাম ছাগলে খাওয়া ছাড়াও এ হাদিস আরও এক ভয়াবহ সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিচ্ছে। তা হলো, নাজিল হওয়া আয়াত কোরাণে নেই। অন্যান্য আয়াত বাতিলের হাদিসও আছে, বুখারী ৪র্থ খণ্ড ৬৯। কিন্তু কে কবে কোথায় আল্লাহর কালাম বাতিল করল কেন ও কোন্ অধিকারে করল তার দলিল পাওয়া যায়নি।

এবারে কোরাণ থেকে শেষ প্রমাণ। সুরা আন-নূর, আয়াত ২৬ ও ৩ ঃ "দুশ্চরিত্রা নারীরা দুশ্চরিত্র পুরুষদের জন্য ও দুশ্চরিত্র পুরুষরা দুশ্চরিত্রা নারীদের জন্য ... ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারিণী নারী বা মুশরিকা নারীকেই বিবাহ করে এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী বা মুশরিক পুরুষই বিবাহ করে।"

অর্থাৎ ব্যভিচারী পুরুষ-নারীকে মৃত্যুদণ্ড দিলে তাদের লাশের সাথে লাশের বিয়ে দিতে হয়। সেটা সম্ভব নয়। কোরাণ একেবারে নীরব হলেও নাহয় কথা ছিল, যে কোন আইন বানাবার সুযোগ ছিল। কিন্তু কোরাণে তো ব্যভিচারীদের বিয়ের কথা বলা আছে। আরও একটা অকাট্য প্রমাণ দেখুন। সারা জীবন এত কষ্ট করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার পর মুসলমানের প্রতি স্বয়ং নবীজীর সর্বশেষ নির্দেশ কত গুরুত্বপূর্ণ ! সেই বিদায় হজ্ব-এর ভাষণে তিনি বলেছেন, "স্ত্রী অশ্লীল কর্মে অর্থাৎ জ্বেনায় লিপ্ত হইলেই কেবল তাহাকে হালকা মারধর করা যাইবে, মারাত্মকভাবে নয়" – বিধিবদ্ধ ইসলামি আইনের ৩য় খণ্ড ৮৫২ পৃষ্ঠা।

না, ব্যভিচারিণীর মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেননি আল্লার রসুল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর নির্দেশ উপেক্ষা করে, কোরাণের নির্দেশ উপেক্ষা করে শারিয়ায় অনেক আইনের মত এ আইনও ঢোকানো হয়েছে।

পরকীয়া একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কিন্তু শারিয়া আইনে যে মৃত্যুদণ্ড আছে তা কোরাণের খেলাফ ॥

শারিয়ায় নারী সাক্ষী

সাক্ষ্য কি ? সাক্ষ্য হল, কোন লোক কোন অপরাধ ঘটতে দেখল এবং আদালতে বিচারকের সামনে সেটা বয়ান করল । বাঘা অপরাধীও ওটাকেই সবচেয়ে বেশি ভয় পায় । কেন জানেন ? কারণ হল – অপরাধীর বিরুদ্ধে চাক্ষুষ সাক্ষী সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র । সেজন্যই অপরাধীরা সাক্ষীকে খুন পর্যন্ত করে ফেলে । শুধুমাত্র সাক্ষীর জোরেই অপরাধীর শাস্তি হয়, সাক্ষীর অভাবে সত্যিকারের অপরাধীও ছাড়া পেয়ে যায় । এ-ছাড়াও আছে বিশ্বাসের সাক্ষ্য – "লা ইলাহা ইল্লালাহু মুহম্মদুর রসুলুল্লাহ – আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ একমাত্র মাবুদ আর মুহম্মদ তাঁর রসুল ।" এ-সাক্ষ্য ছাড়া মুসলমানই হওয়া যায় না । বিদায় হজ্বে তাঁর শেষ ভাষণে নবীজীও সবার কাছ থেকে সাক্ষ্য নিয়েছিলেন – "আমি কি আল্লার বাণী তোমাদের কাছে পৌঁছাতে পেরেছি ?" লক্ষ লক্ষ হাত আকাশে উঠে ঘোষণা করেছিল – "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, ইয়া রসুলুল্লাহ ।" নবীজী বলেছিলেন – "সাক্ষী থাক, আমিও সাক্ষী থাকলাম ।" সে-জন্যই খোদ কোরাণও বলেছে সাক্ষ্য গোপন না করতে – বাকারা ২৮৩, মায়েদা ১০৬, ইমরান ১৬১, ইত্যাদি ।

এই হলো ইসলামে সাক্ষ্যের মর্যাদা, এই হলো আদালতে সাক্ষ্যের উপকারিতা । এতে নারী-পুরুষ কোনই ভেদ নেই । একটা প্লেটে যদি কোন মানুষের চোখ রাখা হয় তবে কেউ বলতে পারবে না ওটা পুরুষের চোখ না নারীর । গাছের আম পুকুরের মাছ আকাশের তারা পুরুষ যেমন দেখে নারীও হুবহু ঠিক তেমনি দেখে । ডাকাতি বা খুন চোখের সামনে হলে পুরুষ যা দেখে নারীও তাই দেখে । তাই সাক্ষ্যের ব্যাপারে নারী-পুরুষের কোনই ভেদাভেদ থাকার কথা নয় । এবারে চলুন দেখি শারিয়া-আইন পুরুষ ও নারীর সাক্ষ্যের মধ্যে কোনো তফাৎ করে কি না ।

হুদুদ মামলায় নারী-সাক্ষ্য চলবে না চারজন মুসলমান পুরুষ সাক্ষীর প্রয়োজন এ-আইন আছে হানাফি আইন ১৭৬ ও ৩৫৩ পৃঃ, শাফি'ই আইন পৃঃ ৬৩৮, Law #o.24.9, মওলানা মুহিউদ্দিনের বাংলা কোরাণ পৃঃ ২৩৯ ও ৯২৮, ক্রিমিনাল ল' ইন ইসলাম অ্যাণ্ড দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড পৃঃ ২৫১, পেনাল ল' অফ ইসলাম পৃঃ ৪৪, ৪৫ ইত্যাদিতে । কারণ হিসেবে বলা আছে, "বোধশক্তির দুর্বলতা, স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা ও পরিস্থিতিকে আয়ত্তে রাখিবার ক্ষমতার অভাবের জন্যই নারীদের সাক্ষ্য প্রথম হইতেই গ্রহণযোগ্য নহে" (দ্য পেনাল ল' অব্ ইসলাম ৪৪ ও ৪৫ পৃষ্ঠা) । কিন্তু ওগুলো বাহানা ছাড়া আর কিছুই নয় । দেশে দেশে এমন কোন কাজ নেই যা নারীরা পুরুষের মতোই করছেন না, বরং অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা পুরুষের চেয়ে ভাল করছেন । এর সাথে এ-আইনও আছে – "হুদুদ মামলায় নারী বিচারক হতে পারবে না" (বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন ২য় খণ্ড পৃঃ ২১৭, ধারা ৫৫৪) । এ-জন্যই ইরাণে সব নারী-বিচারককে কোর্টের কেরানি বানানো হয়েছে । যিনি জাতির গর্ব হতে পারতেন নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত সেই নারী-বিচারক শিরিণ এবাদী তাঁদের একজন, তিনি পদত্যাগ করেছেন ।

মনে করুন কোন মা-বোনের চোখের সামনে খুন বা ডাকাতি হল, সেখানে আর কেউ নেই । শারিয়া-আদালতে মামলা গেল, মা-বোন সাক্ষী দিতে গেলেন । কিন্তু শারিয়ায় তাঁদের চাক্ষুষ সাক্ষ্য নেয়া হবে না । কারণ আইনটা হল – "খুনীর অপরাধ প্রমাণের জন্য কমপক্ষে দুইজন পুরুষ সাক্ষীর প্রয়োজন হইবে" (ধারা ৫৯৩, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৮৬ বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ) । এ-আইনকে সমর্থন করার জন্য সুরা বাকারা ২৮২ আর সুরা ত্বালাক আয়াত ২-এর কথা বলা হয়েছে । কিন্তু কোরাণ খুলে দেখুন ওখানে খুনের কোন কথাই নেই । বাকারা বলছে ধার-দেনার দলিলে আর ত্বালাকে আছে বৌ-তালাকে দু'জন পুরুষ সাক্ষী রাখতে । শারিয়ায় এক হাদিসের সূত্রে এ-ও বলা আছে, দু'জন পুরুষের চাক্ষুষ সাক্ষ্য না থাকলে "বিচারক খুনীকে কায়েদমুক্ত করিয়া দিবেন" (ঐ পৃষ্ঠা ২৮৭) । অথবা, চাক্ষুষ সাক্ষ্য না থাকলে শুধু আলামতের ভিত্তিতে খুনী-ডাকাতের শাস্তি হবে না ("ঐ" ধারা ৬০০-এর বিশ্লেষণ, ২য় খণ্ড পৃঃ ২৯২) । অথচ খুনের চাক্ষুষ সাক্ষী পাওয়া কঠিন, পারিপার্শ্বিক আলামতের ভিত্তিতে বহু খুনীর শাস্তি হয় । তাই আমরা বারবার বলছি এই আইনগুলো বদলানো দরকার । আশ্চর্য এই যে, শারিয়া বইতেও বলা হয়েছে আইনগুলো বদলানোর সুযোগ আছে ("ঐ" পৃঃ ২৬৭, ধারা ৫৭৬) কিন্তু বদলানো তো হয়ই নি বরং না বদলিয়েই এই আইন তাঁরা দেশে চালাতে চান । এটা শারিয়াপন্থীদের ১৪০০ বছরের পুরনো কৌশল । মুখে বলা হবে "পরিবর্তনের সুযোগ আছে" কিন্তু সে পরিবর্তন কোনদিনই করা হবে না ।

এ-আইন ইসলাম-বিরোধী এটা শারিয়াবিদরাও বোঝেন । তাই আইনটাকে একটু মেরামত করার চেষ্টা হয়েছে যেমন, যেনা প্রমাণের ক্ষেত্রে চারজন ন্যায়পরায়ণ মুসলমান পুরুষ সাক্ষী লাগবে, অথবা প্রতিজন পুরুষের পরিবর্তে দু'জন মুসলিম ন্যায়পরায়ণ মহিলা হলেও চলবে ("ঐ" ৩য় খণ্ডের ৮৮৮ পৃষ্ঠা) । অর্থাৎ রোকেয়া হলে বা শামসুন্নাহার হলে সাতজন মেয়েদের সামনে যদি জ্বেনা হয় তবে অপরাধীরা সবার সামনে অট্টহাসি হাসতে হাসতে পগার পার হয়ে যাবে । আর "ন্যায়পরায়ণ মহিলা" কে, তা নিয়ে উকিলের তর্কবিতর্কের শেষ হবে না ।

আমি ইসলামের কথা বলছি । আমি ন্যায়ের ও মানবতার কথা বলছি ।

শারিয়ার একটা মারাত্মক আইন হল ধর্ষণের সাক্ষী । এ-আইনে অবৈধ সম্পর্ক এবং ধর্ষণ এ-দু'টোকেই প্রমাণ করতে লাগবে অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি অথবা চারজন বয়স্ক পুরুষ মুসলিমের চাক্ষুষ সাক্ষ্য (পাকিস্তানে শারিয়া আইনের ১৯৭৯-এর অর্ডিন্যান্স নম্বর

৭, ১৯৮০ সালের এর অর্ডিন্যান্স নম্বর ২০ দ্বারা সংশোধিত)। এই আইন নিয়ে বহু সেমিনার, কন্‌ফারেন্স, বহু নিবন্ধ হয়েছে, এর পাল্লায় পড়ে পাকিস্তানে হাজারো মা-বোন বহু বছর ধরে জেলখানায় বন্দি আছেন কারণ তাঁরা ধর্ষণের চারজন চাক্ষুষ সাক্ষী আদালতে হাজির করাতে পারেননি। মাত্র ২০০৬ সালের জুলাই মাসে প্রেসিডেন্ট মুশাররফ এক হাজার নারীকে মুক্তি দিয়েছেন ('ভোরের কাগজ' ৯ জুলাই ২০০৬)। এত বছরের জেলের ফলে এই হতভাগিনীদের জীবন ধ্বংস হল, এর জন্য দায়ী এই শারিয়া আইন। আরো দেখুন দৈনিক স্টার, ৭ই জুলাই ২০০৩ - কল্যাণপুরে মা'কে বেঁধে কিশোরী মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়েছে। ধর্ষণের একমাত্র সাক্ষী হল মেয়ের মা, ধর্ষক হল স্থানীয় তিন লোক। এখন এই মামলা যদি শারিয়া কোর্টে ওঠে তবে শারিয়ার আইন অনুযায়ী এক নারীর সাক্ষ্যে ধর্ষকদের শাস্তি দেয়া সম্ভব নয়। গ্রামের নির্জন ধানক্ষেতে ধর্ষিতা অভাগিনীদের একলা সাক্ষ্যেও সম্ভব নয়। এ-ধরনের আরো বহু ঘটনা আমাদের দলিলে আছে। কোনো কোনো দেশে এ-আইন বদলানো হয়েছে, পাকিস্তানে এখনো হয়নি।

এবারে আসা যাক কোরাণ-হাদিসে। নিসা-র **১৫** নম্বর আয়াত ঃ – "ব্যাভিচারিণী নারীদের বিরুদ্ধে চারজন পুরুষকে সাক্ষী হিসাবে তলব কর।" কারণ হল – "এ শর্ত আরোপের কারণ, যাতে স্ত্রীর স্বামী, তার জননী অন্য স্ত্রী অথবা ভাই-বোন ব্যক্তিগত জীঘাংসার বশবর্তী হয়ে অহেতুক অপবাদ আরোপ করার সুযোগ না পায় অথবা অন্য অমঙ্গলকারী লোকেরা শত্রুতা-বশত অপবাদ আরোপ করতে সাহসী না হয়" (মওলানার মুহিউদ্দিনের বাংলা কোরাণের তফসির পৃঃ ২৩৯)।

পরের প্রমাণ আরও অকাট্য। দেখুন সুরা নূর আয়াত **১১** থেকে ২০ পর্যন্ত। পঞ্চম হিজরিতে এক যুদ্ধ শেষে নবীজীর কাফেলা ফিরতি-পথে মদিনার কাছেই রাত্রি যাপনের জন্য থেমেছিল। তারপরে রওনা হবার সময় বিবি আয়েশা প্রাকৃতিক কারণে দূরে গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে এসে দেখেন তাঁর গলার হারটি নেই। তিনি সেটা খুঁজতে যাবার পর লোকেরা পালকির ভেতরে তিনি আছেন মনে করে পালকিটা উটের পিঠে চড়িয়ে রওনা হয়ে যায়। এ-দিকে তিনি হারটি পেয়ে ফিরে এসে কাফেলা না দেখে সেখানে অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েন এবং সারারাত ঘুমিয়ে থাকেন। সেকালে প্রতিটি কাফেলার কিছুটা পিছনে একজন লোক হেঁটে আসার রেওয়াজ ছিল, যাতে কিছু খোয়া গেলে তা পাওয়া যায়। এ-ক্ষেত্রে ছিলেন সাফওয়ান। তিনি পৌঁছলে বিবি আয়েশা সাফওয়ানের উটে চড়ে কাফেলার কাছে পৌঁছান। লম্বা সময় সাফওয়ানের সাথে একা ছিলেন বলে তখন সমাজে বিবি আয়েশার চরিত্র নিয়ে কানাঘুষা ও অপবাদ শুরু হয়। বিবি আয়েশা রাগে-দুঃখে বাপের বাড়ি চলে যান। মাসখানেক পর নবীজী তাঁর বাসায় এলে বিবি আয়েশা এবং তাঁর বাবা-মা এই তিনজনের সামনে সুরা নূরের **১১** থেকে ২০ পর্যন্ত দশটা আয়াত নাজিল হয়। বিবি আয়েশা বলছেন ঃ – "আল্লাহ আমার নির্দোষিতা প্রমাণের জন্যই কোরাণের ওই আয়াতগুলি নাজিল করিয়াছেন" (সহি বোখারি ৫ম খণ্ড পৃঃ ৩১৯ থেকে ৩২৯, হাদিস নম্বর ৪৬২, মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসিন খানের বোখারির অনুবাদ)।

তাহলে আমরা দেখলাম আয়াতগুলো এসেছিল নারীদেরকে পুরুষের হিংস্র ছোবল থেকে বাঁচানোর রক্ষাকবচ হিসেবে। বউগুলোকে চরিত্রহীনতার মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আগে বেশ ঝেড়ে ফেলে পার পাওয়া যেত, এখন আনতে হবে চার-চারজন পুরুষ সাক্ষী। না হলে শাস্তি। অথচ নারী-রক্ষার সেই আয়াতের নামে নারী-বিরোধী আইন বানিয়ে চিরকালের জন্য মা-বোনের চাক্ষুষ সাক্ষ্যকে নির্লজ্জভাবে কি করে অস্বীকার করব আমরা ?

এ-জন্যই বুঝি ডঃ ত্বাহা আল্‌ আলওয়ানী উদ্বিগ্ন হয়ে বলেছেন ঃ "সামর্থ্য, ভুলিয়া যাইবার সম্ভাবনা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, সত্যভাষণ বা মিথ্যা বলার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের কোনই ভেদাভেদ নাই। কোরাণে এমন কিছুই নাই যা দিয়া ওইরকম ধরা যাইতে পারে। সুতরাং, নরনারীর সাম্য ছাড়া অন্য কিছু বলিবার কোন যুক্তিই নাই" http://www.crescentlife.com/thisthat/feminist%20muslims/testimony_of_women_islamic_law.htm

কে এই ডঃ ত্বাহা আল্‌ আলওয়ানী ? রাস্তার লোক ? মোটেই নয়। শখের ইসলামি পড়ুয়া ? মোটেই নয়। স্বঘোষিত ইসলামি বিশেষজ্ঞ ? মোটেই নয়। তিনি পৃথিবীর সর্বোচ্চ মুসলিম-সংস্থা ও-আই-সি (দি অর্গানাইজেশন অব্‌ দি ইসলামিক কনফারেন্স)-এর ফিকাহ্‌ অ্যাকাডেমীর সদস্য, আমেরিকা-ক্যানাডা ফিকাহ্‌ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, এবং হেনডন ভার্জিনিয়ার স্কুল অব্‌ ইসলামিক অ্যাণ্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস্‌-এর প্রেসিডেন্ট।

এ-জন্যই বুঝি নবীজী উদ্বিগ্ন হয়ে বলেছেন – "আমার অনুসারীদের জন্য আমার সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তা পথভ্রষ্টকারী ইমামগণ নিয়ে" – সহি ইবনে মাজাহ ৫ম খণ্ড হাদিস ৩৯৫২।

অতঃপর, একজন বিবেকবান মুসলমান হিসেবে আর কোন্‌ কোন্‌ প্রমাণ তুমি অস্বীকার করিবে ?

ইসলামে সঙ্গীত

আমাদের মতো গান-পাগল জাত, নাচে-গানে ভরপুর, 'বারো মাসে তেরো পার্বণ' দুনিয়ায় বোধহয় আর নেই। হাজার বছর ধরে গ্রামের রাস্তায় একতারা বাজিয়ে নেচে নেচে গভীর দার্শনিক গান গায়নি আর কোনো জাতির ছিন্নবস্ত্র উদাস বাউল। আমাদের চাষি-জেলে-তাঁতি-মাঝি-কামার-কুমোর, এমনকি সাপ-ধরা বেদে ও ছাদ-পেটানো পর্যন্ত প্রতিটি পেশা তার নিজস্ব মৌলিক গানে সমৃদ্ধ। দেবর-ভাবির পরিহাসের গান, নানা-নাতির গম্ভীরা বা কবিয়ালের তাৎক্ষণিক গান-যুদ্ধ তো বাংলার আশ্চর্য সম্পদ – দুনিয়ার কোনো জাতিরই নেই। তাই গান নেই তো বাংলাও নেই, বাঙালিও নেই।

আর, একাত্তরে ? একাত্তরে গান আমাদের 'দৃপ্ত স্লোগান, ক্ষিপ্ত তীর-ধনুক।'

তারপরেও অনেকেই মনে মনে অপরাধবোধে ভোগেন – কি জানি, গান গেয়ে গান শুনে গুনাহ্ করছি নাতো ! সেজন্যই নিরপেক্ষভাবে সবদিকের ইসলামি দলিল দেখিয়ে এ নিবন্ধ লেখা যাতে সবাই দলিলগুলো জেনে নিজের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এটা আরও দরকার এজন্য যে আমরাই একমাত্র জাতি যার সঙ্গীতকে উচ্ছেদ করার জন্য বোমা মেরে মানুষ খুন করার লোক আছে। তাই বুকের রক্ত ঢেলে আমাদের সঙ্গীতকে রক্ষা করতে হয়। পৃথিবীর অন্য কোনো জাতির এ অদ্ভুত ও ভয়ানক সমস্যাটা নেই।

বহু আগে কেউ মধ্যপ্রাচ্য থেকে এসে বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলেছিল – 'গান হারাম'! সেই ফিসফিস হয়েছে কানাকানি, কানাকানি হয়েছে আলোচনা, আলোচনা হয়ে উঠেছে দাবি, কোথাও কোথাও দাবি হয়ে উঠেছে হুঙ্কার। 'গান হারাম' নাকি তাঁদের নিজস্ব মতামত নয়, এ নাকি একেবারে আল্লা-রসুলের নির্দেশ। উদ্ধৃতি ঃ "সঙ্গীত, নৃত্য ও চিত্রশিল্পকলা হইল অশ্লীল শিল্প ও কঠিনভাবে ইসলাম বিরোধী" – মওলানা মওদুদি 'এ শর্ট হিস্ট্রি অব্ দ্য রিভাইভালিস্ট মুভমেন্ট ইন্ ইসলাম' পৃঃ ৩০।

তাই ? 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' হারাম ? 'আমি বাংলার গান গাই' কঠিনভাবে ইসলাম-বিরোধী ? 'বাড়ির পাশে আরশিনগর', 'কান্দে হাছন রাজার মন ময়না' অশ্লীল শিল্প ? 'মোর প্রিয়া হবে এসো রাণী', 'লাইলি তোমার এসেছে ফিরিয়া' এবং বাংলার মায়েদের মধুকণ্ঠে 'আয় আয় চাঁদমামা টিপ দিয়ে যা, চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা' সবই হারাম ? কেন ? ভারতবর্ষের রাগৈশ্বর্য পরিপূর্ণ হয়ে নেই মিয়া তানসেন. আমির খসরু, ওস্তাদ আলাউদ্দিন, বড়ে গোলাম আলী, ছোটে গোলাম আলী, করিম খান, বিসমিল্লা খান, বেলায়েৎ হুসেন, কেরামত আলী, আলী আকবর, জাকির হুসেন, আল্লারাখা, আমজাদ আলী, রইস খান, নাজাকাত-সালামত, আমানত-ফতে আলী, আর আমাদের নিলুফার ইয়াসমিন, আখতার সাদমানী, মোবারক হোসেন খান ও ওস্তাদ মুন্সী রইস উদ্দীনের অজস্র উপহারে ? হার্মোনিয়াম-তবলা-পাখোয়াজের সাথে গান হয় না আমাদের ইসলাম প্রচারকদের দরগাতেও ? (এর নাম 'সামা')। বিদেশেও এক জামাতি কনফারেন্সে শুনেছি সাউণ্ড ভিশন সঙ্গীত-কোম্পানীর অ্যাডাম্স্-ওয়ার্ল্ড সিরিজের ইসলামি গান, বাদ্যযন্ত্রের কানফাটানো হুঙ্কারে গায়কের "আ-ল্-লা-হু আ-ক-বা-র" ছাড়া আর কিছুই বোঝা গেল না। টরন্টোর ইসলামি-কনফারেন্সে দেখেছি গায়ক হালাল, গায়িকা হারাম, এবং বাদ্যযন্ত্র মাকরুহ। বছর দশেক আগে বাংলাদেশ জামাতিদের **১৬ই ডিসেম্বরের** উৎসবও ছিল তাই।

গানকে হারাম, অপমানিত ও নিষিদ্ধ করেছে শারিয়াপন্থীদের (সবাই নন) কেতাব, সংগঠন, শারিয়া আইন এবং কোথাও কোথাও সরকারি আইনও। গানের কুৎসিৎ কথা, কুৎসিৎ অঙ্গভঙ্গি বা গানের অতিরিক্ত নেশায় জীবনের ক্ষতি ইত্যাদির সীমা টানেননি তাঁরা, পুরো সঙ্গীতকেই বাতিল করেছেন ঢালাওভাবে। উদাহরণ দিচ্ছি ঃ

১। শারিয়া কোর্টে গায়িকার সাক্ষ্য নিষিদ্ধ – হানাফি আইন হেদায়া পৃষ্ঠা ৩৬১, শাফি' আইন নং ও-২৪-৩-৩।

২। স্ত্রীকে কোনো বাদ্যযন্ত্র দেয়া যাইবে না – টি পি হিউগ্স্ – ডিকশনারী অব্ ইসলাম, পৃষ্ঠা ৬৭৫, শিকাগো।

৩। চুরির মাল কতটা 'সম্মানিত' তার উপরেও চোরের হাত কাটা নির্ভর করে। যেমন, বাদ্যযন্ত্র চুরি করা বৈধ – মেমরি, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০৪। অর্থাৎ বাদ্যযন্ত্র এতই নিকৃষ্ট যে ওটা চুরি করা যেতে পারে।

৪। ২০০৪ সালের জানুয়ারীতে আফগান সরকার সংসদে এসেই সর্বপ্রথম যে অপকর্মটি করেছে তা হলো রেডিও-টিভি-বিচিত্রানুষ্ঠানে নারীর গান ও খবর পড়া নিষিদ্ধ, এ-আইন পাশ করা ও প্রয়োগ করা।

৫। পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে শারিয়াপন্থীরা ভোটে জিতে ক্ষমতায় এসে প্রথমেই ওই একই অপকর্ম করেছে। ওদের জন্য এটা হলো বেহেশতের সিঁড়ি। তাই বাংলাদেশেও ওরা সরকারি বা সামাজিকভাবে শক্তিশালী হওয়া মাত্রই ঐ অপকর্ম করবে তা নিশ্চিত নিশ্চিত।

কোরাণে হালাল-হারামের স্পষ্ট তালিকা আছে। গান হারাম হলে সে-তালিকায় গানের কথা অবশ্যই থাকত কারণ আল্লাহ কোনকিছু ভুলে যান না। তবু গানকে হারাম করতে কোরাণের বাহানা করা হয় প্রধানত দু'টো সুরা দিয়ে ঃ (১) সুরা লোকমান ৬ – "একশ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহ'র পথ হইতে গোমরাহ করার উদ্দেশ্যে অবান্তর কথাবার্তা সংগ্রহ করে অন্ধভাবে এবং উহা লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে", এবং (২) বনি ইসরাইল আয়াত ৬৪ (আল্লাহ শয়তানকে বলছেন) –"তুই তাদের মধ্য থেকে যাকে পারিস স্বীয় আওয়াজ দ্বারা, অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে সত্যচ্যুত করে তাদেরকে আক্রমণ করো।"

তাঁরা বলেন সঙ্গীত হারাম কারণ সুরা লোকমান ৬-এর 'অবান্তর কথাবার্তা'-ই নাকি সঙ্গীত (মওলানা মুহিউদ্দিনের কোরাণের অনুবাদ, পৃঃ ৭৮৩ ও ১০৫৩-৫৪)। খবরটা তাঁদের কে দিল তার কোনো উল্লেখ নেই কিন্তু কথাটা মতলবি ও উদ্ভট তা বাচ্চাও বোঝে। অবান্তর কথাবার্তা অবান্তর কথাবার্তাই, অন্যকিছু নয়। একই খেলা করা হয়েছে বনি ইসরাইল ৬৪ নিয়েও। আজিজুল হক সাহেব তাঁর সহি বোখারী ৪র্থ খণ্ড ১৮ পৃষ্ঠায় এর অনুবাদ করেছেন (আল্লাহ শয়তানকে বলছেন) ঃ "তুই তোর চেলাবেলা, লোক-লস্কর দ্বারা ও রাগ-রাগিনী গান-বাজনা ও বাদ্যবাজনা দ্বারা মানুষকে বিপথগামী করার চেষ্টা চালিয়ে যা।" অর্থাৎ রাগ-রাগিনী, গান-বাজনা ও বাদ্যবাজনা হলো শয়তানের অস্ত্র, তাই সেটা হারাম। অনুবাদটা ডাঁহা মিথ্যা। সঙ্গীতের আরবি শব্দ "মুসিকি"। আয়াতটায় মুসিকি নেই, আছে 'সাওত' অর্থাৎ 'আওয়াজ'।

বিভিন্ন বিষয়ে এক রসুলের দুই বিপরীত সুন্নত দিয়ে ইসলামি কেতাবগুলো ভর্তি। গানেরও পক্ষে-বিপক্ষে কিছু হাদিস আছে। প্রথমে বিপক্ষের তিনটি দেখাচ্ছি ঃ

- রসুল নিষিদ্ধ করিয়াছেন মদ্যপান, জুয়া ও সারিন্দা-জাতীয় বাদ্যযন্ত্র – আবু দাউদ।
- রসুল বলিয়াছেন – আমার পরোয়ারদিগার আমাকে আদেশ করিয়াছেন সকল বাদ্যযন্ত্র ও বাঁশি উচ্ছেদ করিতে – মিশকাত ৩১৮।
- রসুল বলিয়াছেন কেয়ামতের ইঙ্গিত হিসেবে গায়িকা ও বিভিন্নরকমের বাদ্যযন্ত্রের আবির্ভাব হইবে – মিশকাত ৪৭০।

আমরা সটান বলতে পারি এগুলো মিথ্যা হাদিস কিন্তু গান-হারামকারীদের কাছে আমাদের কথার গুরুত্ব কিই বা। তাই চলুন যাঁদের কথার গুরুত্ব আছে সেই শারিয়া-নেতাদের উদ্ধৃতি থেকেই প্রমাণ করি গান হারাম তো নয়ই বরং গান হারাম বলাই হারাম। তাঁরা সহি হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন কিন্তু হাদিসের নম্বরগুলো দেননি। নম্বরগুলো দিচ্ছি যাতে আপনারা মিলিয়ে নিতে পারেন ঃ বুখারী ৩৯৩১, ২য় খণ্ড ৭০, ৪র্থ খণ্ড ১৫৫, ৫ম খণ্ড ৩৩৬ ; মুসলিম ৯৮২, ও মিশকাত ৬ষ্ঠ খণ্ড।

১। "রসুল (সাঃ) বিবাহ-অনুষ্ঠানে গানের শুধু অনুমতিই দেন নাই বরং বালিকাদের গান শুনিয়াছেন।এমনি এক অনুষ্ঠানে যখন তাহারা গাহিতেছিল – 'আমাদের মধ্যে এক রসুল আছেন যিনি জানেন আগামীকাল কি ঘটিবে' – তখন তিনি তাহাদিগকে থামাইয়া বলিয়াছেন 'এই বাক্যটি বাদ দাও এবং গাহিতে থাক।' ইহাকে শুধু বিবাহ-অনুষ্ঠানের অনুমতি মনে করিবার কোনই কারণ নাই।" (অর্থাৎ বিয়ের অনুষ্ঠান ছাড়াও গানকে নবীজী অনুমতি দিয়েছেন)। ক্যানাডার সুবিখ্যাত ইমাম শেখ আহমেদ কুট্টি ঃ http://www.al-islamforall.org/Misc/islamonm.htm

২। "হজরত ওসর (রঃ)-এর আবাদকৃত শহরের মধ্যে দ্বিতীয় হইল বসরা। আরবি ব্যাকরণ, আরূয শাস্ত্র এবং সঙ্গীতশাস্ত্র এই শহরেরই অবদান" – বিখ্যাত কেতাব 'আশারা মোবাশ্শারা', মওলানা গরিবুল্লাহ ইসলামাবাদী ফাজেল-এ দেওবন্দ, পৃষ্ঠা ১০৬।

৩। "ডেভিডকে আমরা দাউদ (আঃ) বলে জানি। তিনি মূলত ধর্মোপদেশকে, ও যোদ্ধা, জ্ঞানী ব্যক্তি সর্বোপরি একজন নবী ছিলেন। ইতিহাসের পাতায় তাঁকে আমরা দেখতে পাই একজন কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবেও" – সেনানায়ক মহানবী (সঃ) – যুদ্ধ ও শান্তি – ব্যারিস্টার তমিজুল হক, পৃষ্ঠা ১৭।

৪। ব্যারিস্টারের লেখা ইসলামি কেতাবে যদি কারো মন না ওঠে তবে তাঁর জন্য আছেন অখণ্ড ভারতের সর্বোচ্চ ইসলামি নেতাদের অন্যতম, ভারতীয় কংগ্রেসের দু'দু'বার সভাপতি কোলকাতার ঈদের নামাজ পড়ানোর পেশ ইমাম মওলানা আবুল কালাম আজাদ। তিনি বলেছেন ঃ "পয়গম্বর দাউদ (আঃ)-এর কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মিষ্টি ছিল। তিনি সর্বপ্রথম হিব্রু সঙ্গীতের সঙ্কলন করেন ও মিশরের ও ব্যাবিলনের গাছ হইতে উচ্চমানের বাদ্যযন্ত্র উদ্ভাবনা করেন" – তাঁর তর্জুমান আল্ কুরাণ, ২য় খণ্ড পৃঃ ৪৮০ (http://www.renaissance.com.pk/Marrefl2Y5.htm#_ftn4#_ftn4)।

৫। ব্যারিস্টারের লেখা ইসলামি কেতাব কারো অপছন্দ হলে তিনি এটাও দেখতে পারেন। এ নিয়ে যাঁরা বিস্তৃত গবেষণা করে মুস্তাফা কানাদি (www.shahbazcenter.org) কোরাণের ইউসুফ আলী'র ব্যাখ্যার (বিশ্বে সর্বাধিক প্রচলিত) উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন ঃ "আল্লাহ প্রজ্ঞা হইল যে, স্থান-কালের পরিপ্রেক্ষিতে নবীগণের আধ্যাত্মিক গুণাবলী বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হইল দাউদকে গান ও সঙ্গীত দেওয়া হইয়াছিল।"

৬। যাঁদের পড়ার ধৈর্য নেই কিন্তু নাটক-সিনেমার পোকা তাঁরা দেখুন পাকিস্তানি ছায়াছবি 'খুদা কে লিয়ে' – বোম্বের নাসিরুদ্দীন শাহ্ দরবেশ-এর দুর্ধর্ষ অভিনয় করেছেন। ওটাতেও সহি হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে দেখানো হয়েছে ইসলামে গান হারাম তো নয়ই, বরং শক্তভাবে হালাল।

৭। এতেও যদি কারো মন না ওঠে তবে সোজা চলে যান ইমাম গাজ্জালীর কাছে ঃ 'নবী করিম (সাঃ) হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) সম্পর্কে বলিয়াছেন – তাঁহাকে হযরত দাউদ (আঃ–-এর সঙ্গীদের অংশ প্রদান করা হইয়াছে" – মুরশিদে আমিন, পৃষ্ঠা ১৭০ – এমদাদিয়া লাইব্রেরী।

এর পরেও আমাদের শুনতে হয় গান হারাম, গানের উৎসব রক্তাক্ত হয়ে যায় ঘাতকের অস্ত্রে। আর জাতি ভোগে অন্তর্দ্বন্দ্বে, গান গেয়ে গান শুনে গুনাহ্ করছি না তো !!

না, করছেন না। ইসলাম তো স্বাভাবিক ধর্ম – সঙ্গীত কি অস্বাভাবিক হতে পারে ? পশু-পাখি-মাছেরা পশু-পাখি-মাছ হয়েই জন্মায় কিন্তু মানুষ হয়ে উঠতে মানুষের সুকুমার বৃত্তির দরকার হয়, সঙ্গীতই সেই সুকুমার বৃত্তি। সাহিত্য, কবিতা, চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও তা সত্য। হারাম তো শূকরের মাংস, গান কবে থেকে শূকরের মাংস হল ? আর, বাড়াবাড়ি করা ? 'গান হারাম' বলাই তো সেই বাড়াবাড়ি ! খোদ ইসলাম নিয়েই তো বাড়াবাড়ি নিষিদ্ধ (সুরা মায়েদা ৭৭, নিসা ১৭১ ও নবীজীর বিদায় হজ্বের ভাষণ)।

ইসলাম আপনার হৃদয়ে আছে, সেখানে প্রশ্ন করুন সৎভাবে। এবং তার জবাব নিয়ে শক্ত সোজা হয়ে দাঁড়ান। আপনার ইসলামের মালিকানা আর কারো হাতে ছেড়ে দেবেন না। মাথাটা নত করলেই ওরা আপনার পিঠে সুপারগ্লু লাগিয়ে ঠেসে বসবে। আপনি সোজা হয়ে দাঁড়ালে তা পারবে না। অন্যের মতামতের ফটোকপি হবার জন্য আমাদের মাথাটা দেয়া হয়নি। ঘাড়ের ওপর সারাজীবন বোঝার মতো বইতেও দেয়া হয়নি, কাজে লাগানোর জন্যই দেয়া হয়েছে।

সঙ্গীত হল আমাদের সসীম জীবনে এক টুকরো অসীমের ছোঁয়া। চারদিকের আকাশ-বাতাস সাগর-পর্বত গ্রহ-নক্ষত্র, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক বিপুল সুরস্রষ্টার মহাসঙ্গীত। তাই, গান শুনুন এবং বাচ্চাদের গান শোনান। গান করুন এবং বাচ্চাদের গান শেখান। গান যে ভালবাসে না সে মানুষ খুন করতে পারে। গানের মত বেহেশতি জিনিস যে অপদর্শনে শূকরের মাংস হয় সেটা আসলে ইসলামের ছদ্মবেশে অন্যকিছু, বিশ্ব-মুসলিমের মঙ্গলের জন্যই ওটাকে শক্তহাতে প্রতিহত করা প্রয়োজন।

শেষ করছি বর্তমান বিশ্বের অবিসম্বাদিত সর্বোচ্চ শারিয়া-নেতার উদ্ধৃতি দিয়ে।

"সঙ্গীত এমন বিনোদন যাহা প্রাণে আনন্দ দেয়, হৃদয় তৃপ্ত করে এবং শ্রবণকে আরাম দেয়...উত্তেজনাপূর্ণ না হইলে ইহার সহিত বাদ্যযন্ত্র থাকিলে ক্ষতি নাই...আয়েশা বলিয়াছেন যখন এক আনসারের সাথে এক মহিলার বিবাহ হইতেছিল তখন রসুল (সাঃ) বলিলেন, 'আয়েশা, তাহারা কি চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করিয়াছে ? আনসারেরা চিত্তবিনোদন ভালবাসে' (বুখারি)।" ইবনে আব্বাস বলিয়াছেন আয়েশা তাঁহার এক আত্মীয়াকে এক আনসারের সাথে বিবাহ দিলেন। রসুল (সাঃ) আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'তাহার সাথে কি কোন গায়িকা দিয়াছ ?' আয়েশা বলিলেন, 'না।' তখন রসুল (সাঃ) বলিলেন, 'আনসারেরা কবিতা ভালবাসে। এমন কাউকে পাঠানো তোমার উচিত ছিল যে গাহিবে – আমরা আসিলাম তোমাদের কাছে, আমাদের সম্ভাষণ করো, আমরাও তোমাদের সম্ভাষণ করি' (ইবনে মাজাহ)। আয়েশা বলিয়াছেন ঈদুল আজহা'র দিনে মিনা'তে তাঁহার সহিত দুইজন বালিকা ছিল যাহারা 'দফ' (অনেকটা আমাদের ঢোলকের মতো - *লেখক*) বাজাইয়া গান গাহিতেছিল। রসুল (সাঃ) মুখ চাদরে ঢাকিয়া তাহা শুনিতেছিলেন (হাদিসে আছে তিনি মুখ ঢেকে শুয়েছিলেন)। আবু বকর আসিয়া বালিকাদিগকে বকাবকি করিলেন। রসুল (সাঃ) মুখ বাহির করিয়া বলিলেন, 'উহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, আবু বকর। আজ ঈদের দিন' (বুখারী ও মুসলিম)। ইমাম গাজ্জালী তাঁহার

এহিয়ে উলুম আল্ দ্বীন কেতাবে ('গান শোনা' অধ্যায়ে 'অভ্যাস' পরিচ্ছেদে) গায়িকা-বালিকার উল্লেখ করিয়াছেন...'ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করে গান গাওয়া ও খেলাধুলা করা হারাম নহে...দলিলে আছে বহু সাহাবি ও পরের প্রজন্মের মুসলিম বিশেষজ্ঞরা গান শুনিতেন ও ইহাতে কোন দোষ দেখিতেন না। গবেষকদের মতে গান গাহিবার বিরুদ্ধে যেসব হাদিস আছে তাহা নির্ভরযোগ্য নহে।' আইনবিদ আবু বকর আল্ আরাবি বলেন, 'সঙ্গীত নিষিদ্ধের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য কোনই হাদিস নাই।' ইবনে হাজম (১১শ' শতাব্দীর স্পেন খেলাফতের বিখ্যাত শারিয়াবিদ – *লেখক*) বলিয়াছেন, 'এই বিষয়ে (সঙ্গীত নিষিদ্ধের বিষয়ে – *লেখক*) যাহা কিছুই লিখা আছে সকলই মিথ্যা ও ভেজাল।'

(সুরা লোকমান ৬-এর ব্যাপারে) ইবনে হাজম বলেন, 'এই আয়াতে আল্লাহ'র পথ নিয়া ঠাট্টা করার অভ্যাসকেই আল্লাহ নিন্দা করিয়াছেন, উহাকে নহে যেই অলস কথাবার্তা মানুষ করে মানসিক প্রশান্তির জন্যই, কাউকে আল্লাহ'র পথ হইতে পথভ্রষ্ট করার জন্য নহে।' সুরা ইউনুস আয়াত ৩২-এর ভিত্তিতে যাঁহারা বলেন সঙ্গীত যেহেতু 'সত্য' নহে তাই সঙ্গীত নিশ্চয়ই 'মিথ্যা', তাহাদের যুক্তিকেও ইবনে হাজম ভুল প্রমাণ করিয়াছেন...তাই যে ব্যক্তি আল্লাহ'র প্রতি দায়িত্ব পালন ও ভাল কাজের শক্তিলাভের জন্য চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে গান শোনে সে আল্লাহ'র অনুগত বান্দা এবং তাহার এই কর্ম সত্য। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি আল্লাহ'র প্রতি বাধ্য বা অবাধ্য হইবার চিন্তা না করিয়া গান শোনে, সে নিরপেক্ষ ও ক্ষতিকর নহে এমন কাজ করে যেমন পার্কে যাওয়া বা হাঁটিয়া বেড়ানো, কিংবা জানালায় দাঁড়াইয়া আকাশ দেখা, কিংবা নীল বা সবুজ কাপড় পরা, ইত্যাদি। যাহা হউক, সঙ্গীতের ব্যাপারে কিছু সীমাবদ্ধতা আছে, যেমন গানের কথায় যদি মদ্যপানের প্রশংসা থাকে ও লোককে মদ্যপানে উৎসাহিত করা হয়, তবে উহা গাওয়া বা শোনা হারাম। গানের পরিবেশনাও উহা হারাম করিতে পারে যেমন গানের সাথে শারীরিক উত্তেজক অঙ্গভঙ্গি।"

কার উদ্ধৃতি দিলাম ? তিনি পুরো শারিয়া-বিশ্বের সর্বোচ্চ নেতা ডঃ ইউসুফ কারজাভী, বিশ্বময় বহু শারিয়া-ব্যাঙ্ক, দেশি ও আন্তর্জাতিক বহু শারিয়া-সংগঠনের প্রেসিডেন্ট ও চেয়ারম্যান। উদ্ধৃতি দিলাম তাঁর বই "দ্য ল'ফুল অ্যাণ্ড প্রোহিবিটেড ইন্ ইসলাম" থেকে ঃ

http://witness-pioneer.org/vil/Books/Q_LP/ch4s3pre.htm#Singing%20and%20Music

এর পরেও যদি কেউ বলেন গান হারাম তবে তাঁর উচিত ডঃ ইউসুফ কারজাভী'র সাথে বিতর্ক করে তাঁকে পরাজিত করা।

মুসলমান হতে হলে মানবদরদী হতেই হবে এবং মানবদরদী হতে হলে কাব্যসঙ্গীতময় হৃদয় থাকতেই হবে। তাই ভালো মুসলমান আর হিংস্র মুসলমানের একটি পার্থক্য হল সাঙ্গীতিক মন থাকা ও না-থাকা ॥

ইসলামে স্ত্রী-প্রহার

(“ইসলামে কোনো স্ত্রী-প্রহার নেই, ওটা আয়াতের ভুল অনুবাদ ”– শারিয়া-তত্ত্বগুরু শাহ্ আব্দুল হান্নান – খবর আলোচনা ফোরাম – ২রা মে, ৩৮ মুক্তিসন (২০০৮) ।

২২শে সেপ্টেম্বর ২০০৪ সালের খবর, ইরাণের শারিয়া কোর্টে স্ত্রী মরিয়ম আবেদন করেছেন শারিয়া কোর্ট যেন তাঁর স্বামীকে আদেশ দেন মরিয়মকে প্রত্যেকদিন না মেরে সপ্তাহে একদিন মারে ।

আর কোনো ধর্মগ্রন্থের আর কোনো আয়াত নিয়ে এত দীর্ঘ সময় ধরে এত তর্ক-বিতর্ক হয়নি যা সুরা নিসা আয়াত ৩৪ নিয়ে হয়েছে, এবং হচ্ছে । আয়াতটার অনুবাদ এইভাবে করা হয়েছে – “পুরুষরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল (কাওয়াম) । কারণ আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং কারণ তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে । সেই মতে নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগতা, এবং আল্লাহ যা হেফাজতযোগ্য করে দিয়েছেন লোকচক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাজত করে । আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার (নাসুজ) আশঙ্কা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং প্রহার কর (‘ওয়াজ্রেবুহুন্না’ বা ‘ইদ্রুবুহুন্না’) । যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না ।” কোরাণের অনেক অনুবাদক ‘প্রহার কর’ এর পরে ব্র্যাকেটে (অল্প করিয়া) ঢুকিয়ে ব্যাপারটাকে হালকা করার চেষ্টা করেছেন । কিন্তু নিজের কথা কোরাণে না ঢুকিয়ে ব্যাখ্যায় দেয়া উচিত ।

যাহোক, বিধানটা সুস্পষ্ট । ওসব শর্তে তাই শারিয়া আইনে স্ত্রী-প্রহার বৈধ (শাফি’ই আইন m.10.12, o.17.4) । সমস্যাটি হলো, স্ত্রী অবাধ্য কি না তা ওই স্বামীই ঠিক করবে, এবং সে কখন কি-কারণে কিভাবে কতটা মারপিট করছে তা দেখার কেউ নেই । বেশির ভাগ মুসলিম স্ত্রী-প্রহার করেন না সত্যি, কিন্তু কথাটা আসলে নীতির, নারী-অধিকারের ও সম্মানের । মুসলিম-সমাজে এ-সব আইনের প্রভাব সুগভীর । বহু মুসলিম দেশের টেলিভিশনে মিষ্টি হাসির সাথে বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে স্ত্রী-প্রহারকে সমর্থন করা হয় । কিভাবে মারলে স্ত্রীর গায়ে দাগ পড়বে না সেই ‘বৈজ্ঞানিক’ পদ্ধতির ওপর নামকরা মওলানার লেখা কেতাবও আছে । ২০০৫ সালে বিবিসি’র খবরে দুনিয়া শিউরে উঠেছিল যখন ইরাণের কোর্টে স্ত্রী আবেদন করেছিল তার স্বামীকে আদেশ দিতে যাতে সে তাকে প্রতিদিন না মেরে সপ্তাহে একদিন মারে, স্বামী দাবি করেছিল এ তার ইসলামি অধিকার । ইসলামে বৌ-পেটানোর ওপরে কাজ করেছেন অনেক ইসলামি বিশেষজ্ঞ । এঁরা বলেন ঃ-

১ । যে-ধর্মে আল্লাহ-রসুলের প্রতি বাধ্যতায় জোর-জবরদস্তি নেই সে-ধর্মে স্বামীর বাধ্য হবার ব্যাপারে মারপিট হতে পারে না ।

২ । স্বামীও মানুষ, তারও ভুল হতে পারে । সে হতে পারে গাধার চেয়েও হাবা, সাপের চেয়েও বিষাক্ত, এবং নারী হতে পারেন মোমেনা ও বিশেষজ্ঞ ।

৩ । বিশ্ব-মুসলিমের আজ এই করুণ দশার জন্য দায়ীই হলো পুরুষ, নারী নয় । সেই পুরুষের হাতে স্ত্রী-প্রহারের অধিকার, তা সে যতোই শর্তসাপেক্ষে হোক না কেন, ইসলাম দিতে পারে না ।

৪ । বাচ্চাদের সামনে বাবা তাদের মা’কে ধরে পেটানোর দৃশ্য অত্যন্ত কুৎসিৎ এবং বাচ্চাদের মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর । এ হিংস্রতা ও নোংরামিকে ইসলাম বৈধ করতে পারে না ।

৫ । আয়াতে এ-কথা বলা হয়নি যে স্ত্রীর ওপর স্বামী কর্তৃত্বশীল । বলা হয়েছে রেজাল (পুরুষ জাতি) নিসা (নারীজাতি)-র ওপর কর্তৃত্বশীল । কাজেই আয়াতটা পারিবারিক নয়, সামাজিক ।

৬ । কাউয়াম অর্থাৎ উপার্জনকারী বা নিয়ন্ত্রক । তখন সাধারণভাবে পুরুষজাতি আয় করতো এবং নারীজাতি তা থেকে ব্যয় করতো । কোরাণ সেই সামাজিক চিত্রটা বর্ণনা করেছে মাত্র, চিরকালের জন্য বৈধ করেনি । বৈধ করলে কোরাণের সাথে বাস্তব মিলছে না কারণ বর্তমান বিশ্বে কোটি কোটি নারী কাউয়াম অর্থাৎ উপার্জনকারী এবং তার পরিবার তা থেকে খরচ করে । তারা কি স্বামী পেটাবে ? কেউ কেউ বলেন “কাউয়াম” শব্দের শেকড় থেকে আরেকটা শব্দ আসে, “কানাত মিনাল ক্বানেতীন” – এটা কোরাণ ব্যবহার করেছে হজরত ঈসা’র মা মেরীর ব্যাপারে অথচ তাঁর স্বামীই ছিল না । কাজেই “কাউয়াম” হলেই স্বামী বুঝতে হবে এটা মতলবি ব্যাখ্যা (সুরা আত্ তাহরীম, আয়াত ১২) ।

৭ । আয়াতে আছে – “নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগতা ।” কার অনুগতা ? শারিয়াপন্থীরা দাবি করেন এ-আনুগত্য স্বামীর প্রতি । প্রগতিশীল বিশেষজ্ঞরা বলেন এটা শুধুমাত্র আল্লাহ’র প্রতিই । কেননা ইসলামে শর্তহীন পূর্ণ আনুগত্য শুধু আল্লাহ ও নবী-রসুল ছাড়া আর কারো প্রতি হতে পারে না ।

৮ । দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রী দু’জনে দু’জনের কথা কাটাকাটি হবেই । কথা না শুনলেই যদি মারপিট হয় তবে ঘন ঘন হুলুস্থুল তাণ্ডবে পাড়ার কাক-চিল উড়ে পালাবে এবং সংসার শিকেয় উঠবে । ইসলামে তাই মারপিট বৈধ হতে পারে না ।

৯ । আয়াতে আছে – “আল্লাহ যা হেফাজতযোগ্য করে দিয়েছেন লোকচক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাজত করে ।” যেহেতু অবাধ্যতা লোকচক্ষুর অন্তরালে নাও হতে পারে তাই আয়াতটা নিশ্চয় অবাধ্যতার কথা বলেনি, বলেছে শ্লীলতার কথা, সতীত্বের কথা । ।

১০ ।ঠিক পরের আয়াতটা, নিসা আয়াত ৩৫-এ আছে ঃ পরিবার ভাঙ্গার অবস্থা হলে স্বামীর ও স্ত্রীর পক্ষ থেকে মুরুব্বীদের দিয়ে সালিশের চেষ্টা করতে হবে। গায়ে হাত তুলে মারপিটের পরে সালিশ করাটা তামাশা মাত্র, ও-সালিশে লাভ হয় না। তাই আয়াতটা নিশ্চয় মারপিটের কথা বলেনি।

১১ ।কোনো কারণেই কারো গায়ে হাত তোলার অধিকার সাধারণ মানুষকে দেয়া যায় না, দিলে তার অপব্যবহার হবেই। কথাটা অত্যন্ত সত্যি।

অর্থাৎ তাঁদের দাবি হলো আয়াতটার অনুবাদে স্ত্রী-প্রহার থাকতে পারে না। মূল শব্দগুলো হলো ঃ (১) রেজাল অর্থাৎ পুরুষ, (২) নিসা অর্থাৎ নারী, (৩) কাউয়াম অর্থাৎ উপার্জনকারী বা নিয়ন্ত্রক ইত্যাদি, (৪) নাসুজ অর্থাৎ প্রকাশ্য অশ্লীলতা, ও (৫) দারাবা – শব্দটার বিভিন্ন মানে আছে। বাংলায় যেমন ধৃ থেকে ধর্ম, অর্থাৎ ধারণ করা, ভৃ থেকে ভার্যা ও ভৃত্য যাকে ভরণপোষণ করতে হয়, তেমনি 'ইদ্রুবুহুন্না' শব্দের মূল হলো 'দারাবা'। ডঃ আব্দুল হামিদ আবু সুলায়মান মালয়েশিয়া'র আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেক্টর এবং আমেরিকার (ভার্জিনিয়া) ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব্ ইসলামিক থট-এর প্রেসিডেন্ট। কোরাণে 'দারাবা' থেকে উদ্ভূত শব্দাবলী নিয়ে তাঁর নিবন্ধ ২৪শে জানুয়ারি ২০০৮ (মুক্তিসন ৩৮) ইন্টারনেটে বাংলার নারী আলোচনা-ফোরামে দিয়েছিলেন শাহ্ আব্দুল হান্নান। বহু বছর আগে ডঃ এডিপ ইউকসেল এবং অন্যান্যরাও একই যুক্তি দিয়েছেন – সুরা ও আয়াত থেকে অত্যন্ত সংক্ষেপে দেখাচ্ছি ঃ

(ক) ভ্রমণ করা – ৪:১০১, ২:২৭৩
(খ) বাহির হইয়া যাওয়া – ৩:১৫৬, ৭৩:২০ ও অন্যান্য
(গ) প্রহার করা – ৮:৫০, ৪৭:২৭
(ঘ) আঘাত করা – ২:৬০ ও ৭৩, ৭:১৬০, ৮:১২, ২০:৭৭, ২৪:৩১, ২৬:৬৩, ৩৭:৯৩, ৪৭:৪
(ঙ) সংস্থাপন করা – ৪৩:৫৮, ৫৭:১৩
(চ) প্রদান করা – ১৪:২৪ ও ৪৫, ১৬:৭৫, ৭৬ ও ১১২, ১৮:৩২ ও ৪৫, ২৪:৩৫, ৩০:২৮ ও ৫৮, ৩৬:৭৮ ; ৩৯:২৭ ও ২৯, ৪৩:১৭, ৫৯:২১ ও অন্যান্য
(ছ) উপেক্ষা করা – ৪৩:৫
(জ) নিন্দা করা – ২:৬১
(ঝ) বন্ধ করা, উপর দিয়া নিয়া যাওয়া – ১৮:১১
(ঞ) ঢাকিয়া দেওয়া – ২৪:৩১
(ত) ব্যাখ্যা করা – ১৩:১৭
(থ) অত্যাচার বা অসদাচরণ করা –৪:১২৮

আরেকটা শক্তিশালী যুক্তি দেখান তাঁরা। পিকথল-এর অনুবাদের সুরা রা'দ আয়াত ১৭ হলো – "এভাবেই আল্লাহ সত্য অসত্যের দৃষ্টান্ত প্রদান করেন।" এখানে 'মারপিট' শব্দটা লাগালে এটা দাঁড়াবে ঃ 'এভাবেই আল্লাহ সত্য ও অসত্যের মারপিট করেন।' এটি উদ্ভট কথা, তাই 'ইদ্রুবুহুন্না'-র "দৃষ্টান্ত প্রদান" অর্থ ধরতে হবে।

বাংলায় 'খাওয়া' শব্দের ১৫৫টি ভিন্ন অর্থ দেখুন ঃ

১ । ভাত খাওয়া
২ । বিড়ি-সিগারেট খাওয়া
৩ । পানি খাওয়া
৪ । বিষম খাওয়া
৫ । নুন খাওয়া (কৃতজ্ঞতা)
৬ । মাথায় বাড়ি খাওয়া (আশ্চর্য হওয়া)
৭ । কামড় খাওয়া
৮ । ল্যাং খাওয়া
৯ । গোল খাওয়া
১০ । গোল্লা খাওয়া (বোকাটা অঙ্কে গোল্লা খেয়েছে)
১১ । লাল-হলুদ কার্ড খাওয়া (ফুটবল খেলায়)
১২ । ডিম খাওয়া (গায়কটা গতকাল শ্রোতাদের ডিম খেয়েছে)
১৩ । চিমটি খাওয়া
১৪ । গুঁতো খাওয়া
১৫ । কানমলা খাওয়া
১৬ । চড়-থাপ্পড় খাওয়া (খোলা হাত দিয়ে আঘাত)
১৭ । ঘুষি খাওয়া (মুষ্ঠিবদ্ধ হাত দিয়ে আঘাত)
১৮ । লাথি খাওয়া (পা দিয়ে আঘাত)
১৯ । রাম-ধোলাই খাওয়া
২০ । জুতা খাওয়া (জুতার প্রহার খাওয়া)
২১ । প্যাঁদানি খাওয়া
২২ । ঝাঁটা খাওয়া
২৩ । গণ-পিটুনি খাওয়া
২৪ । চাবুক খাওয়া
২৫ । লাঠির বা ডাণ্ডার বাড়ি খাওয়া
২৬ । ঢিল খাওয়া
২৭ । ঠোকর খাওয়া
২৮ । ধাক্কা খাওয়া
২৯ । বেত খাওয়া
৩০ । সুর খাওয়া (গান গাইবার সময় সুরে ভুল করা)
৩১ । গালি খাওয়া

৩২। ধমক খাওয়া
৩৩। বকুনি খাওয়া
৩৪। দাবড়ি খাওয়া
৩৫। আছাড় খাওয়া
৩৬। হোঁচট খাওয়া
৩৭। "উষ্টা" খাওয়া (হোঁচট-এর ভিন্ন প্রকাশ)
৩৮। হুমড়ি খাওয়া
৩৯। ঝাঁকি বা ঝাঁকুনি খাওয়া
৪০। চক্কর খাওয়া
৪১। ডিগবাজি খাওয়া
৪২। গোত্তা খাওয়া
৪৩। কান্নি খাওয়া (কাটা ঘুড়ি কান্নি খায়)
৪৪। ঘুরপাক খাওয়া
৪৫। দোল খাওয়া
৪৬। ঝুল্লু খাওয়া (জোরে জোরে দোল খাওয়া)
৪৭। মোচড় খাওয়া
৪৮। বাকি খাওয়া
৪৯। ভালোমন্দ খাওয়া
৫০। মাল খাওয়া (মদ্যপান করা)
৫১। চুমু খাওয়া
৫২। পুলিশের টিকিট খাওয়া
৫৩। ঘুষ খাওয়া
৫৪। টাকা খাওয়া
৫৫। থতমত খাওয়া
৫৬। খাবি খাওয়া
৫৭। ভিরমি খাওয়া
৫৮। ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া
৫৯। হিমশিম খাওয়া
৬০। লুটোপুটি খাওয়া
৬১। গড়াগড়ি খাওয়া
৬২। চোখের মাথা খাওয়া
৬৩। ধরা খাওয়া
৬৪। ধোঁকা খাওয়া
৬৫। কাঁচকলা খাওয়া (ব্যর্থ অর্থে)
৬৬। খাপ খাওয়া
৬৭। ভয় খাওয়া
৬৮। বিয়ে খাওয়া
৬৯। দাওয়াত খাওয়া
৭০। সিন্নি খাওয়া
৭১। প্রসাদ খাওয়া
৭২। জামাই খাওয়ানো
৭৩। মিসকিন খাওয়ানো
৭৪। বৈদ্যুতিক শক খাওয়া
৭৫। গুলি খাওয়া
৭৬। ঘাস খাওয়া (জনগণ ঘাস খায় না, সবই বোঝে)
৭৭। ধাওয়া খাওয়া
৭৮। টাস্‌কি খাওয়া (চমকে যাওয়া)
৭৯। কসম খাওয়া
৮০। হালাল-হারাম খাওয়া
৮১। প্রেমে ছ্যাঁক খাওয়া
৮২। তপ্ত কিছুতে ছ্যাঁক খাওয়া
৮৩। ঘোল খাওয়ানো (বোকা বানানো)
৮৪। তেল খাওয়া (গাড়ি পুরানো হলেই তেল বেশি খায়, কথাটা সত্যি নয়)
৮৫। পাঠকের চটুল সংবাদ, উপন্যাস বা সংবাদ খাওয়া
৮৬। শ্রোতাদের গান খাওয়া
৮৭। নাকানিচোবানি খাওয়া (আক্ষরিক অর্থে – পানিতে)
৮৮। নাকানিচোবানি খাওয়ানো (প্রতীকী অর্থে – সমস্যায়)
৮৯। হাওয়া খাওয়া (বেড়ানো অর্থে)
৯০। হাওয়া খাওয়া (অনাহার অর্থে)
৯১। হাবুডুবু খাওয়া (আক্ষরিক অর্থে – পানিতে)
৯২। হাবুডুবু খাওয়া (প্রতীকী অর্থে – সমস্যায়)
৯৩। যাঁতা খাওয়া (দুই বস্তুর চাপ)
৯৪। যাঁতা খাওয়া (শক্তিশালী প্রতিপক্ষের চাপ)
৯৫। মার খাওয়া (দৈহিক প্রহার)
৯৬। মার খাওয়া (পরাজিত হওয়া – "জগৎ জুড়িয়া এমনি করিয়া মার খাবে দুর্বল ?"– নজরুল)
৯৭। মার খাওয়া (ব্যবসায়ে ব্যর্থ হওয়া)
৯৮। ঠাণ্ডা খাওয়া (ঠাণ্ডা খেয়ে গায়কের গলা বসে গেছে)

৯৯। ঠ্যালা খাওয়া (নেতারা জনগণের ঠ্যালা খেলে বুঝবে)
১০০। পাল্টি খাওয়া (নেতারা এত দলবদলের পাল্টি খায় কেন ?)
১০১। ঝাড়ি খাওয়া (অফিসে বস্-এর বা বাড়িতে বৌয়ের...)
১০২। চাক্কু খাওয়া (গুণ্ডাদের বাধা দিতে গিয়ে সে চাক্কু খেয়েছে)
১০৩। দিব্যি খাওয়া (দিব্যি খেয়ে বলো, সিগ্রেট ছেড়ে দেবে ?)
১০৪। ধুলো খাওয়া (বই মেলা'র...)
১০৫। ঝাল খাওয়া (ছেলেটা ঝাল খেতে পছন্দ করে)
১০৬। কচু খাওয়া ("কাঠবেড়ালী, তুমি মরো, তুমি কচু খাও!" – নজরুল)
১০৭। গুলে খাওয়া (মাস্টার এত করে পড়ালো, ছাত্রটা পরীক্ষা হলে সব গুলে খেয়েছে)
১০৮। ছ্যাঁচা খাওয়া (দরজার ছ্যাঁচা খেয়ে ওর আঙুল থেঁতলে গেছে)
১০৯। পোকায় খাওয়া (বাজার থেকে পোকায় খাওয়া আম নিয়ে এলে)
১১০। সম্পত্তি খাওয়া (এতিম ভাস্তি'টার সব সম্পত্তি ওর চাচা খেয়ে ফেলেছে)
১১১। চাকরি খাওয়া (বেশি বাড়াবাড়ি বরলে বস্ তোমার চাকরি খেয়ে ফেলবে)
১১২। কলা খাওয়া (কোলকাতার সাংসদ অভিধান – চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়া)
১১৩। মুখ খাওয়া (সমাজে অপদস্থ হওয়া)
১১৪। বাতাস খাওয়া (গরমে অতিষ্ঠ হয়ে ছেলেটা পাখার সামনে বসে বাতাস খাচ্ছে)
১১৫। ঝাপটা খাওয়া (বাতাসের ঝাপটা খেয়ে ফুলদানিটা উল্টে গেছে)
১১৬। ড্রাগ-এ খাওয়া (ছেলেটা এত ভালো গাইতো, ড্রাগই ওকে খেলো)
১১৭। ছাই খাওয়া ("ছাই খা" – নাকচ বা গালি অর্থে)
১১৮। মাথা খাওয়া (মাথা খাও – দোহাই অর্থে)
১১৯। মাথা খাওয়া (নষ্ট করা – বেশি আদর দিয়ে ছেলেটার মাথা খাওয়া হচ্ছে)
১২০। লজ্জাশরমের মাথা খাওয়া – (নির্লজ্জ অর্থে)
১২১। পিট্টি খাওয়া (আদরের)
১২২। চাপড় খাওয়া
১২৩। চিড় খাওয়া
১২৪। বেড়ার বাগান খাওয়া (রক্ষক যখন ভক্ষক)
১২৫। দিল্লী কা লাড্ডু খাওয়া
১২৬। দিন এনে দিন খাওয়া
১২৭। লাভের গুড় পিঁপড়ে খাওয়া
১২৮। ঠাকুর ঘরে কে রে – আমি কলা খাই না (সাফাই গাওয়া)
১২৯। ডুবে ডুবে পানি খাওয়া (গোপনে কিছু করা)
১৩০। হিসেবের কড়ি বাঘে খায় না (লিখিত দলিল ব্যর্থ হয় না)
১৩১। ঘ্রানেন অর্ধম্ ভোজনম্ (খাবারের সুগন্ধে অর্ধেক খাওয়া হয়ে যায)
১৩২। ডুডুও খাব টামাক-ও খাব (দুই দিকেই লাভবান হবার চেষ্টা)
১৩৩। গাছেরও খাব তলারও কুড়াব (দুই দিকেই লাভবান হবার চেষ্টা)
১৩৪। কাঠমিস্ত্রিরা বলে কাঠ ঘুণ খেয়েছে
১৩৫। কাঠমিস্ত্রিরা বলে কোন কাঠ কোন রং ভালো খাবে
১৩৬। "বাবা'য় খাবে'নে" (বাবা ধরে পেটাবে – বরিশালের ভাষা)
১৩৭। ধরে খাওয়া (বেশি করে খাওয়া – মাগুরা'র ভাষা ?)
১৩৮। খেয়ে না খেয়ে কিছু করা (একাগ্রতার সাথে)
১৩৯। ভাত দে হারামজাদা নইলে মানচিত্র খাবো (কবি রফিক আজাদ)
১৪০। বুলবুলিতে ধান খেয়েছে (বিদেশিরা দেশের সম্পদ লুণ্ঠনে প্রাচীন কবির অভিব্যক্তি)
১৪১। নদীটা অমুক গ্রাম খেয়ে ফেলেছে
১৪২। সিনেমার নাম "খাইছি ত'রে" (বিপদে ফেলা অর্থে)
১৪৩। "খাইছে আমারে" (বিপদে পড়া অর্থে)
১৪৪। মধু খাওয়া (লাম্পট্য অর্থে)
১৪৫। ত্যালানি খাওয়া (স্তুতিবাক্য পছন্দ করা – আমার বস্ ত্যালানি খেতে খুব পছন্দ করে)
১৪৬। আবৃত্তিতে ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক আবৃত্তিকারের কণ্ঠ খেয়ে ফেলেছে
১৪৭। ফ্রিজ খাওয়া (নাটকে)
১৪৮। ডায়ালগ খাওয়া (নাটকে)
১৪৯। ইজ্জত খাওয়া
১৫০। বাউন্স খাওয়া (পালটক-এর রুমগুলোতে অনেকে বাউন্স খায়)
১৫১। রেড ডট খাওয়া (পালটক-র রুমগুলোতে অনেকে রেড ডট খায়)
১৫২। ডি-সি খাওয়া (ডিস্কানেক্ট – পালটক-এর রুমগুলোতে অনেকে ডি-সি খায়)
১৫৩। লাড্ডু খাওয়া (পরীক্ষায় ছেলেটা লাড্ডু খেয়েছে অর্থাৎ ফেল করেছে)
১৫৪। "লোকটা মরতে মরতেও মরছে না, ওর এখনো খাওয়া বাকি আছে" (পশ্চিম বঙ্গের ভাষা)
১৫৫। লম্পট-টার খাই-খাই ভাব দেখলে গা জ্বলে যায়

(কিছু শব্দে অর্থ ও শব্দ-প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা ও মতান্তর থাকতে পারে)

হাদিসে আছে নবীজী মেসওয়াক করার সময় লোকেরা তাঁকে বৌ-পেটানোর পদ্ধতি জিজ্ঞেস করলে তিনি নাকি মেসওয়াকটা ঠুস করে গায়ে লাগিয়ে বলেছিলেন – 'এভাবে।' এ-সব হাদিস তাঁর মর্যাদার খেলাফ কারণ বিষয়টা টুথব্রাশেরও নয় ডাণ্ডারও নয়, বিষয়টা নীতির। টুথব্রাশ দিয়ে খোঁচানো যায় কিন্তু পেটানো অসম্ভব। অন্যান্য চেষ্টায় যাকে মানানো যায় না তাকে টুথব্রাশ দিয়ে খুঁচিয়ে মানানো যাবে ? ডঃ সুলায়মান বলেছেন নবীজী বৌ-পেটানোর বিরুদ্ধে এতই ক্রুদ্ধ ছিলেন যে তিনি

ঘোষণা করেছিলেন কেউ বৌ পেটালে যেন তাঁর সামনেই সে না আসে, অর্থাৎ তিনি তার মুখই দেখতে চান না। ফাতিমা মার্নিসি তাঁর বইতে জানাচ্ছেন বৌ-পেটানোতে শতাব্দী ধরে অভ্যস্ত সেই সমাজ এ-ঘোষণায় একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। ভক্ত মুসলমানদের জন্য এ ছিল যেন ফাঁসির আদেশ।

বরং স্ত্রী-প্রহারের সুস্পষ্ট আয়াত আছে সুরা ছোয়াদ ৪৪-এ। এতে হজরত আয়ুবকে (আঃ) বলা হয়েছে গাছের কাঁচা ডাল দিয়ে স্ত্রীকে প্রহার করতে (কেউ কেউ অনুবাদ করেছেন 'তৃণশলাকা' – এটা ঠিক নয়)। কিন্তু এ আয়াতের নির্দিষ্ট শর্ত ও পটভূমি আছে যা নবীর জন্যই, সাধারণ মুসলমানের জন্য নয়। স্ত্রী-প্রহার মানবজাতির চিরন্তন ইতিহাস কিন্তু একে ধর্মের নামে বৈধ করা মারাত্মক অপরাধ। এতে আত্মবিশ্বাসী নারী তৈরি হয় না, সুসন্তান গড়ে ওঠে না, এবং ফলে আত্মবিশ্বাসী মুসলিম-জাতি তৈরি হয়নি। তাই নিজেদের সমস্ত ব্যর্থতার জন্য অন্যের ষড়যন্ত্রের বাহানা করি আমরা।

'অনুবাদে ভুল' এ-তত্ত্ব ছাড়া নবীজী ও কোরাণের নখস্ দিয়েও স্ত্রী-প্রহারকে ইসলামি পদ্ধতিতেই বাতিল করতে পারেন আমাদের আলেমরা ঃ দেখুন "নারীর উত্তরাধিকার ও সুস্পষ্ট নির্দেশ" নিবন্ধে। তবে যে কোনো পদ্ধতিতেই হোক, স্ত্রী-প্রহার বাতিল করতে গেলে বহু জাল হাদিসে টান পড়বে। যেমন, নবীজী নাকি বলেছেন, "যেমনভাবে দাস-দাসীদের প্রহার কর তেমনভাবে কখনো স্ত্রীদের মারবে না। তারপর রাতে তাদের সাথে শোবে" (সহি বুখারি হাফেজ আব্দুল জলিলের অনুবাদ হাদিস নং ২৪৬৮)। এ একটা কথা হল ? কিংবা "রোজ হাশরে কোন স্বামীকে জিজ্ঞেস করা হবে না কেন সে স্ত্রীকে মেরেছিল" (হাদিস নং ২১৪২ ইন্টারনেটে সহি আবু দাউদ)। আপনারাই বলুন, এটা কোনো নবী-রসুলের কথা হল ? ধর্মের নামে কেলেঙ্কারি নয় এটা ?

ডঃ সুলায়মান বলছেন, "যদি আমরা (১) পারস্পরিক সমঝোতা, (২) ইসলামে মানুষের সম্মান ও অধিকার, (৩) প্রত্যেকের নিজের সিদ্ধান্ত লইবার অধিকার, (৪) দম্পতির পারস্পরিক সম্পর্ক, (৫) স্বামী ও স্ত্রীর সম্মানের সহিত বিবাহবন্ধন ছিন্ন করার অধিকারের বিষয়গুলি মানিয়া চলি তবে সুরা নিসা আয়াত ৩৪-এ 'দারাবা' শব্দটি আঘাত, ব্যথা বা অসম্মান বুঝায় না। সবচাইতে যুক্তিযুক্ত হইবে ছাড়িয়ে দেওয়া, তালাক দেওয়া বা আলাদা হইয়া যাওয়া।"

আমরা জানি নাসুজ শব্দের প্রধান অর্থ হলো অশ্লীল কর্ম। নাসুজ ছাড়া অন্য কোনো কারণে স্ত্রীকে তালাক দিলে তা হবে আল্লাহ'র দেয়া সীমা অতিক্রম ঃ "যদি তারা কোনো সুস্পষ্ট নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত না হয় তবে তাদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করো না (অর্থাৎ তালাক দিয়ো না – লেখক) এবং তারাও যেন বের না হয়, – এগুলো আল্লাহ'র নির্ধারিত সীমা" (সুরা ত্বালাক ১)।

এ তো গেল কোরাণের কথা। নবীজী কি বলেন ? নিশ্চয়ই তিনিও কোরাণের মূল্যবোধের কথাই বলেন – "স্ত্রী কেবল অশ্লীল কর্মে লিপ্ত হইলেই তাহাকে হাল্কাভাবে প্রহার করা যাইবে" – বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ৩য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৮৫২, তারিখ আল্ তাবারি ৯ম খণ্ড পৃষ্ঠা ১১৩ এবং সহি ইবনে মাজাহ ৪র্থ খণ্ড হাদিস ৩০৭৪। অর্থাৎ স্ত্রী অশ্লীল কর্মে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোনো কারণ বা বাহানায় স্ত্রী-প্রহার করিলে তাহা স্বয়ং রসুলের বিরুদ্ধে যাইবে।

কেউ যদি প্রশ্ন করে কোরাণ-রসুল তাহলে স্ত্রী-প্রহারের অনুমতি দিয়েছে, তাকে আমি বলবো বৌ অন্যের সাথে শারীরিক সংসর্গ করলে কোনো স্বামী কি কেতাব খুলে দেখতে যাবে কি লেখা আছে সেখানে ? মোটেই যাবে না, বরং তার মাথায় রক্ত চড়ে যাবে এটাই স্বাভাবিক। সে-অবস্থায় পেটানো হতেই পারে, বরং খুন করাও বিরল নয়। এই স্বাভাবিকতাকে অস্বীকার করেননি কোরাণ-রসুল ; কথায় কথায় স্বামীর ইচ্ছে হলেই বা রাগের মাথায় স্ত্রী-প্রহারকে কঠিনভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছেন সুস্পষ্ট ভাষায় পরকীয়ার শর্ত দিয়ে।

এবারে চলুন দেখা যাক একটা হিসেবের কড়ি যা কিনা বাঘেও খেতে পারে না। অর্থাৎ যত ধূর্তই হোক না কেন ঐ কড়ি নিয়ে খেল্ খেলবার সাধ্য কোনো খেলোয়াড়ের নেই। এ থেকে পরিষ্কার হয়ে যাবে কিভাবে একটা ন্যায়ের ধর্মকে পেঁচিয়ে নারী-বিরোধী অপধর্ম ক'রে তোলা হয়েছে, এবং ক'রে তোলা হয়েছে ঐ নবীজীর নামেই। খেলোয়াড়রা ভালো ক'রেই জানত তাদের কথা নবীজী'র মুখে তুলে না দিলে জনগণ গ্রহণ করবে না। সহি হাদিস সুনান আবু দাউদ থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি, এটা আছে এম. এ. এস. অর্থাৎ আমেরিকা-ক্যানাডাভিত্তিক বিশাল শারিয়াপন্থী সংগঠন মুসলিম স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের ওয়েবসাইটে।

হাদিস নং ২১৩৯ ঃ সাহাবী মাবিয়া আল্ কুসাইরী নবীজী'র কাছে গিয়ে স্ত্রীদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। নবীজী বললেন, নিজেরা যা খাও পরো তাদের সেইরকম খাওয়াবে পরাবে। আর, **তাদের প্রহার করবে না** বা অপমান করবে না।

সুস্পষ্ট হুকুম। হ্যাঁ, নবী-রসুলের মুখে এ-কথাই শোভা পায়, এই হলেন আমাদের নবীজী। স্ত্রীদের দল তখন ইসলামে তাঁদের সম্মান রক্ষা দেখে স্বভাবতই খুশি হলেন। বাংলায় একটা কথা আছে "শতচক্রে ভগবান ভূত"। এবারে দেখুন রসুলের এই চমৎকার হুকুমটা ষড়যন্ত্রের দুইচক্রে কিভাবে ধাপে ধাপে পেঁচিয়ে গিয়ে নারী-বিরোধীতায় রূপ নিচ্ছে।

হাদিস নং ২১৪১ ঃ সাহাবীরা তাঁর কাছে এসে অভিযোগ করলেন, পিটুনির অভাবে বৌগুলোকে নাকি স্বামীদের বিরুদ্ধে উৎসাহিত (emboldened) করা হচ্ছে। এই অভিযোগের ফলে তিনি নাকি বৌ-পিটানোর অনুমতি দিলেন। স্ত্রীর দল তাতে আপত্তি জানালে তিনি নাকি বললেন যারা আপত্তি করছে তারা নাকি সর্বোত্তম স্ত্রী নয়।

দেখলেন ? স্পষ্টই এটা পুরুষতন্ত্রের বানানো হাজার হাজার মারাত্মক জাল হাদিসের একটা। সমাজ বা শাসনকার্য চালানোর ব্যাপারে সাহাবীদের পরামর্শ নিতেন নবীজী, এটা তা নয়। এটা হল কেয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মুসলিম নারীর সম্মান ও অধিকার যা তিনি

রেখেছেন প্রথম হাদিসটায়। আল্লাহ'র রসুল হয়ে নিজেরই এমন একটা ন্যাপরায়ণ হুকুম তিনি বদলে নারী-বিরোধী করবেন সাধারণ মানুষের চাপে ? হতেই পারে না। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় নবী-রসুলেরা কখনো মানুষের কথায় নিজের নির্দেশ বদল করেন না। মানবাধিকার রক্ষায় তাঁরা মানুষের কথামতো চলেন না, মানুষকেই তাঁদের কথামতো চলতে হয় নইলে তাঁরা নবী কিসের ! এর পরে দেখুন সে অধিকার কি হিংস্রভাবে পদদলিত করা হয়েছে ঐ নবীজীর নামেই।

হাদিস নং ২১৪২ ঃ নবীজী নাকি বলেছেন পরকালে কোনো স্বামীকে জিজ্ঞেস করা হবে না দুনিয়াতে সে কেন বৌকে পিটিয়েছিল। অর্থাৎ স্বামীকে বৌ-পেটানোর ফ্রী লাইসেন্স দেয়া হল, রাষ্ট্র বা আইন তো দূরের কথা, আল্লাহ-রসুলের কাছেও তার কোনো জবাবদিহিতা থাকল না।

এই হলো হিসেবের কড়ি। ঐ "নবীজী বলেছেন, নবীজী বলেছেন" ক'রে ক'রে মুসলিম নারীদের সর্বনাশ করা হয়েছে, ইসলামের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়ে বদনাম হয়েছে। ওদিকে ইন্টারনেটে সহি হাদিস সুনান আবু দাউদের বেশকিছু হাদিস উধাও হয়ে গেছে, যেমন ২০৪০-এর পরেই ২০৪৪ ; ২২৩৬-এর পরে ২২৪৭, ইত্যাদি। এভাবেই বহু নারী-বিরোধী তথ্য গোপনে মুছে ফেলা হচ্ছে। যেমন ইমাম গাজ্জালীর ৯ খণ্ডের এহ্‌ইয়া উলুমিদ্দীন কেতাবের ২য় খণ্ডে প্রচণ্ড নারী-বিরোধী কথাবার্তা আছে। ইন্টারনেটে তার বেশকিছু মুছে ফেলা হয়েছে। কিন্তু আমাদের কাছে তো বইগুলো আছে, আমরা তো দেখাতে পারব। গোপনে মুছে ফেলাটা অপরাধী মনের লক্ষণ। কাজটা খোলাখুলি করলেই তো হয়, বললেই তো হয় : যা হবার হয়েছে, এখন আমরা এগুলো বাদ দিচ্ছি। এগুলোর বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রতিবাদ তো চিরকালই ছিল, যেমন ৯ম শতাব্দীতে লেখা "দ্য তকদিমা অফ্ ইব্‌নে আবি হাতিম আল্ রাজী" থেকে শুরু ক'রে সাম্প্রতিককালের হাদিস-বিরোধী মুসলিম বিশেষজ্ঞদের বইগুলো। একই প্রতিবাদে আমাদের মওলানা আকরম খান থেকে শুরু ক'রে সাম্প্রতিক মোহাম্মদ সা'দউল্লাহর লেখা বই আছে, আনিসুর রহমানের মতো মুসলিম লেখকরাও আছেন। তুর্কী সরকার সহি হাদিসগুলো থেকে হাস্যকর, নোংরা, অবৈজ্ঞানিক ও মানবতা-বিরোধী হাদিস বাদ দিয়ে সহি হাদিসের নূতন সঙ্কলন বের করার প্রোজেক্ট নিয়েছেন, এটা শুভ লক্ষণ। ঐ হাদিসগুলো বাদ হলে শত শত নারী-বিরোধী শারিয়া আইনের পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে যাবে কারণ ওগুলো দিয়েই ঐ ইসলাম-বিরোধী আইনগুলো বানানো হয়েছে।

পুরুষতান্ত্রিক ষড়যন্ত্রের এই কারাগার ভেঙে আমাদের প্রতিষ্ঠা করতেই হবে সেই হারানো নারী-অধিকার যা ইসলাম আমাদের দিয়েছিল চোদ্দশো বছর আগে, যা ডাকাতি হয়ে গেছে তথাকথিত আল্লা'র আইনের নারী-বিরোধী হিংস্রতায় ॥

নারীর মুসলমানি

মন শক্ত করে নিন, এবারে এক ভয়ঙ্কর জায়গায় নিয়ে যাব আপনাদের, ওটার সাথে ইসলামের নাম জড়ানো আছে। এক সতিদাহ ছাড়া ধর্মের নামে এত সর্বগ্রাসী, এত ভয়ঙ্কর নারী-অত্যাচার মানুষের ইতিহাসে নেই, সংখ্যায়ও সতিদাহ এত বেশি নয়। সরাসরি শোনা যাক ইউরোপ-আমেরিকার "ফ্যাশন জগতের বিস্ময়কর মহিলা" বিখ্যাত ফ্যাশন মডেল ওয়ারিস ডিরি'র মুখ থেকে তাঁর ছোটবেলার স্মৃতি (বিশ্বের সর্বাধিক পঠিত ম্যাগাজিন রিডার্স ডাইজেস্ট আগস্ট, ১৯৯৯)। আফ্রিকান মহিলা ওয়ারিস ডিরি এখন ইউরোপে বাস করেন এবং বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থায় এ-বিষয়ের ওপর কাজ করেন। তাঁর ছোটবেলার মর্মান্তিক কাহিনীর সারাংশ দিচ্ছি।

সারাংশ ঃ

"চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। আমি আমার ছোট্ট কম্বলটি লইয়া মায়ের পিছুপিছু চলিলাম ও ঝোপঝাড়ের মধ্যে ঢুকিয়া মাটিতে বসিলাম। মা বলিলেন, 'আমরা এখানে অপেক্ষা করিব'। একটু পরেই আমি এক জিপসি নারীর চপ্পলের আওয়াজ শুনিলাম। মা একটি সমতল পাথর দেখাইয়া বলিলেন, 'উহার উপর বসো'। মা আমাকে বসাইয়া আমার পিছনে বসিয়া তাঁহার বুকে আমার মাথা চাপিয়া ধরিলেন। আমি হাত দিয়া তাঁহার উরু জড়াইয়া ধরিলাম। তিনি একটি শক্ত শিকড় আমার দাঁতের মধ্যে ধরাইয়া দিলেন। আতঙ্কে আমার শরীর হিম হইয়া গেল। জিপসি মহিলাটি একটি ভাঙ্গা রেজর-ব্লেড বাহির করিল। আমি উহাতে শুকনো রক্ত দেখিতে পাইলাম। সে উহাতে থুতু ফেলিয়া কাপড় দিয়া ঘষিয়া পরিষ্কার করিল। মা আমার চোখের উপর কাপড় দিয়া বাঁধিয়া দিলেন। তারপর আমি অনুভব করিলাম আমার মাংস কাটা হইতেছে। আমার চামড়ার ভিতরে ব্লেডটির খস খস শব্দ শুনিতে পাইলাম। সেই ব্যথা বর্ণনা করার ভাষা নাই। আমার পা ছটফট করিতে লাগিল, আমি অজ্ঞান হইয়া গেলাম।

জ্ঞান ফিরিলে আমি দেখিলাম জিপসি মহিলাটি আকাসিয়া গাছের অনেকগুলি কাঁটা জড়ো করিয়াছে। সেগুলি সে আমার চামড়ায় ফুটাইয়া দিল, তারপর একটি শক্ত সুতো দিয়া সেলাই করিতে লাগিল। সেই ব্যথা এত বেশি ছিল যে আমি মরিয়া যাইতে চাহিতেছিলাম। আমার দুই পা পরস্পরের সাথে বাঁধা ছিল, তাই আমি নড়িতে পারিতেছিলাম না। পাথরটি এমনভাবে রক্তে ভাসিয়া গিয়াছিল যে মনে হইতেছিল উহাতে কোন পশুকে জবাই করা হইয়াছে। উহাতে আমার শরীরের মাংসখণ্ড লাগিয়া ছিল। কিছুক্ষণ পর চোখ খুলিয়া দেখিলাম সেই মহিলা চলিয়া গিয়াছে। গাছের নীচে একটি ঘর বানানো হইয়াছিল, সেখানে আমাকে একাকী কয়েক সপ্তাহ থাকিতে হইবে। মা এবং আমার বোন আনাম আমাকে টানিয়া সেই ঝোপের ভিতরে লইয়া গেল।

শুধুমাত্র ম্যাচকাঠির সমান একটি ছিদ্র রাখা হইয়াছিল। কয়েক ঘণ্টা পরে প্রস্রাবের প্রথম বিন্দুতে আমার মনে হইল শরীরে অ্যাসিড লাগিয়া গিয়াছে। কয়েক দিনের মধ্যে আমার ইন্‌ফেক্‌শন হইয়া প্রবল জ্বর হইল। আমি বারবার অজ্ঞান হইতেছিলাম ও জ্ঞান ফিরিয়া পাইতেছিলাম। দুই সপ্তাহ ধরিয়া মা আমাকে খাবার ও পানি আনিয়া দিলেন।

বহু বালিকা অপেক্ষা অনেক আমি ভাগ্যবতী। তাহারা অবিরত রক্তক্ষরণে, ইন্‌ফেক্‌শনে, টিটেনাস কিংবা শারীরিক ও মানসিক আঘাতে মরিয়া যায়। সারাজীবনে আমার স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা ছাড়াও যৌবনের আনন্দ আমি কোনদিনই পাই নাই।"

শেষ হল ওয়ারিস ডিরি'র দুঃসহ কাহিনী। আমিও লিখলাম, আপনিও পড়লেন। কিন্তু লেখা দিয়ে কি কষ্ট সম্পূর্ণভাবে বুঝানো যায়? পড়ে কি কষ্ট সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যায়? আপনি যতক্ষণ ধরে এটা পড়লেন, ততক্ষণে ওদিকে কতজন মুসলিম বালিকা এই মর্মান্তিক কষ্ট ও দুর্ভাগ্যের শিকার হল? ধরে নিন আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছে বালিকারা। সূর্য ওঠার সাথে সাথে এক একটি বালিকাকে টেনেহিঁচড়ে কোরবাণীর পশুর মত ধরেবেঁধে চলল এই কাটাছেঁড়া ও সেলাই। সারাদিন গেল, সন্ধ্যা হয়ে সারারাত গিয়ে সূর্য ওঠা পর্যন্ত ছয় হাজার (বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান ১৯৯৯ – এখন নিশ্চয় আরো অনেক বেশি)। এটা ব্যাপকভাবে করা হয় আফ্রিকার বিস্তীর্ণ মুসলিম সমাজে, কোনো কোনো দেশে শতকরা ৯৮% নারী এর শিকার হন। ওখানকার শারিয়াপন্থীরা বলেন এটা ইসলামি। কেউ তার প্রতিবাদ করলে তাঁরা বলেন মুরতাদ, কতল করতে হবে। বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থার মাধ্যমে ওয়ারিস ডিরি এটা উচ্ছেদের কাজ করছেন। তিনিও বলেছেন ওখানকার শারিয়াপন্থীরা তাঁকে পেলে কেটে ফেলবে।

এই হল অবস্থা!

যাহোক, পদ্ধতিটার নাম 'নারীর মুসলমানি'। বিভিন্ন ধর্মের নামে যত বিধানে নারীরা ধ্বংস হয়েছেন তার মধ্যে এক ভয়ঙ্কর এই বিধান। কারণ আর কোন বিধান এত দীর্ঘদিন ধরে সুবিশাল এক ধর্মীয় গোত্রের প্রায় প্রত্যেকটি নারীর যৌবনকে সারাজীবনের জন্য ধ্বংস করেনি। সোমালিয়ায় ৯৮% নারী এর শিকার হন। পুরুষের মুসলমানির মত এটা শুধু চামড়া কাটা নয়, এ হল ফুসফুসের মত, কিডনীর মত শরীরের এক গুরুত্বপূর্ণ সংবেদনশীল অঙ্গ কাটা যার ওপর যৌবনের বৈধ আনন্দ নির্ভর করে। সেজন্যই ওয়ারিস ডিরি বলেছেন – "যৌবনের আনন্দ আমি কোনদিনই পাই নাই।" ওটা চেঁছে-কেটে সম্পূর্ণটাই তুলে নেয়া হয় বলেই এর রক্তক্ষরণ বন্ধ হতে চায় না। বাবা-মা ভাই-বোনের চোখের সামনে বহু বালিকা ক্রমাগত রক্তক্ষরণে ছটফট করতে করতে মারা যায়। বিশ্বের মানবাধিকার ও নারী-সংগঠনগুলো এর বিরুদ্ধে সোচ্চার চিরকালই। আশ্চর্য এই যে, বিশ্বময় মুসলমান নেতারা এটা জানার পরেও ইসলামের নামেই কোটি মুসলিম

নারীর ওপরে এই নিঃশব্দ অত্যাচার ঘটে চলেছে প্রত্যেকটি দিন, এবং ঘটে চলেছে হাজার বছর ধরে। তা-ও আবার মুসলিম-বিশ্বের কেন্দ্র মধ্যপ্রাচ্যের নাকের ডগায়।

এবারে আমরা তিনটে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের দিকে তাকাব।

১। সারা উত্তর-আফ্রিকায় এবং বিচ্ছিন্নভাবে অন্যান্য মুসলিম সমাজে এটা ইসলামি হিসেবেই প্রবলভাবে পালন করা হয়েছে চিরকাল। ওখানকার নারীদেরও এটাকে ইসলামি বলে বিশ্বাস করানো হয়েছে।
২। অনেক মুসলিম বিশেষজ্ঞ এটাকে অনৈসলামিক বলে এর প্রতিবাদ করেছেন চিরকাল।
৩। ২০০৬ সালে মুসলিম নেতারা একযোগে এটা অনৈসলামিক বলে ঘোষণা করেছেন মিশরের কনফারেন্সে।
৪। ইরিত্রিয়ায় ২০০৬ সালে এবং মিশরে ২০০৮ সালে এটাকে অপরাধের পর্যায়ে ফেলে আইন পাস হয়েছে। খুব সম্ভব তিউনিসিয়া-মরক্কো-সিনেগাল-কেনিয়াতেও এ-আইন আছে।

খেয়াল করুন, ওখানকার নারী-পুরুষ-মওলানারা একে দৃঢ়ভাবে ইসলামি বলে বিশ্বাস করলেও আসলে এটা ইসলামি নয়। ওই একই হিসেবে আমাদের অনেক দৃঢ় ইসলামি বিশ্বাসও প্রকৃতপক্ষে ইসলামি নয়। এ-বইতে দলিল দিয়ে দেখানো হয়েছে আমাদের কি কি বিশ্বাস প্রকৃতপক্ষে ইসলামি নয়, এবং কেন নয়। স্বার্থের জন্য কিছু শক্তিশালী মানুষ অতীতে ওসব বিশ্বাস পরিকল্পনা করে তৈরি করে জনগণের মাথায় ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে এবং ওই স্বার্থের জন্যই বর্তমানের কিছু শক্তিশালী মানুষ এখনও তা রক্ষা করছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ তা বোঝে না। মনে-মাথায় একবার ইসলামি বলে বসে গেলে কেউ আর তা ছাড়ে না, বরং কেউ ছাড়তে বললে তাকে তেড়ে মারতে আসে। সব ধর্মের ক্ষেত্রেই কথাটা কঠিন সত্য।

আরও খেয়াল করুন, শারিয়ার বিশ্ব-নেতারা একে অবৈধ ঘোষণা করেই ক্ষান্ত দিয়েছেন, মাঠ-পর্যায়ে কোন বাস্তব কর্মপন্থা হাতে নেননি। ঠিক যেমন ফতোয়ার আদালতে ধর্ষিতা নারী বা বালিকার বেত্রাঘাতের শাস্তি দেখলে আমাদের কোন কোন শারিয়াপন্থী 'ইসলামে নেই' বলেই ক্ষান্ত দেন, বাস্তবে কিছুই করেন না। এটা একধরনের আত্মপ্রতারণা এবং অত্যাচারিতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। অথচ তাঁদের কর্মকাণ্ডের ওপরে ইসলামের উপকারিতা ও ভাবমূর্তি অনেকটাই নির্ভর করে। অবৈধ ঘোষণা এবং আইন পাশ করার পরেও আফ্রিকায় এটা মোটেই কমেনি, বন্ধ তো হয়ইনি। ধর্মের নামে কোন প্রথা একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে ঘোষণা বা আইন দিয়ে তা বন্ধ করা যায় না কারণ মানুষ ওটা মেনে চলার মধ্যে সওয়াব আছে মনে করে এবং স্রষ্টাকে লঙ্ঘন করতে ভয় পায়। তাই ওই ধর্ম থেকেই এর বিরুদ্ধে সূত্র ও যুক্তি তুলে এনে মাঠ-পর্যায়ে ও সরকার-পর্যায়ে কাজ করতে হয়, গণচেতনা সৃষ্টি করতে হয়। ভারতে সতিদাহ-প্রথা বন্ধ বা বিধবা-বিবাহ চালু করার ক্ষেত্রেও আমরা এ-পদ্ধতিই দেখি। মুসলিম নেতারা যা করেননি কিন্তু না-করা পর্যন্ত এটা বন্ধ হবে না, তা হলো এ-প্রথার শেকড়কে ইসলামি পদ্ধতিতেই বাতিল করা। অথচ বাতিল তো দূরের কথা, নেতারা সেই শেকড়ের উল্লেখ পর্যন্ত করেননি। অনেক নেতা ফস্ করে বলে ফেলেন কোরাণ-হাদিসে এর সমর্থন নেই। কথাটা মোটেই সত্যি নয়। কোরাণে এটা নেই বটে কিন্তু হাদিস ও শারিয়া আইনে অবশ্যই আছে, নাহলে এ-কুপ্রথা এত দীর্ঘদিন চলতে পারত না।

১। "পুরুষ ও নারীর জন্য মুসলমানি বাধ্যতামূলক" – শাফি' আইন নং e.4.3। এখানে স্পষ্টই নারী বলা আছে।
২। "বৈধ কারণে কেহ মুসলমানি না করিলে তাহার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।" – হানাফি আইন হেদায়া পৃষ্ঠা ৩৬৩। অর্থাৎ কেউ বৈধ কারণ ছাড়া মুসলমানি না করলে শারিয়া-আদালতে সাক্ষী হতে পারবে না। এখানে নারী-পুরুষের কথা বলা হয়নি, তাই এটা নারী-পুরুষ দু'জনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বৈধ কারণ হিসেবে বলা আছে – "বৃদ্ধ বয়স (সম্ভবত বৃদ্ধ বয়সে ইসলাম গ্রহণ করলে – *লেখক*) ও অন্যান্য যথেষ্ট কারণ।"
৩। ইমাম ইবনে হাজার হায়তামি'র দেয়া ৪৪২টি ইসলাম-বিরোধী কাজের একটা তালিকা আছে, এর ৩৬৮ নম্বরে আছে ঃ "বয়স্ক হইবার পরেও মুসলমানি না করা" – শাফি' আইনের কেতাব "উমদাত আল্ সালিক" পৃষ্ঠা ৯৮৬। অর্থাৎ, বয়স্ক হবার পরেও মুসলমানি না করলে তা ইসলাম-বিরোধী হবে এবং নারী-পুরুষের উল্লেখ না থাকায় সবাইকেই এর আওতায় ধরতে হবে।
৪। "আবু হুরায়রা বলিয়াছেন ঃ আমি রসুল (সাঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছি 'পাঁচটি কাজ স্বভাবের বৈশিষ্ট্য (অর্থাৎ, স্বাভাবিক – *লেখক*), মুসলমানি, যৌনকেশ অপসারণ, মোচ ছোট করিয়া কাটা, নখ কাটা এবং বগলের পশম কাটা'" – মুহসিন খানের অনুদিত সহি বুখারী, ৭ম খণ্ড হাদিস নং ৭৭৯। এখানে নারী-পুরুষের উল্লেখ নেই।
৫। "মদিনায় এক মহিলা মুসলমানি করিত। রসুল (সাঃ) তাহাকে বলিলেন – 'গভীর করিয়া (severely) কাটিয়ো না কারণ ইহা নারীর জন্য ভাল ও স্বামীর জন্য আকাঙ্ক্ষিত'" – সহি আবু দাউদ হাদিস নং ৫২৫১। হাদিসের ভাষা থেকেই বুঝা যায় সেই মহিলা নারীর মুসলমানি করত।

এছাড়াও সহি বুখারী ৪র্থ খণ্ড হাদিস ৫৭৫, ৫৭৬ ; সহি মুসলিম ৩য় খণ্ড হাদিস ৬৮৪, সহি ইবনে মাজাহ ১ম খণ্ড হাদিস ৬০৮ এবং সহি তিরমিজি হাদিস ১৬৬-তে নারীর মুসলমানি'র উল্লেখ ও পরোক্ষ সমর্থন আছে। শাফি আইনের অনুবাদক ব্র্যাকেটে নিজের থেকে যোগ করেছেন "হাম্বলি মতে নারী-মুসলমানি বাধ্যতামূলক

নহে বরং সুন্নত, হানাফি মতে ইহা স্বামীর প্রতি সৌজন্য" । স্বভাবতই এ-সব সূত্রের ভিত্তিতে ওখানকার মওলানারা নারী-মুসলমানিকে ইসলামে বাধ্যতামূলক মনে করেন । সে-জন্যই "খৎনার সময় তারা আবৃত্তি করতে থাকে, 'আল্লা মহান, মুহম্মদ তার নবী ঃ আল্লা আমাদের দূরে রাখুক সমস্ত পাপ থেকে" – ডঃ হুমায়ুন আজাদের "নারী" পৃষ্ঠা ১৯৭ থেকে নওঅল (১৯৮০, ৩৩-৪৩) ও মাইল্‌স (১৯৮৮, ৮৮-৯০) । এর বিরোধীতা করার কারণেই ওখানকার মওলানাদের অনেকে আমাদেরকে মুরতাদ মনে করেন এবং আমাদেরকে খুন পর্যন্ত করার জন্য তৈরি । দু-দু'টো শারিয়া আইন, একটি তথাকথিত "ইসলাম-বিরোধী কাজের তালিকা" ও সাতটা সহি হাদিসের এ-সব শক্তিশালী সূত্রের সামনে মিশরের ইসলামি কনফারেন্সের ঘোষণা বাঁশপাতার মত উড়ে যায় । সরকারেরও সাধ্য নেই দূর মফস্বলের গ্রাম-গঞ্জে স্থানীয় মওলানাদের নিয়ন্ত্রণাধীন কোটি কোটি জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করা যে জনগণ নিজেরাই একে ইসলামি মনে করে । আইন বা পুলিশ-মিলিটারি দিয়ে পরাস্ত করার ব্যাপারও এটা নয়, এটা জনগণের ধর্মীয় আবেগ যা রাষ্ট্র, আইন বা পুলিশ-মিলিটারির চেয়ে হাজার গুণ শক্তিশালী । কাজেই আমাদের মুসলিম নেতাদের সর্বপ্রথম কাজ হল এ-সূত্রগুলো কেন ইসলামি নয় তা ঐ কোরাণ-হাদিস থেকেই প্রমাণ করা । এটা সম্ভব, একটা প্রমাণ দিচ্ছি । ওপরের আবু দাউদ থেকে দেখানো হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে বিশ্বের সর্বোচ্চ শারিয়া-নেতা ডঃ ইউসুফ কারজাভী বলেছেন ঃ "এই সকল হাদিস নির্ভরযোগ্য বলিয়া কোন প্রমাণ নেই" – সূত্র বিশ্বের বৃহত্তম শারিয়া-ওয়েবসাইট 'ইসলাম অন্ লাইন' ঃ

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-English-Ask_Scholar/FatwaE/FatwaE&cid=1119503543886

তারপর দরকার বিশ্বময় আন্দোলন গড়ে তোলা । এ-ছাড়াও প্রয়োজন স্থানীয় মওলানাদের সাথে আলোচনায় বসা, স্থানীয় সরকারগুলোর সহায়তায় (এ সহায়তা আছে) স্থানীয় রেডিও-টিভি-সংবাদপত্র-ম্যাগাজিনে ক্রমাগত প্রচার চালিয়ে জনগণকে বুঝানো কেন এ-প্রথা ইসলাম-বিরোধী । সেই সাথে এ-সত্যটাও জানানো যে এ-কুপ্রথা প্রাচীন ইউরোপে ছিল, সেখান থেকেই এটা আফ্রিকায় ঢুকেছে । সেজন্যই অন্য মহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে এটা বিরল । মনে রাখতে হবে, একটা দিন দেরি মানে আরো কয়েক হাজার মুসলিম নারীর জীবন ধ্বংস । সেজন্যই আল্ আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলার শেখ তানতাওয়ি এ-প্রথাকে অনৈসলামিক বলেছেন ।

দুঃখকষ্ট বেঁটে নিলে নাকি অর্ধেক হয় । তাই এবারে আপনাদের সাথে বড় একটা দুঃখ বেঁটে নিচ্ছি । উদ্ধৃতি দিচ্ছি বিশ্বের নাম-করা শারিয়া-উৎস থেকেই ঃ

১ । শেখ ইউসুফ আল্ কারজাভী বলিয়াছেন – "ইহা (নারী-মুসলমানি) বাধ্যতামূলক নহে । কেহ যদি মনে করে ইহাতে তাহার কন্যার মঙ্গল হইবে তবে ইহা করা উচিত । বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি ইহা (নারী-মুসলমানি – *লেখক*) সমর্থন করি ।" ইসলাম অন্ লাইন ঃ

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-English-Ask_Scholar/FatwaE/FatwaE&cid=1119503543886

কি-ঈ ? নারী-মুসলমানির মত ভয়াল হিংস্রতাকে "বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি সমর্থন করি" ?? এ-দুঃখ রাখব কোথায় ?

২ । আমাদের শারিয়াপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর মত মিশরেও আছে ইখওয়ানুল মুসলেমীন, মুসলিম ব্রাদারহুড নামে বিখ্যাত । ওরাও ওখানে শারিয়া-ভিত্তিক ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর । মিশর-সরকার বহু আগে ওদের বেআইনি ঘোষণা করলে ওরা তখন থেকেই স্বতন্ত্র হিসেবে রাজনীতি করছে । বাংলাদেশের শারিয়াপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর মত গত নির্বাচনেও ওদের বেশ ক'জন সাংসদ হয়েছে । ১৪ই জুন ২০০৮ তারিখে মিশর সরকার যখন নারী-মুসলমানিকে অপরাধ হিসেবে আইন পাশ করেছে এবং এ-অপরাধের শাস্তিও রেখেছে, তখন ওরা কি করেছে দেখুন ঃ "মুসলিম ব্রাদারহুডের তীব্র বাধার মুখে এই আইন পাশ হয়...মুসলিম ব্রাদারহুডের সাংসদেরা বারাবার দাবি করে যে এই আইন ইসলামি শারিয়ার পরিপন্থী এবং পশ্চিমা মতলবের স্বার্থ রক্ষা করে...নারী-মুসলমানিকে বেআইনি করার অর্থ পাপকে উৎসাহিত করা...তাহাদের (পশ্চিমা দেশের – *লেখক*) অনৈসলামিক অ্যাজেণ্ডা মিশরে প্রতিষ্ঠা করার জন্য পশ্চিমা প্রতিষ্ঠান হইতে NCMC প্রচুর ডলার পাইয়াছে" – মিশরের সর্বাধিক প্রচারিত ইসলামি সাপ্তাহিক আল্ আহরাম । NCMC হল National Council for Motherhood and Childhood যার প্রস্তাবের ভিত্তিতে এ-আইন পাশ হয় ।

কি-ঈ ? নারী-মুসলমানির মত বর্বর নিষ্ঠুরতাকে বেআইনি করার অর্থ পাপকে উৎসাহিত করা ?? এ-দুঃখ রাখব কোথায় ?

এবারে "পাকিস্তানের শারিয়া – বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ?" অধ্যায়ে দেখে নিন তথাকথিত আল্লা'র আইন ঃ "পরকীয়া ও ধর্ষণের প্রমাণ হইবে (ক) অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি, অথবা (খ) চারজন বয়স্ক পুরুষ মুসলমানের চাক্ষুষ সাক্ষ্য" – হুদুদ আইন নং ৭ (১৯৭৯), নং ২০ (১৯৮০) দ্বারা সংশোধিত, ৮-এর খ ।" ২০০৬ সালে সংসদে এ-আইন বাতিলের প্রস্তাব উঠলে শারিয়াপন্থী রাজনৈতিক দল ক্ষিপ্ত হয়ে দেশব্যাপী আন্দোলন ও সংসদ থেকে পদত্যাগের হুমকি দিয়ে বলেছে "শারিয়া মোতাবেক এই আইনই সঠিক, এর

কোনরকম পরিবর্তন কোরাণ ও শারিয়ার খেলাফ। এ-পরিবর্তন দেশকে অবাধ যৌনতার স্বর্গ বানাবে।"

কি-ঈ ? ধর্ষণের প্রমাণ চারজন বয়স্ক পুরুষ মুসলমানের চাক্ষুষ সাক্ষ্য ? এ-আইন পরিবর্তন করলে দেশ যৌনতার স্বর্গ হবে ? এ-দুঃখ রাখব কোথায় ?

শারিয়া-নেতারা মুখে যা-ই বলুন তাঁদের নিজেদেরই বাস্তব কর্মকাণ্ড তাঁদের চরিত্র অনৈসলামিক প্রমাণ করছে।

বিশ্ব-মুসলিম আর কতকাল এই চরিত্রের হাতে জিম্মি হয়ে থাকবে ?

ইসলামে নারীর বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার

প্রথমেই মন দিয়ে পড়ে নিন সহি বুখারী ডঃ মুহসিন খানের অনুদিত, ৭ম খণ্ড হাদিস ২০৬ কিংবা সহি বুখারী হাদিস নং ২৪৭৭ (হাফেজ আবদুল জলিল) ঃ "এখনও আমার চোখের সামনে ভাসিতেছে যে, বরীরার স্বামী মুগীস কাঁদিতেছে এবং তাহার পিছুপিছু ছুটিতেছে। চোখের পানিতে তাহার দাড়ি ভিজিয়া গেল। এই দৃশ্য দেখিয়া নবী করীম (দঃ) বলিলেন, 'হে আব্বাস ! বরীরার প্রতি মুগীসের ভালবাসা আর মুগীসের প্রতি বরীরার উপেক্ষা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক !' তিনি বরীরাকে বলিলেন, 'তুমি যদি মুগীসকে পুনরায় গ্রহণ করিতে !' সে বলিল, 'ইয়া রসুলুল্লাহ ! ইহা কি আপনার নির্দেশ ?' তিনি বলিলেন, 'আমি ইহা সুপারিশ করিতেছি।' বরীরা বলিল, 'মুগীসের প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নাই'।"

কি মনে হয় ? মুগীস বরীরাকে এতটাই ভালবাসত যে সে "কাঁদিতেছে এবং তাহার পিছুপিছু ছুটিতেছে, চোখের পানিতে তাহার দাড়ি ভিজিয়া গেল"। এত ভালবাসার পরেও "মুগীসের প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নাই" মানেই হল বরীরা মুগীসের সাথে সংসার করবে না, তাই না ? নবীজী হৃষ্টচিত্তে তাকে তদবস্থায়ই থাকতে দিলেন, দেখুন মুহিউদ্দনের অনুদিত কোরাণ, পৃষ্ঠা ২৭১ঃ- "বরীরা আরজ করলেন ঃ ইয়া রসুলুল্লাহ ! এটি আপনার নির্দেশ হলে শিরোধার্য, পক্ষান্তরে সুপারিশ হলে আমার মন তাতে সম্মত নয়। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ নির্দেশ নয়, সুপারিশই। বরীরা জানতেন যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) নীতির বাইরে অসন্তুষ্ট হবেন না। তাই পরিষ্কার ভাষায় আরজ করলেন ঃ তাহলে এ সুপারিশ আমি গ্রহণ করব না। রসুলুল্লাহ (সাঃ) হৃষ্টচিত্তে তাকে তদবস্থায়ই থাকতে দিলেন।"

কি মনে হয় ? নবীজী কি বরীরাকে বাধ্য করেছিলেন মুগীসের ঘর করতে ? না, করেননি। কারণ নারী কার সাথে সংসার করবে সে-ব্যাপারে পুরুষের মত নারীর ইচ্ছে-অনিচ্ছেই চূড়ান্ত। স্ত্রী'র নিজের তরফ থেকে তালাক দেবার অধিকার ছড়িয়ে আছে কোরাণ থেকে নবীজী হয়ে সাহাবী পর্যন্ত, উম্মুল মু'মেনীন (নবীজী'র স্ত্রী-গণ) থেকে সাহাবী-নারী পর্যন্ত। সূত্রগুলো দেখুন এবং নিজের বিবেককে প্রশ্ন করুন ঃ Narrated Aisha: Allah's Apostle gave us the option and we selected Allah and His Apostle. So, giving us that option was not regarded as divorce – সহি বুখারী – মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ মুহসিন খান অনুদিত, ৭ম খণ্ড হাদিস ১৮৮ (কিছু অনুবাদক ব্র্যাকেটে নিজের কথা ঢুকিয়ে দিয়েছেন (to remain with him or to be divorced) এবং (to be divorced), ওগুলো বাদ দিচ্ছি)। এ হাদিস আছে বুখারী ৩য় খণ্ড ৬৪৮-য়েও। এর সাথে সুরা আল্ আহযাব-এর আয়াত ২৮ ও ২৯ মিলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে আল্লাহ স্বয়ং নবী-পত্নীদেরকে অধিকার দিয়েছিলেন নবীজীর সাথে থাকার বা তাঁকে ছেড়ে যাবার। সে অধিকার প্রয়োগ করেই তাঁরা নবীজীকে ছেড়ে যাননি। এটা তাঁদের সিদ্ধান্ত এবং সঠিক সিদ্ধান্ত। এটা নিশ্চয়ই সত্যি যে নবী-পত্নীদের সব বিষয় সবার ওপরে প্রযোজ্য নয় (দেখুন আহযাব ৩০ ইত্যাদি)। কিন্তু এই বিশেষ বিষয়টা, অর্থাৎ কোরাণের ও নবীজী'র দেয়া নারীর নিজের তরফ থেকে তালাকের অধিকার সবার ওপরে প্রযোজ্য তা হাদিসেও প্রমাণিত। কারণ "আমি তাহার প্রেমে পড়িলাম বলিয়াই তাহাকে আমার সহিত ঘর করিতে হইবে" এটা জংলী আইন হতে পারে, ইসলামের নয়। খুলে দেখুন সুরা নিসা আয়াত ১৯ – Ye are forbidden to inherit women against their will. Nor should ye treat them with harshness, that ye may take away part of the **<u>dower</u>** ye have given them, – except where they have been guilty of open lewdness – ইউসুফ আলী)। নারীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের উত্তরাধিকারী হওয়া নিষিদ্ধ করা হল, প্রকাশ্য অশ্লীলতা না করা পর্যন্ত তাদের দেনমোহরের অংশ ফিরিয়ে নেয়া বা কর্কশ ব্যবহার করা নিষিদ্ধ করা হল। কি আশ্চর্য চমৎকার হুকুম কোরাণের ! এর সাথে মিলিয়ে নিন সুরা ত্বালাক ১ – প্রকাশ্য অশ্লীলতা না করা পর্যন্ত স্ত্রীকে বহিষ্কার করা নিষিদ্ধ করা হল।

'উত্তরাধিকারী' শব্দটা আরবি ভাষার একটি অভিব্যক্তি মাত্র, সম্পত্তির মত দাসী-মালিকের ব্যাপার নয়—বাংলায় যেমন 'হুক্কা-খাওয়া'র মানে হুঁকোটাকে কামড় দিয়ে খেয়ে ফেলা নয়। 'দেনমোহর' শব্দটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে আয়াতটা স্ত্রীর ব্যাপারেই কারণ স্ত্রী ছাড়া ত্রিভুবনে আর কাউকেই দেনমোহর দেয়া যায় না। এর সমর্থন পাবেন বিশ্ববিখ্যাত শারিয়াবিদ ডঃ জামাল বাদাওয়ী (http://www.jannah.org/sisters/end/html), বহু ইসলামি বিশেষজ্ঞের দল এমনকি আমাদের প্রচণ্ড শারিয়াপন্থী ইসলামি দৈনিক ইনকিলাব-ও (০৪ জানুয়ারী ২০০৬) – "যদিও পাত্রীপক্ষের অনুরোধে একটা মোহরানা নির্ধারণ করা হয় তবে অধিকাংশ বিবাহ অনুষ্ঠানে মোহরানার একটা অংশ আদায় করা হলেও মোহরানার মোটা অংশ অনাদায়ী থেকে যায়...পাত্রীও জানে তার নির্ধারিত মোহরানা আদৌ কোনদিন তার হস্তগত হবে না, যা নিঃসন্দেহে সুরা নিসা'র ১৯ নং আয়াতের হুকুমের পরিপন্থী, অর্থাৎ হারাম কাজ।" মউদুদি বলেন, এ আয়াত নাকি এসেছে অন্য ব্যাপারে। তখন কেউ মারা গেলে তার বৌদেরকে ভাই-চাচারা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়ে যেতো, তাই এ-আয়াত। কিন্তু মউদুদি দেনমোহর কথাটা এড়িয়ে গেছেন, যা শুধু স্ত্রীর বেলায় খাটে। তাছাড়া, মউদুদির কথা সত্যি হলে যেসব বিধবা অন্যের উত্তরাধিকারে যেতে রাজি তারা কি তা পারবে ? নিশ্চয়ই নয় !

তাহলে ?

আর কতভাবে কতবার কোরাণকে বলতে হবে নারীর অধিকারের কথা ? আর কতবার এই হুকুম লঙ্ঘন করবে তথাকথিত আল্লা'র আইন – বিবাহ-বিচ্ছেদ চাইলে স্ত্রীকে 'খুলা' আইনের নামে স্বামী বা বিচারকের দয়ার ওপরে নির্ভর করতে হবে ? দেখুন ডঃ মুহসিন খানের অনুদিত বুখারী ৭ম খণ্ড হাদিস ১৯৯ ঃ

থাবিত বিন কায়েসের স্ত্রী রসুলের নিকট আসিয়া বলিল, 'হে আল্লাহ'র রসুল ! থাবিত বিন কায়েসের চরিত্র বা দ্বীনদারীর উপর আমার কোন অভিযোগ নাই। কিন্তু আমার ভয় হইতেছে আমি আল্লাহ'র অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিতে পারিব না' (অর্থাৎ স্বামীর প্রতি কর্তব্যে গাফিলতি হতে পারে – হাদিস ২৪৮৩, হাফেজ আবদুল জলিল)। ইহাতে রসুল বলিলেন, 'তুমি কি তাহার বাগানটা ফেরৎ দিতে রাজি ?' সে বলিল, 'হ্যাঁ।' অতএব সে তাহাকে বাগান ফেরৎ দিল এবং রসুল (দঃ) থাবিতকে তালাক দিতে বলিলেন। (এই স্ত্রীর নাম জামিলা – হাদিস নং ২০০)।

দেখলেন ? স্বামী ভালোবাসলেও কিংবা সে দ্বীনদারী ভাল মানুষ হলেও নারী বাধ্য নয় সে সংসার করতে যা তার মন চায় না। নারীকে ইচ্ছের এই প্রাকৃতিক অধিকার দিয়েছে কোরাণ ও রসুল। শুধুমাত্র স্ত্রীর ইচ্ছের ভিত্তিতে নবীজী বিয়ে বাতিল করেছেন এর প্রমাণ আরো আছে যেমন সহি ইবনে মাজাহ ৩য় খণ্ড ১৮৭৪।

এর পরেও শারিয়া আইন "খুল্" বানানো হয়েছে যাতে স্ত্রী তালাক চাইলে কোর্টে মামলা করতে হবে। শারিয়া আইনে আছে শারীরিক অক্ষমতা, বেশি মারপিট, খরচ না দেওয়া ইত্যাদি বিশেষ দু'একটা কারণের স্পষ্ট প্রমাণ থাকলে কাজী নিজে থেকে বিবাহ বাতিল করতে পারেন। ওসব প্রমাণ না থাকলে কোর্ট স্ত্রীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে স্বামীকে দিয়ে স্বামীর অনুমতির চেষ্টা করবে, নতুবা স্ত্রীর ইচ্ছের কোনই দাম নেই শারিয়া আইনে (বি-ই-আ ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৮, ধারা ৩৫৫ ; শাফি'ই আইন #n.5.0, হানাফি আইন হেদায়া পৃষ্ঠা ১১২, শারিয়া দি ইসলামিক ল' – ডঃ আবদুর রহমান ডোই, পৃঃ ১৯২)। বাস্তবে তো আমরা দেখি ওসবের প্রমাণ কত কঠিন। তাছাড়া, কোন বিচারকই তো দেবতা নন। তিনিও অজ্ঞানতার দরুণ, আবেগের কারণে বা ঘুষ খেয়ে নারীর জীবন দোজখ করতে পারেন ঃ দেখে নিন "শারিয়া, অতিতের দলিল" নিবন্ধ।
কোরাণ-রসুলের দেয়া নারীর ইচ্ছে–অনিচ্ছের এই ইসলামি অধিকারটা সেই কবে ডাকাতি হয়ে গেছে ! একদিকে মুখমিষ্টি কথায় আর অন্যদিকে এইসব আইনের নির্মম হিংস্রতায় অসংখ্য মুসলিম নারীর কান্নায় ভরে আছে ইতিহাস। কে তারা, যারা কিছু জাল হাদিসের জোরে এই কোরাণ-বিরোধী অনৈসলামিক আইনে কোটি মুসলিম নারীর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে ? কে তারা, যার প্রতিষ্ঠা করেছে পুরুষ তালাক দেবে আর নারী তালাক নেবে, তা'ও আবার ঠিক তালাক নয়, 'খুলা' নেবে ?

দেখুন শারিয়া আইন ঃ এক বা দু'বার তালাক দেবার পারে "স্বামী তাহার স্ত্রীকে আবার ফিরাইয়া লইতে পারে, **স্ত্রীর সম্মতি থাকুক বা না থাকুক**" – (বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ১ম খণ্ড ধারা ৩৫২)। স্বামী এমন দেবতা কবে থেকে হল ? স্বামীকে এমন দেবত্ব থেকে নামানোই তো রসুলের বিশেষ সংগ্রাম ছিল ! অনিচ্ছার সংসার কোনদিন সুখের হয় ? ইসলামের নামে নারীর পায়ে এমন ইসলাম-বিরোধী শেকল কে পরালো ? নারী কি পুরুষের সম্পত্তি যে তার ইচ্ছে অনিচ্ছের কোন দাম নেই ? শারিয়াপন্থীরা বলেন সংসার বাঁচানোর জন্য এসব ঠিক আছে। আশ্চর্য কুযুক্তি। নারীর সম্মান আর অধিকার জবাই করে যে সংসার টিকিয়ে রাখা হয় সেটা ইসলামি সংসার হয় কি করে ? বৈষম্যের এই শেকড় কিছু শারিয়াপন্থীদের মাথায় এমনই কঠিনভাবে বসে গেছে যে তাঁরা ইসলামের নামে ইসলাম লঙ্ঘনের পদ্ধতি দেখতেই পান না। বছর দুই আগে বিবিসি খবর দিয়েছিল বাংলাদেশের জনৈক মুফতি বলেছেন – "ইসলামী আইন অনুসারে নারী তালাক চাহিলে তাহার স্বামীর নিকট তালাকের ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারে, কিন্তু ইহা নির্ভর করে স্বামী তাহার অনুরোধ রাখিবে কি না তাহার উপর। তালাকের আইন পরিবর্তনের প্রস্তাব সরাসরি কোরাণ-বিরোধী, আমরা ইহা প্রতিরোধ করিব।"

মুফতি ওই হাদিসগুলো দেখে একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারতেন তিনি আসলে প্রতিরোধ করছেন কোরাণ-রসুলকেই। অথচ এই তিনিই নারীকে কোরাণ-রসুলের দেয়া অধিকারের সমর্থন করতে পারতেন। এসবের জবাব তাঁকে খালেকের কাছে দিতে হবে একদিন, যেদিন বড্ড দেরি হয়ে যাবে। এই 'খুলা' আইনে অতীত-বর্তমানে অসংখ্য নারীর জীবন কিভাবে ধ্বংস হয়েছে তার কিছু দলিল দেখে নিন "শারিয়া, অতীতের দলিল" নিবন্ধে। কিছু মুসলিম আছেন যাঁরা ইন্টারনেটের নিবন্ধে খুলা'র বিরুদ্ধে বাঘের মত হুঙ্কারে প্রচণ্ড লেখালেখি করেন কিন্তু শারিয়াপন্থীদের সামনে পড়লেই অতিশয় ভদ্র হয়ে যান।

অনেক ফকিহ্ অতীত-বর্তমানে অনেক কিছুই লিখে গেছেন, সেগুলো আমাদের ওপরে ইসলাম হিসেবে চাপিয়ে দেয়াটা কি ইসলাম ? আমরা কি সেগুলো মানতে বাধ্য ? মোটেই নয়। নিজেদের কথারই চরম বিরোধীতায় শারিয়া-জগৎ ভরে আছে। উদাহরণ দেখুন ঃ http://www.usc.edu/schools/college/crcc/engagement/resources/texts/muslim/hadith/abuddawud/025.sat.html

Book 25, Number 3639:
Narrated Abdullah ibn Amr ibn al- As
I used to write everything which I heard from the Apostle of Allah (Peace_be-upon_Him). I intended (by it) to memorise it. The Quraysh

prohibited me saying: Do you write everything that you hear from him while the Apostle of Allah (Peace_be-upon_Him) is a human being: he speaks in anger and pleasure? So I stopped writing, and mentioned it to the Apostle of Allah (Peace_be-upon_Him). He signalled with his finger to his mouth and said: Write, by Him in Whose hand my soul lies, only right comes out from it.

Book 25, Number 3640:
Al-Muttalib ibn Abdullah ibn Hantab said: Zayd ibn Thabit entered upon Mu'awiyah and asked him about a tradition. He ordered a man to write it. Zayd said: The Apostle of Allah (Peace_be-upon_Him) ordered us not to write any of his traditions. So he erased it.

অর্থাৎ প্রথমটায় আমরা পাচ্ছি নবীজী আদেশ দিলেন তাঁর সুন্নত লিখে রাখতে, ঠিক পরেরটাতেই পাচ্ছি "কোনো সুন্নত না লিখতে।" তার মানেই হলো তাঁকে নিয়ে ভয়ানক ষড়যন্ত্র হয়েছে। যার যেখানে স্বার্থ সে সেটা মানছে এবং অন্যদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। অনেকে বলেন কোন্‌টা ঠিক আর কোন্‌টা জাল তা এই চোদ্দশো বছর পরে ঠিক করা অসম্ভব। আমি বলি, তাঁর ব্যাপারে জানা সম্ভব শুধু যদি আমরা বুঝতে পারি কোন্ কথাটা নবী-রসুলের পক্ষে বলা সম্ভব আর কোন্‌টা নয়। যেটাতে মানাধিকার রক্ষা হয় সেটাই তাঁর নির্দেশ, সেটাই সত্যিকারের "সহি" অর্থাৎ "সত্য" হাদিস। তা না হলেই সেটা জাল। আরো দেখুন ঃ মহানবী (সাঃ) বলেন – "যে ব্যক্তি হদ্দ-বহির্ভূত অপরাধে হদ্দের সমান শাস্তি দিল সে সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।" এরপরেই বলা হল "অবশ্য সার্বিক কল্যাণের দিক বিবেচনা করিয়া আইন প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ হদ্দের পরিমাণের অধিক শাস্তিও দিতে পারেন।" তাহলে সীমালঙ্ঘনকারীদের কি হবে ? এটা তো তাঁদেরই 'সুন্নত পালন'-এর খেলাফ হল, তাই না ? আর, সুরা তালাকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হচ্ছে তালাকের সময় দুইজন সাক্ষী রাখবে। কিন্তু এর পরেই বলা হচ্ছে ঃ "কিন্তু ফকিহ্‌গণের মতে তালাকদানের ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখা বাধ্যতামূলক নহে, মুস্তাহাব (উত্তম)" – বি-আ-ই ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ৪৭৯ ও ২৩২। এটা তো একেবারে সরাসরি কোরাণ লঙ্ঘন হল। এভাবে কোরাণ-রসুলে লঙ্ঘন করে কি সর্বনাশ এনেছেন তাঁরা আমরা তো মুসলিম-বিশ্বে দেখতেই পাচ্ছি।

আসলে তাঁরা একটা ইহুদী আইনকে আল্লার আইন হিসেবে চালিয়ে দিয়েছেন। এই 'খুলা' শারিয়া আইনটা এসেছে ইহুদী আইন থেকে, একে বলে "গেট"। শারিয়া আইনের মতই ওদের এ-আইনে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে কিন্তু স্ত্রী তালাক চাইলে বছরের পর বছর গীর্জায় ছুটোছুটি করতে হয়, অজস্র টাকা ঢালতে হয়, অফিস থেকে বিনা বেতনের ছুটি নিতে হয় বা চাকরি ছাড়তে হয়, স্বামীকে টাকা দিতে হয়, এমনকি বাচ্চাদেরও ভরণপোষণের টাকা ত্যাগ করতে হয়। কারণ আমাদের শারিয়া আইনের মতই ওদেরও ধর্মীয় তালাক না হলে সে স্ত্রী আবার বিয়ে করতে পারে না (স্বামী কিন্তু পারে, শারিয়া আইনের মতই)। কাজেই স্ত্রীর চেষ্টা, যাতে রাবাই সাহেব (আমাদের মওলানা বা হিন্দুদের পুরুত ঠাকুরের মত ওদের হল রাবাই) কোনমতে স্বামীর কাছ থেকে তালাকটা কিনে নিতে পারেন। স্ত্রী যতক্ষণ দেনমোহর এবং নিজের ও বাচ্চাদের কাস্টডি বা ভরণপোষণ ত্যাগ না করছে ততক্ষণ স্বামী তালাকের অনুমতি দেবে না, স্ত্রীও আবার বিয়ে করতে পারবে না, এবং ততদিনই বেচারা স্ত্রীকে ঐ অত্যাচারী স্বামীর সাথেই এক বাসায় থাকতে হবে। কখনো স্বামী এর বাইরেও কিছু উপরি কামাইয়ের ধান্ধায় আরো টাকা চেয়ে বসে, এর বাস্তব উদাহরণও আমাদের কাছে আছে। বুঝতেই পারছেন, টাকার অভাব, কোর্টে যাওয়া-আসা, কোর্ট ও উকিলের খরচ, রান্নাবান্না, বাচ্চাদের দেখাশোনা, পরিবার-সমাজের কটাক্ষ-কটূক্তি ইত্যাদি মিলিয়ে এমন ভয়ানক অবস্থার সৃষ্টি হয় যে বেচারা অসহায় স্ত্রী মুখ বুজে অত্যাচার সহ্য করে, কোর্টে যায় না। অথচ কোরাণ-রসুল তাকে কি সুন্দর অধিকার দিয়েছিল ইচ্ছেমত সুখের সংসার করার, উকিল কোর্ট-কাচারি স্বামী বা অন্য কারো দয়ার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার নয়। এ দুঃখ রাখবেন কোথায়, সেটা অন্য প্রশ্ন। আপাতত ঐ কোরাণ-রসুল বিরোধী শারিয়া আইনটা বাতিল ক'রে নারী-পুরুষের সমান বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকারের ইসলামি আইন প্রয়োগ করা জরুরি ॥

শারিয়া আইনের উদাহরণ

মনে করুন বাজারে মাথাব্যথার একটা ওষুধ আছে যা বানাতে হাজারো বৈজ্ঞানিকের লক্ষ পৃষ্ঠার সুবিশাল গবেষণা লেগেছে। কিন্তু ওটা খেলে মাথাব্যথা তো সারেই না, বরং পেট খারাপ হয়ে যায়। এমন ওষুধকে কি করে মানুষ ? নীচে দেখুন কিছু শারিয়া আইনও হুবহু তাই। অথচ শিশুকাল থেকে 'আল্লার আইন' লেবেল দেখতে দেখতে বড় হবার ফলে ওই অন্যায় অত্যাচার অনেকের চোখে পড়ে না। ক্ষমতার ষড়যন্ত্র আর পুরুষতন্ত্র কিছু মুসলমানের বুঝবার ক্ষমতাকে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে অবশ করে দিয়েছে। কিন্তু এত স্পষ্ট অন্যায় আইন বুঝতে আমাদের কোরাণ-হাদিস পড়তে হবে কেন ? আমাদের বিবেক নেই ? বুদ্ধি নেই ?

প্রথমেই প্রাচীন ভারতের কিছু প্রাচীন আইন দেখা যাক। পুরুষতন্ত্রের সর্বগ্রাসী লালসার পাশাপাশি নারী-নিয়ন্ত্রণের আরেকটা প্রধান কারণ হল ঃ "Mother's Baby, Father's May be" অর্থাৎ নিজের বাচ্চাদের পিতৃত্ব নিশ্চিত করা। আমি এ আইনগুলো দেখাচ্ছি শারিয়ার সাথে তুলনা করার জন্য নয়, বরং এটা দেখাতে, আমাদের অনেকে যেমন শারিয়াকে আল্লাহ'র আইন মনে করেন সেরকম ওরাও ওই আইনগুলোকে 'ভগবানের আইন' বলে বিশ্বাস করত। বিখ্যাত চিত্র-পরিচালক দীপা মেহ্তা তাঁর সাম্প্রতিক ছবি 'ওয়াটার'-এ দেখিয়েছেন ভারতে এখনও প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ বিধবা নিজের ইচ্ছায় পশুর চেয়েও অধম জীবনযাপন করে দু'হাজার বছর আগে বানানো মনু'র আইনকে 'ভগবানের আইন' মনে করে। অথচ মনু একজন মানুষই ছিল। শুধু তাই নয়, কেউ এসব আইন সংস্কার করতে বললে তারাও শারিয়াপন্থীদের মতই তেড়ে মারতে আসে। দেখুন, ধর্মের নামে এ-সব আইনেও নারীর প্রতি পুরুষের একই বিষাক্ত মনোভাব কাজ করছে।

- বিধবাকে মৃত স্বামীর সাথে পুড়িয়ে মারার আইন ঃ "জীবিত নারীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মৃতের বধূ হতে...এই নারী পতিলোকে যাচ্ছে, এ-প্রাচীন রীতি অনুসরণ করছে" (অথর্ববেদ ১৮/৩/৩)।
- "পিতামাতার জন্য কন্যা অভিশাপ" (ঐত্তরীয় ব্রাহ্মণ ৬/৩/১৩)।
- "লাঠি দিয়ে স্ত্রীকে মেরে দুর্বল করা উচিত যাতে শরীরের ওপরে তার কোন অধিকার না থাকে" (শতপথ ব্রাহ্মণ ৪/৪/২/১৩)।
- সর্বগুণান্বিতা নারীও অধমতম পুরুষের চেয়ে অধম" (তৈত্তরীয় সংহিতা ৬/৫/৮/২)।
- গৃহকর্মে ও দায়িত্বে স্ত্রীর অসামান্য অবদানের পরেও 'ভার্য্যা' (স্ত্রী) ও 'ভৃত্য' শব্দ দু'টোর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ একই – যাকে 'ভরণ' অর্থাৎ ভরণপোষণ করতে হয় দু'টোরই উৎস 'ভৃ' ধাতু)।
- "পুত্র-কন্যার সামনে স্বামী উপপত্নী আনা বা বেশ্যাগমন করতে পারবে কিন্তু স্ত্রীর সামান্য পদস্খলনে সমাজ কঠোর দণ্ড দেবে" (মৈত্রায়নী-র বিভিন্ন আইন ও তৈত্তিরীয় সংহিতা ৬/৫/৮/২)।
- "কালো পাখি, শকুন, নেউল, ছুঁচো, কুকুর ও নারী হত্যার প্রায়শ্চিত্ত একই" (আপস্তম্ভ ধর্মসূত্র ১/৯/২৩/৪৫)।
- "নারীকে অবরুদ্ধ রাখো, নাহলে তার শক্তিক্ষয় হবে" (শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪/১/১/৩১)।
- একটি যজ্ঞে "সদ্যোজাত পুত্রকে ওপরে তুলে ধরা হয়, কন্যাকে মাটিতে শুইয়ে রাখা হয়" (তৈত্তরীয় সংহিতা ৬/৫/১০/৩)।
- "উত্তম নারী হল 'যে স্বামীকে সন্তুষ্ট করে, পুত্র-সন্তানের জন্ম দেয় ও স্বামীর কথার ওপরে কথা বলে না'" (ঐত্তরীয় ব্রাহ্মণ ৩/২৪/২৭)।
- "সন্তান না জন্মালে ১০ বছর পর ও পুত্র না জন্মালে ১২ বছর পর স্ত্রীকে ত্যাগ করা যাবে" (আপস্তম্ভ ধর্মসূত্র ১/১০-৫১-৫৩)।
- "যার স্ত্রীর চেয়ে পশুর সংখ্যা বেশি সে সৌভাগ্যবান" (শতপথ ব্রাহ্মণ ২/৩/২/৮)।

ইত্যাদি শত শত। (সূত্র ঃ প্রাচীন ভারত – সমাজ ও সাহিত্য – ডঃ সুকুমারী ভট্টচার্য্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক – কম্পেয়ারেটিভ লিটারেচার অ্যাণ্ড কালচার)। একই রকম প্রচণ্ড নারী-বিরোধীতা ছিল স্রষ্টার নামে বানানো ইহুদী – খ্রীষ্টান আইনেও, তার কিছুটা ধরা আছে বাইবেলের ডিউটেরনমি অধ্যায়ে।

যে শারিয়ার জন্য এত হৈ হৈ, যার পেছনে এত প্রতিষ্ঠান এত কর্মী এত অর্থ, যার জন্য বাংলাদেশে শারিয়া-জঙ্গীরা বোমাবাজি করে এত নিরীহ মানুষ খুন করল, এত বিধবা হল, এত এতিম হল সেই শারিয়া আইনগুলো আসলে কি তা কেউ দেখান না। কিন্তু আইনগুলো যদি জাতি না-ই জানে তবে এর ওপরে সিদ্ধান্ত নেবে কি করে ? তাই এবারে চলুন তাহলে ইসলামের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য কিছু শারিয়া কেতাব থেকে কিছু শারিয়া-আইন দেখি। কাউকে কিছুই বলতে হবে না, আইনগুলো নিজেরাই আমাদের বলে দেবে আসলেই তারা কি। তাই খুব সতর্কভাবে কটা জিনিস খেয়াল রাখবেন।

(১) কোরাণ-হাদিসে মানবাধিকার ও নারী-অধিকারের ওপরে অত্যন্ত সুন্দর বহু উপদেশ আছে কেউ সে উপদেশ না মানলে আদালতে শাস্তি হয় না। কিন্তু নারী-বিরোধী আইন না মানলে শাস্তি হয়। আপনারা জানেন স্বার্থের সজ্ঞাতে আইনের কাছে উপদেশ পরাজিত হতে বাধ্য। কাজেই শারিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে নারীর মৃত্যুফাঁদ।

(২) যেগুলোতে আইন নম্বর দেয়া আছে সেগুলো প্রয়োগের জন্য তৈরি। নাহলে নম্বর দেয়া থাকত না। কিছু আইনের ব্যাখ্যায় বলা আছে – "এ আইন পরিবর্তনের সুযোগ আছে।" কিন্তু চোদ্দশ' বছরে পরিবর্তন না হয়ে আইনগুলো প্রয়োগ

হয়েই চলেছে অনেক দেশে। পরিকল্পনা করেই এটা করা হয়, ভুল করে নয়।

(৩) আইনগুলোর বহু জায়গায় বলা আছে – 'যাহা স্থির করা হইয়াছে' কিংবা 'যে অধিকার দেয়া হইয়াছে' কিংবা 'যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে' ইত্যাদি। সিদ্ধান্তটা কে নিল, অধিকারটা কে দিল বা স্থিরটা কে করল তা খেয়াল করলেই দেখা যাবে এগুলো করেছেন কিছু মানুষ। তাঁরা দিব্যজ্ঞানী নবী-রসুল তো নন। কাজেই তাঁদের কথা মানা বা না-মানা সম্পূর্ণ আমাদের বিশেষজ্ঞদের অধিকার।

(৪) কিন্তু শারিয়া আইনে বলা হয়েছে অতিতের ঐ-সব সিদ্ধান্ত কেউ না মানলে সে মুরতাদ, অর্থাৎ তার মৃত্যুদণ্ড হবে। এভাবে নিজেদের বর্তমান বিশেষজ্ঞদেরকে ব্ল্যাকমেল করে পঙ্গু করে বিশ্ব-মুসলিম আজ কোথায় পৌছেছে তা সবাই জানেন।

নীচের উদাহরণগুলো প্রায় সবই আমাদের কাছে আছে, কেউ কোন পৃষ্ঠার ফটোকপি দেখতে চাইলে ফ্যাক্স নম্বর পাঠিয়ে দেবেন, আমরা ফ্যাক্স করে পৃষ্ঠাটা দুনিয়ার যে কোনো জায়গায় পাঠিয়ে দেব। এ-বইয়ে বি-ই-আ হল বাংলাদেশ ইসলামি ফাউণ্ডেশন কর্তৃক বাংলায় প্রকাশিত বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন। আর 'বাংলা কোরাণ' বলতে বুঝানো হয়েছে মওলানা মুহিউদ্দিনের করা কোরাণের বাংলা অনুবাদ। ওটা আসলে ভারতের দেওবন্দী মুফতি শফি'র করা কোরাণের রাজনৈতিক অনুবাদ। ওটা সৌদি বাদশার সিংহাসন রক্ষা করে বলে সৌদি "কোরাণ প্রিন্টিং প্রেস" থেকে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ ক'রে বিশ্বময় বিনামূল্যে কোটি কোটি কপি ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। বইটার ২য় পৃষ্ঠায় স্পষ্ট লেখা আছে ঃ "পবিত্র কোরাণের এ তরজমা খাদেমুল হারমাইনিশ্-শরীফাইন বাদশাহ্ ফাহদ ইবনে আবদুল আজীজের পক্ষ থেকে ওয়াক্ফ্ লিল্লাহ হাদিয়া স্বরূপ প্রদত্ত, বিক্রয় নিষিদ্ধ।" কিন্তু বাজারে ওটা মুফত তো পাওয়া যাবেই না, হাজার হাজার কপি বিক্রি হচ্ছে। এই হলো শারিয়াপন্থীদের চরিত্র। বলে দেয়া দরকার, সূত্র বিশেষে কিছু আইনের পার্থক্য দেখা যায়।

বি-ই-আ ১ম খণ্ড ও অন্যান্য সূত্র থেকে ঃ

- খাবার, বাসস্থান ও পোশাক দিতে স্বামী বাধ্য থাকবে শুধুমাত্র বাধ্য স্ত্রীকে, অবাধ্য স্ত্রীকে নয়। এর বাইরের সব খরচ এমনকি ডাক্তারের, ওষুধের বা সৌন্দর্য্য-চর্চার খরচ ইত্যাদি হবে স্বামীর করুণা ও দয়া। (বলাই বাহুল্য, স্ত্রী অবাধ্য কি না সেটা ঠিক করবে স্বামী নিজেই)। হানাফি আইন পৃঃ ১৪০ ; শাফি'ই আইন পৃঃ ৫৪৪ – Law #m.11.4 ; মুহিউদ্দীন খানের অনুদিত বাংলা কোরাণ পৃঃ ৮৬৭ – তফসীর ঃ "স্ত্রীর যে প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করা স্বামীর যিম্মায় ওয়াজিব (বাধ্য), তা চারটি বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ – আহার, পানীয়, বস্ত্র ও বাসস্থান। স্বামী এর বেশি কিছু স্ত্রীকে দিলে অথবা ব্যয় করলে তা হবে অনুগ্রহ, অপরিহার্য নয়।"
- "(স্বামীর) বৌ-তালাকে সাক্ষ্য শর্ত নহে" (বি-ই-আ ১ম খণ্ড, ধারা ৩৪৪)। এবারে খুলুন কোরাণ, সুরা ত্বালাক, আয়াত ২ – "তোমরা যখন স্ত্রীদিগকে তালাক দিতে চাও তখন দুইজন সাক্ষী রাখিবে।"
- শারিয়ায় চুরি, ডাকাতি, পরকীয়া, মদ্যপান, রাষ্ট্রদ্রোহিতা ইত্যাদির শাস্তি হল হাত-পা কাটা, জনসমক্ষে চাবুকের আঘাত, জনসমক্ষে পাথর মেরে মৃত্যুদণ্ড, ইত্যাদি। কিন্তু ওই শারিয়া আইনেই আছে "রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে হুদুদ মামলা করা যাবে না" (বি-ই-আ ৩য় খণ্ড নং ৯১৪গ এবং হানাফি আইন পৃঃ ১৮৮)।
- বি-ই-আ ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩০১ ঃ "যদি রাষ্ট্রপ্রধান বা তাঁর প্রতিনিধি কাউকে বাধ্য করে কোন নারীকে ধর্ষণ করতে, তবে ধর্ষণকারী শাস্তি পাবে না।"এ-আইনে "রাষ্ট্রপ্রধান বা তাঁর প্রতিনিধি"র কোন শাস্তির উল্লেখ নেই। কেউ বলতে পারেন, অন্যত্র শাস্তির কথা আছে। কিন্তু এখানেও সেটা নেই বলে কোন বাকপটু দুর্ধর্ষ উকিল তার অপরাধী মক্কেলকে খালাস করে নেবেই, কেউ ঠেকাতে পারবে না।
- বি-ই-আ ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩১১, ধারা ১৪৯ ঃ "বোবা'র সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।" কিন্তু বোবা'র তো চোখ আছে, সে তো দেখতে পারে। তার সাক্ষ্য ছাড়া চোর-ডাকাত-খুনীরা পার পেয়ে যাবেই কখনো কখনো। এটা আল্লাহ'র আইন হতে পারে না।
- দাস-দাসী, গায়িকা এবং সমাজের নীচু ব্যক্তির (উদ্ধৃতি ঃ রাস্তা পরিষ্কারকারী বা শৌচাগারের প্রহরী, ইত্যাদি) সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। হানাফি আইন পৃঃ ৩৬১ ; শাফি'ই আইন পৃঃ ৬৩৬ – Law #o.24.3.3 ; পেনাল ল' অব্ ইসলাম পৃঃ ৪৬ ; বিধিবদ্ধ ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৩)। কিন্তু ওদেরও তো চোখ-কান-বিবেক আছে। ওরা তো চুরি-ডাকাতি দেখতে পারে ঠিক আমার-আপনার মতই। ওদের সাক্ষ্য ছাড়া চোর-ডাকাত-খুনীরা পার পেয়ে যাবেই কখনো কখনো। এটা আল্লাহ'র আইন হতে পারে না। তাছাড়া, আইনটায় গায়কের কোন কথা নেই, এটাও তো অন্যায় হয়ে গেল।
- হুদুদ মামলায়, বিশেষত ব্যভিচারে ও খুনের মামলায়, নারী-সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। (হানাফি আইন পৃঃ ৩৫৩ ; শাফি'ই আইন পৃঃ ৬৩৮ – Law #o.24.9। ক্রিমিন্যাল ল' ইন্ ইসলাম অ্যাণ্ড দ্য মুসলিম ওয়ার্লড পৃঃ ২৫১। মুহিউদ্দীন খানের অনুদিত বাংলা কোরাণ পৃঃ ২৩৯। পেনাল ল' অব্ ইসলাম পৃঃ ৪৪ ; বিধিবদ্ধ ১ম খণ্ড, ধারা ১৩৩ ও ২য় খণ্ড, ধারা ৫৭৬)।
- নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নহে, তাহাদের (১) স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা, (২) পরিচালন-ক্ষমতার দুর্বলতা ও (৩) বুঝিবার অক্ষমতার জন্য। (পেনাল ল' অব্ ইসলাম পৃঃ ৪৫)।
- স্বামীর তরফ থেকে দেন-মোহর হতে পারে কোরাণ থেকে কিছু তেলাওয়াত বা লোহার আংটি বা একজোড়া জুতো। (শারিয়া দি ইসলামিক ল' পৃঃ ১৬৩, ১৬৪ ; বিধিবদ্ধ ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৯৭৬ ; সহি হাদিস তিরমিজি, হাদিস নং ৯৫১)।
- বাবা-মা, দাদা-দাদি, বা নানা-নানিকে খুন করলে খুনীর মৃত্যুদণ্ড হবে। কিন্তু বাবা-

মা, দাদা-দাদি বা নানা-নানি যদি ছেলে-মেয়ে বা নাতি-নাতনিকে খুন করে তবে খুনীর মৃত্যুদণ্ড হবে না। (বি-ই-আ ১ম খণ্ড, ধারা ৬৫ ক ও খ; শাফি'ই আইন পৃঃ ৫৮৪ – Law #o.1.2.4 এবং সহি তিরমিজি হাদিস ৯৯৪ ও ৯৯৫)।

- বি-ই-আ ১ম খণ্ড পৃঃ ৭৯, ধারা ১৫৬ ও ১৫৭ ঃ আত্মীয়ের বাসা থেকে চুরি করলে বা মেজবানের বাসা থেকে মেহমান চুরি করলে তার হুদুদ শাস্তি হবে না।
- তওবা করলে গণহত্যাকারীর শাস্তি হবে না। (বিধিবদ্ধ ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১৮, ধারা ১৩)।
- বি-ই-আ ১ম খণ্ড পৃঃ ১৯৫, ধারা ৫১৪ ঃ মুতওয়াল্লী যদি ওয়াক্ফ্ সম্পত্তি হজম করে ফেলে তবে তার কাছ থেকে এ-সম্পত্তি আদায় করতে হবে, কোন শাস্তির উল্লেখ নেই।
- স্ত্রী যদি বলে তার মাসিক হয়েছে আর স্বামী যদি তা বিশ্বাস না করে, তাহলে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা স্বামীর জন্য আইনতঃ সিদ্ধ (শাফি'ই আইন নং ই-১৩-৫)।
- "কোনো কারণে ধর্ষকের শাস্তি মওকুফ হইলে ধর্ষক ধর্ষিতাকে মোহরের সমান টাকা দিবে" (বি-ই-আ ১ম খণ্ড পৃঃ ৩০১ ; শাফি'ই আইন #m.8.10)। যেহেতু এখানে অন্য কোনো শাস্তির উল্লেখ নেই তাই ধর্ষক-পক্ষের চালাক বাকপটু উকিল ধর্ষককে টাকা দিয়ে খালাস করে নিতে পারবে। ধর্ষিতার শাস্তির বহু দলিল আমাদের কাছে আছে। ইসলামের নামে এই নির্মম নিষ্ঠুরতার ব্যাপারে কোন ইসলামি দল কোনদিন টুঁ শব্দটি উচ্চারণ করেননি।
- মুসলিম পুরুষের রক্তমূল্য অপেক্ষা, (১) মুসলিম নারীর রক্তমূল্য অর্ধেক, (২) ইহুদী-খ্রীষ্টানের রক্তমূল্য তিনভাগের একভাগ, ও (৩) অগ্নি-উপাসকের (সম্ভবতঃ হিন্দুদেরও – *লেখক*) রক্তমূল্য পনেরো ভাগের একভাগ। (শাফি'ই আইন পৃঃ ৫৯০, Law #o.4.9)।
- রক্তমূল্যের দাবি বা খুনীকে মাফ করতে শুধু নিহতের পুত্ররাই পারে, কন্যারা নয়। (শারিয়া দি ইসলামিক ল', ডঃ আবদুর রহমান ডোই, পৃঃ ২৩৫)।
- বিবাহিতা যুদ্ধ-বন্দিনীদের বিয়ে তৎক্ষণাৎ বাতিল হয়ে যাবে (শাফি'ই আইন #o.9.13)। এ-আইনের উদ্দেশ্য অতি পরিষ্কার। সেটা হল যুদ্ধ-বন্দিনীদের ধর্ষণ। সেটাকে সহি হাদিসে বৈধ করা হয়েছে (সহি বুখারি ৫ম খণ্ড হাদিস নং ৬৩৭, ও ৭ম খণ্ড হাদিস নং ১৩৭)। এমনকি কেউ কেউ বন্দিনীদেরকে তাদের বন্দী স্বামীদের সামনেই ধর্ষণ করত এবং "কেহ কেহ তাহা পছন্দ করিত না" – সহি আবু দাউদ হাদিস নং ২১০৫। স্পষ্টই বোঝা যায় নবীজীর অনেক পরে এ-সব ভয়ঙ্কর হাদিস বানানো হয়েছে বন্দিনী-ধর্ষণ হালাল করার জন্য। আমাদের 'আহলে হাদিস' ইত্যাদি সংগঠনগুলোর উচিত অনতিবিলম্বে এ-সব হাদিস বাতিল করা। এ-সব হাদিসের ভিত্তিতেই আমাদের ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে শর্ষিণার পীর ঘোষণা করেছিল পাকিস্তানী হানাদার সৈন্যদের জন্য বাঙালী হিন্দু-নারী ধর্ষণ করা বৈধ। এটা সবাই জানে, দৈনিক পূর্বদেশ-এও ছাপা হয়েছিল একাত্তরের ১৯শে ডিসেম্বর তারিখে। অনেকে তাকে দোষ দিয়েছিলেন কিন্তু সে তো শুধু শারিয়া আইনের কথাই বলেছিল।
- বি-ই-আ ১ম খণ্ড পৃঃ ২১০, ধারা ২ – রোজার সময় কেউ কিছু খেলে, এমনকি গোপনে খেলেও, তার শাস্তি হবে। ১১ই নভেম্বর ২০০৫ বৃহস্পতিবারে ইরাণের সানান্দাদজ শহরের এক ১৪ বছরের বাচ্চা ছেলে রোজা রেখেছিল। বেচারা সামলাতে পারেনি, দুপুরে কিছু খেয়ে রোজা ভেঙে ফেলেছিল। শারিয়া আদালত তাকে ৮৫ চাবুক মেরে মেরেই ফেলেছে। অনিন্দ্যসুন্দর ফুলের মত সদ্য ফুটেছিল যে, যার সামনে ছিল বিস্তীর্ণ জীবন, সে মাটির নীচে পোকামাকড়ের খাদ্য হয়েছে। এ-রকম শত শত ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে ইরানের শারিয়া রাষ্ট্রে।

ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট-অন্-লাইন নভেম্বর ১৪, ২০০৬-এর খবরে প্রকাশ ঃ সোমালিয়ার নূতন শারিয়া সরকার সিগারেট পান করার 'অপরাধে' ২২ জনকে জনসমক্ষে (আমাদের গুলিস্তানের স্টেডিয়ামের মত জায়গায়) বেত্রাঘাত করেছে। আমার সোমালি বন্ধু জানিয়েছে, এর মধ্যে অনেক সম্মানিত মানুষ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপকও ছিলেন। এর আগে এই শারিয়া-সরকার টেলিভেশনে বিশ্ব-ফুটবল খেলা প্রচার বন্ধ করে দেয় ও প্রতিবাদকারী তরুণদের মধ্যে একজনকে গুলি করে হত্যা করে।

- বি-ই-আ ১ম খণ্ড পৃঃ ১৩৬, ধারা ২৬৬ গ ও ২৭২ – বিয়ের সাক্ষী হতে হবে ২জন পুরুষ বা ১জন পুরুষ ও ২জন নারী, নাহলে বিয়ে অবৈধ হবে।
- মদ্যপানের সাক্ষী হতে হবে শুধুমাত্র দু'জন পুরুষ মুসলমানের চাক্ষুষ সাক্ষ্য। মেয়েদের বা পুরুষ-মেয়েদের মিলিত সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় (বি-ই-আ ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৩৩, ধারা ১৭৪)।
- স্বামী তার স্ত্রীকে যখন ইচ্ছে তখনই তাৎক্ষণিকভাবে পুরো তালাক দিতে পারবে। কোনো কোনো কেতাবে আছে অত্যাচারের চাপে, নেশার ঘোরে বা হাসি-ঠাট্টাতে 'তালাক' উচ্চারণ করলেও পুরো তালাক হয়ে যাবে (হানাফি আইন ৮১ ও ৫২৩ ; শাফি'ই আইন পৃঃ ৫৬০, Law #n.3.5 ; বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ১ম খণ্ড পৃঃ ১৫৭ ধারা ৩৫১, পৃঃ ১৫৬ ধারা ৩৪৭, পৃঃ ১৫৭ ধারা ৩৪৯ ; পৃথিবীর বৃহত্তম ইন্টারনেট সংগঠন ইউরোপিয়ান ফতোয়া কাউন্সিল, ইউনাইটেড মুসলিম্স্ ক্যানাডা সংগঠনের রায় ; ওয়েবসাইট www.sunnipath.com ইত্যাদি ; দ্বীন কি বাঁতে – মওলানা আশরাফ থানভি, পৃঃ ২৫৪, আইন নং ১৫৩৭, ১৫৩৮, ১৫৪৬ ও ২৫৫৫)। এ-নিয়ে অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে। এটা অন্যায় আইন। চাপের মুখে তালাকের আইনটাও সুরা নাহ্ল্ আয়াত ১০৬-এর মর্মবাণীকে লঙ্ঘন করে। এ-আয়াত অনুযায়ী তালাক তো দূরের কথা, কেউ কাউকে ইসলাম ত্যাগে বাধ্য করলেও সেটা নাকচ হবে যদি মনে

মনে নিয়ত ঠিক থাকে।

- "যে কোন কর্মের বাস্তব সজ্ঘটনই উহাকে অপরাধকর্মে পরিণত করে। বাস্তবে সজ্ঘটিত না হওয়া পর্যন্ত কোন কর্মের জন্য কাহাকেও দায়ী করা যায় না।" এর সাথে যোগ করুন ৩য় খণ্ডের ধারা ১২৮২ – "কোন ব্যক্তির অপরাধ প্রকাশ্য আদালতে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাহাকে গ্রেপ্তার বা আটকের মাধ্যমে তাহার ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা যাইবে না।" এ ভয়াবহ আইনগুলো চালু হলে অপরাধীরা উৎসাহিত হবার সম্ভাবনা – সমাজে মারাত্মক খারাপ প্রভাব পড়বে। কারণ অনেক সময়ই নিজস্ব গুপ্তচরের সাহায্যে পুলিশ চুরি-ডাকাতি থেকে শুরু করো বোমাবাজী-খুন-গণহত্যা এমনকি প্লেন-হাইজ্যাকের পরিকল্পনা আগে থেকেই জেনে ফেলে ও অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে। এতে জনগণের জানমালের সুরক্ষা হয়, এবং অপরাধীরা ভয় পায়। এ-আইন হলে অপরাধীদের পোয়াবারো।

বি-ই-আ ২য় খণ্ড ও অন্যান্য সূত্র থেকে ঃ

- পৃঃ ২১৭, ধারা ৫৫৪ ঃ হুদুদ মামলায় নারী-বিচারক অবৈধ।
- পৃঃ ২৬৪, ধারা ৫৭৫ খ ঃ হুদুদ মামলায় সাক্ষ্য গোপন করা যেতে পারে। এ-আইন কোরাণের সম্পূর্ণ খেলাফ কারণ কোরাণ বলছে "তোমরা সাক্ষ্য গোপন কর না" (বাকারা ২৮৩), "কেন তোমরা ... সত্য গোপন করছ" – ইত্যাদি, অনেক আয়াত।
- বিবাহ-বিচ্ছেদের পরে বাচ্চাদের অভিভাবকত্ব মা পাবে ছেলের ৭ ও মেয়ের ৯ বছর বয়স পর্যন্ত (এ-বয়স পর্যন্তই হাড়ভাঙা পরিশ্রমে বাচ্চাদের যত্ন নিতে হয়)। এর পরে তারা বাবার কাছে চলে যাবে। কিন্তু মা যদি নামাজ না পড়ে এবং মাহরাম পুরুষের বাইরে কাউকে বিয়ে করে তবে বাচ্চারা বাবার কাছে চলে যাবে। স্বামীর নামাজ বা বিয়ে এ-ক্ষেত্রে ধর্তব্য নয় (হানাফি আইন ১৩৮ – ১৩৯ পৃঃ; শাফি'ই আইন পৃঃ ৫৫০, Law #m.13.0 ; বি-ই-আ ১ম খণ্ড, ধারা ৩৯৮)।
- তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী বাচ্চাদের পিতার অনুমতি ছাড়া বাচ্চাদের কোথাও নিয়ে যেতে পারবে না (বি-ই-আ ১ম খণ্ড, ধারা ৪০৫ ; এবং ইরাণী শারিয়া)। এ-এক মারাত্মক আইন। এ-আইন তালাকের পরেও স্ত্রীর পায়ে লোহার শেকল পরিয়ে রাখে। বিশেষ করে যে-সব স্ত্রী বিদেশে ইমিগ্রেশন পেয়েছেন তাঁরা স্বামীর ইচ্ছের সামনে অসহায় হয়ে পড়েন। ক্যানাডায় শত শত ইরাণী ইমিগ্র্যান্ট মায়েদের দুর্দশা দেখলে এ-আইনের নৃশংসতা বোঝা যায়।
- বিয়েতে মেয়েরা অভিভাবক হতে পারবে না (হানাফি আইন ১৩৮ – ১৩৯ পৃঃ ; শাফি'ই আইন Law #m.3.4.1 – p 518)।
- তাৎক্ষণিক তালাকের পর মুহূর্ত থেকে স্ত্রী খাবার বাসস্থান কিছুই পাবে না। সাধারণ তালাকের পর স্ত্রী মাত্র তিন মাসের জন্য খোরপোষ পাবে। তারপর তারা কোথায় যাবে কি খাবে তার উল্লেখ নেই (হানাফি আইন পৃঃ ১৪৫ ; শাফি'ই আইন Law #m.11.10, 1 and 3 – p 546)।
- "কোনো অমুসলমানকে খুন করার অপরাধে কোন মুসলমানের মৃত্যুদণ্ড হবে না" (পেনাল ল' অফ ইসলাম পৃঃ ১৪৯)।

বি-ই-আ ১ম খণ্ড থেকে ঃ

- শারিয়া অনাথ শিশুকে দত্তক নেবার প্রথা অনুমোদন করে না (সব শারিয়া বই ; শারিয়া দি ইসলামিক ল' – ডঃ আবদুর রাহমান ডোই, পৃঃ ৪৬৩)।
- হুদুদ মামলায় পারিপার্শ্বিক প্রমাণ চলিবে না – (চাক্ষুষ সাক্ষী থাকতে হবে) (বি-ই-আ ২য় খণ্ড ধারা ৬০০)। এতে মুশকিল হল, চুরি-ডাকাতি-খুনের চাক্ষুষ প্রমাণ প্রায়ই পাওয়া যায় না, পারিপার্শ্বিক প্রমাণেই অপরাধীর শাস্তি হয়। এ-আইন হলে বহু অপরাধীরই শাস্তি হবে না।
- শর্ত-সাপেক্ষে অবাধ্য স্ত্রীকে পেটানো অনুমোদিত (সব শারিয়া কেতাব ; শাফি'ই আইন m.10.12, o.17.4 এবং বহু বহু সূত্র)।
- ইমাম শাফি'ই থেকে, সূত্র ৮, পৃঃ ৫২৫, আইন নং এম-৫-১ ঃ "স্বামীর যৌন-আহ্বানে স্ত্রীকে অনতিবিলম্বে সাড়া দিতে হবে যখনই সে ডাকবে, যদি শারীরিকভাবে সে স্ত্রী সক্ষম হয়। স্বামীর আহ্বানকে স্ত্রী তিনদিনের বেশি দেরি করাতে পারবে না।"
- ইমাম শাফি'ই থেকে, সূত্র ৮, পৃঃ ৫৩৮, আইন নং এম-১০-৪ ঃ "নবী (দঃ) বলেছেন, আল্লাহ এবং কেয়ামতে যে স্ত্রী বিশ্বাস করে, সে স্বামীর অনিচ্ছায় কাউকে বাসায় ঢুকতে দিতে বা বাসার বাইরে যেতে পারবে না।"

বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন বলছে ঃ "বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত ট্রাক ও বাস অ্যাক্সিডেন্টে নিরীহ মানুষ মরিতেছে। তাহাদের সন্তানসন্ততির করুণ দশার পূর্ণ ও যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণের দিকে পাশ্চাত্য আইন কোন দৃষ্টি দিবার পর্যাপ্ত বিধান রাখে নাই। এই পরিস্থিতিতে ক্ষতিপূরণের বিধান ইসলামি আইনের সর্বকালীন আধুনিকতা প্রমাণ করে" (১ম খণ্ড, পৃঃ ১০)। কথাটা ডাঁহা মিথ্যা। পাশ্চাত্য আইনে নিহতের পরিবারকে যথেষ্ট (ক্যানাডায় দশ লক্ষ ডলার পর্য্যন্ত) ক্ষতিপূরণ-বীমার ব্যবস্থা আছে। পরিমাণটা সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট, কমবেশি করার উপায় নেই। এ বীমা ছাড়া গাড়ি চালালে এমন হিংস্র আইন প্রয়োগ করা হয় যে খুব কম লোকই বীমা-ছাড়া গাড়ি চালাতে সাহস করে।

বি-ই-আ ৩য় খণ্ডে আর গেলাম না। এ-রকম শত শত আইন আছে। অনেক দেশে এসব আইন বদল করা হয়েছে কিন্তু এখনো অনেক বাকি। ইউরোপ-আমেরিকায় যখন আমরা "ইসলাম ন্যায়ের ধর্ম" বলি তখন এ-সব অন্যায় অত্যাচারী আইনের জবাব দেয়া আমাদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

আর একবার পড়ে নিন এ বইয়ের "পোহালে শর্বরী" অধ্যায় । খবর নিন আপনাদের মারোয়ানদের । ক্রমাগত দুর্বল রাজনীতির সুযোগে বিভিন্ন কৌশলে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মারোয়ানের রক্তবীজ । এদের বড় একটা অস্ত্র হল 'ইসলামের ওপর আক্রমণ' বলে চেঁচামেচি করে এমন ভাব দেখানো যে ইসলাম রক্ষার সুমহান দায়িত্ব এখন তাদের ওপর এসে পড়েছে । এর একমাত্র উদ্দেশ্য মুসলিম সমাজের নেতৃত্ব হাতিয়ে ইসলামের নামে অনৈসলামিক রাজাদের সিংহাসন রক্ষা, যা কোরাণ ও নবীজীর নির্দেশের সরাসরি বিরোধী । আমি সুস্পষ্ট ভাষায় জানাতে চাই ইসলাম-রক্ষার জন্য কাউকে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাতে হবে না । কারণ ইসলামের একজন বিপুল শক্তিশালী মালিক আছেন যিনি বলে রেখেছেন, "আমি এই উপদেশবাণী নাজিল করেছি, আমিই তা রক্ষা করব" (সুরা হিজর্ ৯) । হ্যাঁ, তাঁরা মুসলমানের মঙ্গলের চেষ্টা করতে পারেন বটে ।

অসংখ্য প্রমাণ থেকে এই বইতে অতি সংক্ষেপে আমি সাধ্যমত করলাম । আমার শারিয়া-সিডিগুলো, শারিয়া-তথ্যনাটক "বিধি ও বিধান" এবং শারিয়া-তথ্যসিনেমা "হিল্লা" ও "নারী" দেখুন —— দলিলগুলোর জন্য যোগাযোগ করুন ও দলিলগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে দিন । যে কোন জাতির মত আমাদেরও সমস্যা অনেক । কিন্তু ইসলামের অপব্যাখ্যা এক মারাত্মক সমস্যা । নিজের অমূল্য কেতাবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে বিশ্ব-মুসলিমের আজ কি অবস্থা হয়েছে তা আমরা সবাই দেখছি । তাই ইসলামের অপব্যাখ্যাকে রোধ শুধু নয়, বাংলাদেশের জলস্থলের মাদুর থেকে শেকড় থেকে উচ্ছেদ না করা পর্যন্ত আমাদের থামার উপায় নেই । কাজটা কঠিন নয়, শান্তির ইসলামের দলিলগুলো জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেই অনেকটা এগুনো হবে । অন্য কিছু মুসলিম-প্রধান দেশে এটা হচ্ছেও । দেশের রাজনৈতিক নেতারা যদি বিশ্বাসঘাতকতা করেনও, আমাদের সুফিদের দোয়া নিয়ে জনগণই ইসলাম ধরে রাখবে ।

দেশে-বিদেশে ইসলামের নামে বোমাবাজীর তপ্ত সন্ত্রাসের নিন্দা করেন সবাই তারস্বরে । কিন্তু যে বিধিবিধান প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত নিঃশব্দে হত্যা করে দুনিয়ার সাড়ে ছয়শ' কোটি মুসলিম নারীর মানবাধিকার আর শারিয়া-দেশগুলোতে ধ্বংস করে কোটি কোটি মুসলিম নারীর জীবন সেই শীতল সন্ত্রাস নিয়ে কথা বলাটাও অত্যন্ত জরুরি । ওরা তো আমাদেরই বোন, ওদের কাতর আর্তনাদ আমাদের কানে কেন পৌঁছায় না ? আমাদের প্রত্যেকটি বোনকে কেন জীবন কাটাতে হবে হঠাৎ-তালাকের সম্ভাবনায়, হঠাৎ-সতীনের সম্ভাবনায় আর 'শর্ত মানা গায়ে দাগ না পড়া' প্রহারের সম্ভাবনায় ? আমাদের বোনদের চাক্ষুষ সাক্ষ্য কেন আদালতে নাকচ হবে, কেন আদালতে দরখাস্ত করতে হবে স্বামী যেন তাকে প্রতিদিন না মেরে সপ্তাহে একদিন মারে ? বাংলাদেশের গ্রাম-গঞ্জে আর কত ধর্ষিতা বালিকাকে জুতো খেতে হবে, কত নূরজাহান-ফিরোজাকে ধ্বংস হতে হবে জাতিকে এ-কথা জানাতে এ-আইন ইসলামি কি না ? ইসলামের ওপরে কলঙ্ক বয়ে আনা এ-সব ভয়াবহ ঘটনার বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ না করে কি করে নিজেদের দলকে ইসলামি বলে দাবি করতে পারেন আমাদের কিছু সংগঠন ?

পশু-পাখি-মাছেরা পশু-পাখি-মাছ হয়েই জন্মায় । কিন্তু মানুষ হয়ে উঠতে মানুষকে অনেক সাধনা করতে হয় । জীবনের বেশির ভাগ বোঝা মা-বোনেরাই হাসিমুখে বয়েছে চিরকাল । কিন্তু তার প্রতিদান তো দূরের কথা, স্বীকৃতিও পায়নি কোনদিন । আমরা পুরুষেরা নারীর জন্য যুদ্ধ করি, ধ্বংস করি, খুন করি, আবার আত্মহত্যাও করি । নারীর নামে আমরা তাজমহল বানাই, যক্ষ হয়ে মেঘদূত পাঠাই । নারীর বিরহে গান-গজল-কবিতায় সারা রাত জেগে থাকি আর ওদের খোঁপায় পরাই তারার ফুল । কিন্তু যে নারী পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে জন্ম দেয়, পালন করে হাসিমুখে নিরন্তর কষ্টে, জন্ম দিতে গিয়ে মরেও যায় অনেক সময়, যে নারী জন্ম দেয় নবী-রসুলকে তাদেরকে আমরা সংসারে-সমাজে-আইনে-বিধানে-সংগঠনে সমান অধিকার দিই না । এরই নাম পুরুষতন্ত্র । সমাজকে, সংস্কৃতিকে, সাহিত্যকে, রাষ্ট্রকে, আইনকে আর ধর্মকে আমরা পুরুষরা চিরকাল খুব চালাকির সাথে কাজে লাগিয়েছি ওদের শরীর আর সম্পত্তিকে কব্জায় রাখবার জন্য । ওদের শরীরের ওপর অধিকার আমরা কাউকে দিতে রাজি নই, এমনকি ওদেরকেও নয় । আমরা বুঝিনি, জীবনটা আসলে নারী-পুরুষ মিলে মধুর এক দ্বৈত-সঙ্গীত । জীবনে যে হতে পারত প্রিয়শিষ্যে ললিতে কলাবিধৌ, হতে পারত স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী আর স্নেহময়ী ভগিনী তাকে ধর্মের নামে দুমড়ে মুচড়ে পায়ের নীচে পিষে পিষে আজ আমরা পুরুষরা দানবের মত একা হয়ে গেছি ॥

শারিয়া, শারিয়া আইন ও আমাদের ইমামেরা

শারিয়া মানে হল নীতিমালা – ইংরেজিতে যাকে বলে "প্রিন্সিপল্‌স্‌"। আইন শব্দের আরবি হল "কানুন"। কোরাণ যদি আইনের কেতাব হত তবে কোরাণে "শারিয়া" না হয়ে "কানুন" শব্দটাই থাকত, এ তো স্বাভাবিক কথা। কোরাণে আমরা কোথাও পাইনি "এটা কানুন-এর কেতাব," বরং আছে এটা হল উপদেশ-কেতাব, মনে করিয়ে দেবার কেতাব ও বিশ্ববাসীর জন্য সুসংবাদের কেতাব, আলোকিত কেতাব। 'উপদেশ' বা 'সুসংবাদ' রাষ্ট্রীয় আইন হতে পারে না। শক্তির সাথে রাষ্ট্র তার নাগরিকদের ওপরে আইন প্রয়োগ করে, কিন্তু আমরা জানি, ইসলামে জোর-জবরদস্তি নেই (বাকারা ২৫৬, কাফেরুন ৬, আশ শুরা ১৫, ইত্যাদি)। চিরকাল অনেক সুফি-দরবেশ এতে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসও করেছেন। মিশরের বিচারক আল্‌ আশমায়ী তাঁদের একজন। তিনি বলেন ঃ "কোরাণ শারিয়া শব্দটাকে ব্যবহার করেছে নৈতিক পথনির্দেশ হিসেবে, রাষ্ট্রীয় কোনকিছু এতে নেই" (উসুল আল্‌ শারিয়া পৃঃ ৫৩-র সূত্র)। বিখ্যাত ইসলামি পণ্ডিত ডঃ খালেদ আল্‌ ফাদেল স্পষ্টই বলেছেন ঃ "শারিয়া শুধু নৈতিক বিধান...রাষ্ট্রের আইন দিয়ে নৈতিক উন্নতির প্রশ্নই ওঠে না" (দ্য গ্রেট থেফ্‌ট পৃঃ ১৯৬)। কোন ইতিহাসের বইতে প্রাচীন সমাজের কিছু অর্থনীতির বিবরণ থাকতে পারে কিন্তু তাতে সেটা অর্থনীতির বই হয়ে যায় না, বরং ইতিহাসকেই প্রমাণ করে। তেমনি কোরাণে কিছু ইতিহাস আছে, গ্রহ-নক্ষত্র আছে, অর্থনীতি আছে, কিছু আইনও আছে শুধু কোরাণের উপদেশ-বাণী প্রতিষ্ঠা করার জন্যই, কিন্তু তাই বলে কোরাণ ওগুলোর কেতাব হয়ে যায়নি, – উপদেশ সুসংবাদের কেতাবই আছে। এমনকি শারিয়া আইন বানাবার যে উৎস ফিক্‌হ্‌, এ শব্দটারও অর্থ হল 'মানুষের উপলব্ধি,' কোন রাষ্ট্রীয় আইন নয়। এ উপলব্ধি কিসের উপলব্ধি ? দেখুন, – "সে যুগে ফিকাহ্‌ শব্দের অর্থ ছিল পরকালের পথ, কু-রিপু'র সূক্ষ্ম বিপদাপদ ও ক্ষতিকর মাসলা সমূহ সম্পর্কে অবহিত হওয়া...সত্যি কথা হল, অধিকাংশ বুযুর্গ মনীষী ফিকাহ্‌ শব্দকে আখেরাত বিষয়ক শাস্ত্রের অর্থেই ব্যবহার করতেন, কিন্তু এখন এ-শব্দটি কেবল এক বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে মানুষ প্রতারণার জালে আবদ্ধ হচ্ছে" (ইমাম গাজ্জালী, এহিয়া উলুম আল দ্বীন ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৯-৫১)।

আরবিতে শারিয়া শব্দের মূল ধাতুগত অর্থ হল বালুর ওপরে উট-পশুর পায়ের ছাপে তৈরি পথ, যে পথে তারা পানির কাছে পানি খেতে যায়। আরেক বিশ্ববিখ্যাত ইসলামি বিশেষজ্ঞ-দার্শনিকের মতে ঃ "কোরাণে কোথাও শারিয়া শব্দে কোন সামাজিক আইন-কানুনের ইঙ্গিত নেই। শারিয়া শব্দটি বিশেষ্য, এটা কোরাণে আছে মাত্র এক জায়গায়, সুরা আল্‌ জাসিয়াহ ১৮ (৪৫ঃ১৮)। এ-ছাড়া ক্রিয়াপদ হিসেবে (শারা'আ) আছে মাত্র দুই জায়গায়, মায়েদা ৪৮ ও আশ্‌ শুরা ১৩" (চ্যালেঞ্জ অব্‌ ফাণ্ডামেন্টালিজম্‌, ডঃ বাসাম তিবি, পৃঃ ১৭০)। আপনারা যাতে মিলিয়ে নিতে পারেন সেজন্য আয়াতগুলো নীচে দেয়া হলো।

১। আল্‌ জাসিয়াহ ১৮ ঃ "অতঃপর আমি আপনাকে রেখেছি ধর্মের এক বিশেষ শরিয়তের ওপর। অতএব, আপনি এর অনুসরণ করুন এবং অজ্ঞানদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না।"

২। মায়েদাহ ৪৮ ঃ "আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি নীতিমালা ও পথ দিয়েছি।" অনেক অনুবাদে শারা'আ অর্থাৎ 'নীতিমালা দেওয়া' – এর অনুবাদে 'আইন দেওয়া' ব্যবহার করে শব্দটাকে 'সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় আইন দেওয়া' বলে বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে। এটাই ইসলামের বিরুদ্ধে প্রথম ও প্রধান ষড়যন্ত্র।

৩। আশ্‌ শুরা ১৩ ঃ "তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন (শারা'আ – পথ নির্ধারিত করে দেওয়া) যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহ্‌কে, যা আমি আদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না।"

৪। আরো দেখুন সুরা আশ শুরা আয়াত ২১।

আমরা দেখছি হজরত নূহ্‌, হজরত ইব্রাহীম, হজরত মূসা, ও হজরত ঈসা ধর্ম-ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেননি, করার চেষ্টাও করেননি। বরং তাঁদের দায়িত্ব ছিল <u>শুধুমাত্র</u> সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শনকারী। এর বাইরে নবী-রসুলরা বহুকিছু করেছেন প্রয়োজনে, ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দে, মানুষের মঙ্গলের জন্য ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণে। যেমন নবীরা উটে চড়েছেন ও নবীজী উটের মূত্র খেতে বলেছেন। এগুলো ইসলামি ধর্মবিশ্বসের অঙ্গ হতে পারে না। তাই হুঁশিয়ারি দিয়ে গেছেন সাম্প্রতিক কালের বিশ্ববরেণ্য ইসলামি পণ্ডিত ডঃ ফজলুর রহমান ঃ "নবীজীর সব কথা ও কাজকর্ম ইসলামি ধর্ম-বিশ্বাসের অঙ্গ নয়, তাঁর বহু কাজ ও কথা ধর্মনিরপেক্ষ" (ইসলাম, পৃঃ ২২৯)।

কিন্তু তাহলে শারিয়া আইন কাকে বলে ? বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শারিয়াবিদ ডঃ হাশিম কামালি'র মতে ঃ "কখনো কখনো কোরাণের একটি বিষয়ে সাত বা আট রকমের আইনগত মতামত পাওয়া যায়। মুসলিম শাসক তাহার মধ্যে একটিকে বৈধ করিয়া আইন হিসেবে প্রয়োগ করিলে শুধুমাত্র সেইটিই সকলের জন্য বাধ্যতামূলক হয়" (প্রিন্সিপল্‌স্‌ অব্‌ ইসলামি জুরিস্প্রুডেন্স, পৃঃ ৩১)। অর্থাৎ ইসলামি রাষ্ট্রের শাসক প্রয়োগ না করা পর্যন্ত সেগুলো শুধুমাত্র ইমামদের ব্যক্তিগত মতামত হয়েই থাকবে, আইন হবে না। তাই ইমামদের এই ব্যক্তিগত মতামতগুলো গ্রামগঞ্জের আর ইন্টারনেটের শারিয়া আদালতগুলোতে 'আল্লা'র আইন' হিসেবে প্রয়োগ করাটা মোটেই ইসলামি নয়। শারিয়া আইন প্রয়োগের বেলাতেও আইন দেয়া আছে ঃ "খলিফা ও তাঁহার প্রতিনিধি ছাড়া আর কেহই বিচারক নিয়োগ করিতে পারিবে না" (শাফি' আইন নং o.21.3)। অর্থাৎ আমাদের গ্রামগঞ্জের ফতোয়ার আদালতগুলো শারিয়া মোতাবেকই সম্পূর্ণ অবৈধ।

এখানেই ফতোয়া শব্দটা চলে আসে। এ শব্দটা আমাদের পূর্বপুরুষেরা জানতেনই না। কিন্তু আজকাল এটার প্রয়োগ বিদেশ থেকে আমদানি হয়েছে, ঢাকা থেকে শুরু করে দেশের গ্রামে-গঞ্জে মাঝে মাঝেই কথাটা শোনা যায়। ইমাম শাফি তাঁর শারিয়া বই উমদাত আল্ সালিক-এর ১১৮৪ পৃষ্ঠায় ফতোয়াকে বলেছেন Legal Formal Opinion অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক আইনগত অভিমত। শব্দটার মানে ইসলামি ওয়েসবাইটে দেয়া আছে এভাবে ঃ "ফতোয়া হইল ইসলামিক আইনের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞের অভিমত। শুধুমাত্র কোন বৈধ কর্তৃপক্ষই ইহা দিতে পারেন। কিন্তু যেহেতু ইসলামে (স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে পাদ্রী-পুরুতের মত) কোন মধ্যব্যক্তি নাই কাজেই ফতোয়া জনগণের উপর বাধ্যতামূলক নহে।"

গ্রহণ ও বর্জনের এই বৈধ অধিকার সম্পূর্ণ মুসলিম জনগণের, ফতোয়া প্রদানকারীর নয়। জনগণের এই বৈধ অধিকারকে কেউ অস্বীকার করে মানুষের ওপর ফতোয়া চাপিয়ে দিলে তা ঐ শারিয়ারই বিরোধী হয়ে যাবে যে শারিয়া ঐ ফতোয়াবাজ প্রতিষ্ঠা করতে চান।

ব্যাপারটা আরও একটু স্পষ্ট হবে আমাদের চারজন শারিয়া-ইমামদের দিকে তাকালে। সেই ইমামেরা আসলে কি চেয়েছিলেন ? নিজেদের আইনকে তাঁরা কি বলেছিলেন ? তখনকার 'ইসলামি রাষ্ট্র'-এর সাথে তাঁদের কি সম্পর্ক ছিল ?

(১) "ইমাম শাফি' তাঁহার আইনকে 'শাফি আইন' নামে চালাইতে চান নাই" (ইমাম শাফি'র বিখ্যাত কেতাব রিসালা, পৃঃ ২২)।

(২) "ইমাম শাফি' নিজের নামে কোনো মজহাব চালাইতে চান নাই বলিয়া প্রতীয়মান হয়" (রিসালা, পৃঃ ৪৫)।

(৩) "ইমাম শাফি' নিজেকে রাজনীতি ও রাষ্ট্র-ক্ষমতা হইতে সম্পূর্ণ দূরে রাখিয়াছেন" (রিসালা, পৃঃ ১৮)।

(৪) "খালিফা মামুনুর রশীদ ইমাম শাফি'-কে কাজীর পদে আমন্ত্রণ জানাইলে শাফি' তা প্রত্যাখ্যান করেন" (শারিয়া, দি ইসলামিক ল' – ডঃ আবদুর রাহমান ডোই, পৃঃ ১০৫)।

(৫) "খলিফা আল্ মনসুর ইমাম মালিককে অনুরোধ করেন ইসলামি আইন লিখিতে যাহাতে খালিফা সকল মজহাবের উপরে উহাকে আইন হিসেবে বলবৎ করিতে পারেন। কিন্তু ইমাম মালিক তাহা প্রত্যাখ্যান করেন" (শাফি শারিয়া উমদাত্ আল সালিক, পৃঃ ১০৬৯)।

(৬) "খলিফা মনসুর ইমাম আবু হানিফাকে প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণের অনুরোধ করিলে তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই" (বিধিবদ্ধ ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৭)।

(৭) "খলিফা হারুনর রশীদ ইমাম মালিকের কেতাবকে কাবা শরীফের দেয়ালে ঝোলানোর ও জনগণকে তা মানতে বাধ্য করার প্রস্তাব দিলে ইমাম মালিক তা প্রত্যাখ্যান করেন " (দ্য ফোর ইমাম্স্ – আবু যাহরা পৃষ্ঠা ৭২)।

শারিয়া-রাষ্ট্র আমাদের প্রায় প্রতিটি ইমামের ওপর যে অত্যাচার করেছে তা চিন্তাও করা যায় না। শারিয়া-রাষ্ট্রের সৈনরা মদিনার পথে জনতার সামনে ইমাম মালিককে চাবুক মেরে মেরে তাঁর শরীর থেকে মুচড়ে মুচড়ে হাত ভেঙে ফেলেছে। শারিয়া-জেলখানায় বন্দি করেছে ইমাম শাফি আর ইমাম হাম্বলকে, জেলখানায় বন্দি করে বিষ দিয়ে খুন করেছে ইমাম তাইমিয়ার মত সম্মানিত ইমামকেও। এই অত্যাচার থেকে রেহাই পাননি প্রায় কেউই। লোকচক্ষুর অন্তরালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন নির্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত ইমাম বোখারি, দু'হাত তুলে হাহাকার করতেন ইসলামের যুগশ্রেষ্ঠ এই ইমাম ঃ "হে আল্লাহ্ ! আমাকে তোমার কাছে নিয়ে যাও – এ দুনিয়া আমার জন্য ছোট হয়ে গেছে।" খেলাফতের নামে মুসলিম-ইতিহাসে অন্তত বিশটা রাজতন্ত্রের অবিরত গৃহযুদ্ধ, গণহত্যা, গুপ্তহত্যা, বিদ্রোহ, পালটা বিদ্রোহে জনগণের দুর্ভোগের সাথে একই দুর্ভাগ্য হয়েছে অন্যান্য ইমামদেরও। খলিফা আল্ মনসুরের হাতে জেলখানায় খুন হয়েছেন ইমাম জাফর সাদিক, তাঁর পুত্র খলিফা হারুনর রশীদের হাতে খুন হয়েছেন জাফর সাদিকের পুত্র ইমাম মূসা কাজিম। সেই সাথে সুফিদের ওপরে যে কি অত্যাচার নেমে এসেছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

আর ইমাম আবু হানিফা ? শারিয়া-রাষ্ট্র ইমাম তাইমিয়ার মত জেলখানায় বন্দি করে জেলখানার ভেতরেই বিষ দিয়ে খুন করেছে তাঁকেও। অথচ হানাফি হুদুদ আইনে লেখা আছে ঃ "রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে হুদুদ মামলা করা যাইবে না" (হানাফি আইন হেদায়া পৃঃ ১৮৮)। এসব অত্যাচারী শাসককে বাঁচাবার জন্য এ-অন্যায় আইন ইমাম আবু হানিফা কখনোই বানাতে পারেন না তা এক বাচ্চাও বোঝে। অথচ তাঁরই নামে চলছে এ-সব অন্যায় আইন। এ-থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় রাজপ্রাসাদে এক কোরাণ ছাড়া প্রতিটি দলিল বদলাবার সম্পূর্ণ সুযোগ ছিল । এ বইয়ের অনেক নিবন্ধে সে প্রমাণ আছে। ইমামরা মারা যাওয়ার পর ওই ইমামদের নামেই আইন বা হাদিস প্রতিষ্ঠিত করা রাজক্ষমতার পক্ষে ডালভাত। হাদিসে বা শারিয়া আইনে আমরা যে-সব অন্যায় আইন দেখি তা এ-ষড়যন্ত্রেরই ফল। এমনকি সহি হাদিসগুলোতেও হাজার হাজার জাল হাদিস আছে তা সবাই জানেন ও মানেন।

এই হলো মুসলমানের রক্তাক্ত ইতিহাস। "এইসব সন্ত্রাসী রাজতন্ত্রের জন্যই প্রভাবশালী অনেক সুফি ইরাণ-তুর্কীস্থান হইতে ভারতবর্ষে চলিয়া আসেন। মুসলিম রাষ্ট্রের সন্ত্রাস সর্বব্যাপী হওয়ায় সুফিদের উপর অত্যাচার হইতেছিল" – হিউম্যান রাইট্স্ ইন্ মুসলিম ওয়ার্লড – ডঃ মায়মুল খান, পৃঃ ৬৫। এত আগুনের ভেতরেও মুসলিম জ্ঞানী-বিজ্ঞানীরা অর্জন করেছিলেন বিশ্ব-জ্ঞানের অমূল্য সম্পদ যা পেয়ে ইউরোপ-আমেরিকার বিজ্ঞানীরা ধন্য হয়েছে, এগিয়ে নিয়ে গেছে বিশ্বকে। এ-কথা তাঁরা এখনও সর্বদা সসম্মানে স্বীকার করেন।

বিদেশি বিশেষজ্ঞদের অনেক উদ্ধৃতি দিলাম। কিন্তু আমাদেরও অনেক প্রবাসী ইসলামি

বিশেষজ্ঞ আছেন। ডঃ মায়মুল খানের উদ্ধৃতি আগেই দিয়েছি। প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে ইসলামি চিন্তাবিদ হিসেবে আমেরিকার আপার আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ মোহাম্মদ ওমর ফারুক অন্যতম। যাঁরা ছোট পরিসরে শারিয়ার মূল তত্ত্ব জানতে চান আমি তাঁদের অনুরোধ করব তাঁর "শারিয়া, ল' অ্যাণ্ড ইসলাম ঃ লিগ্যালিজম্ ভার্সাস ভ্যাল্যু-ওরিয়েন্টেশন" নিবন্ধটা পড়তে। কেউ ওটা বাংলায় অনুবাদ করে চারদিকে ছড়িয়ে দিলে ভাল হয়। ওটা পাওয়া যাবে ইন্টারনেটের এই ঠিকানায় ঃ http://www.theghouseteam.com/mg/WMC_Files/Shariah_value_Dr.Farooq.pdf

পুরোটা এখানে দেয়া গেল না, কিছু অংশের সারাংশ করে ভাবানুবাদ দিচ্ছি যেগুলো বিচ্ছিন্ন হলেও স্ব-ব্যাখ্যাকারী।

"এ পর্যন্ত যাহা বলা হইল তাহার ভিত্তিতে (বলা যায়) শারিয়া ইসলাম নহে। কিন্তু মওলানা মওদুদির অনুসারী খুরশিদ আহমেদ বলিয়াছেন 'ইসলামের অপর নাম শারিয়া।' উপরোক্ত বক্তব্যে মনে হয় ইসলামে জীবনের সকল ব্যাপারে বিধান আছে। ইহাও মনে হয় মানুষের জীবনে যাহা কিছু ঘটিতে পারে সেই প্রত্যেক বিষয়, অবস্থা ও সমস্যার সমাধান তৈরি আছে (অথবা সহজে এবং দ্রুত তৈরি করিবার মত করিয়া দেওয়া আছে)। আরো মনে হয় ইসলাম হইল একটি সুসংহত স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন-বিধান, মুসলমানের উচিত নহে সমাধান বা নীতিমালার জন্য অন্য কিছুর তালাশ করা... "

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইসলাম হইল জীবনের প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রদান করে। কিন্তু ইহাকে এই পর্যন্ত টানিয়া নেওয়াও ভুল যে মুসলিম বা জনগণের সকল সমস্যার আগে হইতে তৈরি করা ম্যানুয়াল হইল ইসলাম। (শারিয়াবিদদের মতামতে) মনে হয় ধর্মগ্রন্থের অক্ষর বা ইমামেরা জীবনের সকল বিষয় ও সমস্যা আগে হইতেই চিহ্নিত করিয়া সমাধান দিয়াছেন। সেই হিসেবে, অন্য কাহারো কাছ হইতে কোন কিছু শিক্ষা করার দরকারই নাই। (বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিক ও ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যতীত) সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা-বিষয়ক, রাজনৈতিক ও বাকি যত কিছুই মনে হইতে পারে তাহার সকল সমাধানের জন্য একটি কাজই করিতে হইবে, – তাহা হইল কোরাণ-হাদিস খুলিয়া দেখা, অথবা আইনবিদ ও বিশেষজ্ঞদের কেতাব খুলিয়া দেখা, অথবা কোন ফতোয়া-প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ করা, – তাহা হইলেই সমাধান পাওয়া যাইবে। কিন্তু বাস্তব তাহা নহে। ভাবিয়া দেখা দরকার সমস্যা ও সমাধান দুইটাই যদি এত তৈরি তবে বিশ্ব-মুসলিমের এই করুণ অবস্থা কেন। আগে হইতেই মুসলিম-চিন্তাবিদদের একটি মৌলিক ভ্রান্তি হইল (ধর্মগ্রন্থের) কেতাব-প্রবণতা...আমাদের তথাকথিত শারিয়া-বিশেষজ্ঞরা আমাদিগকে কেতাবের সহিত আঠা দিয়া আটকাইয়া রাখিয়াছেন, ওদিকে বিজ্ঞান আমাদিগকে বহু পিছনে ফেলিয়া আগাইয়া গিয়াছে...আমরা যত বেশি শারিয়া-প্রবণ হইয়াছি তত বেশি আল্লাহ্'র নির্দেশকে অমান্য করিয়াছি, বরং আমাদের মাথা কেতাবের ভিতরে ঢুকাইয়া রাখিয়াছি। আমরা আরও কেতাব পড়িয়াছি এবং আগের কেতাবের উপরে আরও কেতাব লিখিয়াছি। ফল যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে। এখন আমরা মহানন্দে (?) জীবন কাটাইতেছি ওই 'সামগ্রিক জীবন-বিধান' মোতাবেক, কিন্তু কোথাও পৌঁছাইতে পারিতেছি না...সমস্যা হইল ইসলামের স্থবির উপলব্ধি, যেখানে বর্ণমালা ও ইহার বিশেষজ্ঞদিগকে সমস্যা-সমাধানের ডিকশনারী (অভিধান) ধরা হয়...প্রকৃতপক্ষে ইসলাম কোন অভিধান নহে, ইসলাম বর্ণমালার মত। অভিধানে দরকার-মত বহু শব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু বর্ণমালা দিয়াই আরও বহু (নূতন) শব্দ তৈরি করা প্রয়োজন হয়। যখন 'সামগ্রিক জীবন-বিধান' বলিয়া ইসলামকে ডিকশনারির মত মনে করা হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই আমরা ইতিহাসের কাঠামোতে ফসিলের মত বন্দি হইয়া পড়ি। সামগ্রিক জীবন-বিধানকে বর্ণমালা মনে করিলে আমরা জীবনের নূতন নূতন বিষয় ও সমস্যার সমাধানে গতি পাইতাম। শাতিবি বলিয়াছেন, 'অভিজ্ঞতায় দেখা যায় প্রত্যেক আলিম যিনি সমস্যা-সমাধানের জন্য কোরাণের দ্বারস্থ হইয়াছেন তিনি কোরাণকে নীতিমালা হিসেবেই পাইয়াছেন যাহা তাঁহাকে সে সমস্যা-সমাধানের মূল্যবোধ দিয়াছে'...ইসলাম সম্বন্ধে গভীরতম বিভ্রান্তির কারণ হইয়াছে শারিয়া ও ইসলামি আইনের পারস্পরিক সম্পর্ক কেননা কিছু লোক এই বিভ্রান্তির ভিত্তিতে ইসলাম প্রয়োগ করিতে চান।" – ভাবানুবাদ শেষ ॥

শারিয়ার আইনের উৎস

ইমাম শাফি'র শারিয়া-কেতাব "উমদাত আল্ সালিক"-এ আইন আছে ছয় হাজারের বেশি। ইমাম আবু হানিফার কেতাব হেদায়া-তেও প্রায় ছয় হাজার। আমাদের ইসলামি ফাউণ্ডেশনের প্রকাশিত তেইশশো' পৃষ্ঠার বিধিবদ্ধ ইসলামি আইনে ৩ খণ্ড মিলে আইন আছে প্রায় দেড় হাজার। অথচ কোরাণে আইন আছে মাত্র কয়েকটি এবং হাদিসে আছে আরো কিছু, ব্যস্। তাহলে বাকি হাজার হাজার আইনগুলো কোত্থেকে এল ? ওগুলো নিশ্চয়ই এসেছে অন্যদের বানানো বহু উৎস থেকে। কিন্তু যেহেতু বিরাট পুকুরে এক ফোঁটা দুধ মিশালে তাকে দুধের পুকুর বলা যায় না, তেমনি মানুষের বানানো হাজার হাজার আইনের মধ্যে কোরাণ-হাদিস থেকে মাত্র কয়েকটা ঢুকিয়ে দিলে তাকে 'আল্লার আইন' বলা যায় না। যেমন, বিধিবদ্ধ ইসলামি আইনের ৩য় খণ্ডের ৫১ অধ্যায়ের আইনে আছে ১৮৬টা। কিন্তু তার ৩৪৪টা সূত্রের মধ্যে কোরাণ মাত্র ১টা আর সহি হাদিস ১৮১টা। বাকি ১৬২টা সূত্রই কোনো না কোনো মানুষের মতামত মাত্র। আসলে শারিয়ার আইনগুলো এসেছে প্রায় ১১টা উৎস থেকে ঃ

কোরাণ থেকে : যেমন অনিয়ন্ত্রিত বহুবিবাহ, স্ত্রী-প্রহার, নারীর অর্ধেক উত্তরাধিকার, ক্ষেত্রবিশেষে নারীর অর্ধেক সাক্ষী ইত্যাদি। কিন্তু কোরাণের আয়াত দিয়ে যেভাবে আইন বানানো হয়েছে তাতে অনেক মওলানা-বিশেষজ্ঞরা চিরকাল তীব্র আপত্তি করেছেন। অর্থাৎ এ আইনগুলো কখনো 'সর্বসম্মত' ছিল না।

হাদিস বা সুন্নত থেকে : যেমন পরকীয়া, মুরতাদ ও ধর্ষকের দণ্ড, ইত্যাদি। এর প্রতিটিই কেন কোরাণ-বিরোধী তার প্রমাণ এই বইয়ের বিভিন্ন নিবন্ধে দেয়া আছে। শত শত শারিয়া আইন হাদিস-নির্ভর। যদিও বলা হয় সহি সিত্তা অর্থাৎ ছয়টা সহি হাদিস, আসলে আমাদের সহি হাদিস হল সাতটা – বোখারি, মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্, তিরমিজী, নাসায়ী ও মুয়াত্তা। হাদিসের মধ্যে অনেক অমূল্য রতন আছে কিন্তু সেই সাথে "শারিয়া বানাবার সময়টাতে জাল হাদিসের বন্যা বয়ে গিয়েছিল" – (শাফি' শারিয়া পৃঃ ১০২৭)।

হাদিসের একটা অঙ্ক দিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। আমাদের নবীজী তো রহমতুল্লিল মুসলেমিন নন – অর্থাৎ শুধু মুসলমানের প্রতি আল্লাহ'র রহমত নন। তিনি হলেন রহমতুল্লিল আল্ আমিন, অর্থাৎ রহমত তিনি সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য। এবারে মনে করুন, সেই রহমতুল্লিল আল্ আমিন-এর নামে হিংস্র হাদিসগুলো দেখে আপনার বুক কেঁপে উঠল। আপনি বললেন এগুলো সত্যি হতে পারে না, নবীজীর পক্ষে এ-নিষ্ঠুরতা সম্ভব নয়। কিন্তু তৎক্ষণাৎ শারিয়া মোতাবেক আপনি হয়ে যাবেন মুরতাদ অর্থাৎ 'ইসলাম ত্যাগকারী' কারণ শারিয়াপন্থীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন "হাদিসকে যে অমান্য করে সে কাফের" (সূত্র ঃ অনেক শারিয়া কেতাব ; মওলানা মুহিউদ্দিনের কোরাণের বাংলা অনুবাদ পৃঃ ৭৪৩ ও ২৫৬ ; মওলানা আবদুর রহিমের 'হাদিস সঙ্কলনের ইতিহাস' পৃঃ ৯৪, ইত্যাদি)। এর পরেই আপনার ওপরে প্রয়োগ হবে আরেকটা শারিয়া আইন – "মুরতাদের সাজা মৃত্যুদণ্ড।" অর্থাৎ দাঁড়ালো এই, হয় আপনি ওই হিংস্র হাদিসগুলোকে 'নবীর সুন্নত' হিসেবে সত্য বলে মেনে নেবেন, অথবা আপনাকে পাথরের আঘাতে মেরে ফেলা হবে।

পাঠক ! এর নাম ব্ল্যাকমেল। হত্যার ভয় দেখিয়ে নিজেদের মতামত ইসলাম হিসেবে জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা। কথার কথা নয়, এই আইনে ইতিহাসে অজস্র মুসলমান খুন হয়েছেন শারিয়াপন্থীদের হাতে।

শারিয়াপন্থীদের আতঙ্ক আমি বুঝি। আতঙ্কটা হল, যেহেতু হাদিস দিয়েই শত শত অমানবিক নারী-বিরোধী আইন বানানো হয়ছে, তাই সহি হাদিসের ভেতরে এই অসহি চেহারা মানুষের সামনে খুলে গেলে শারিয়ার পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে যাবে। কিন্তু সুখবর হল, তুরস্কের সরকার সম্প্রতি চাউল থেকে কাঁকর বেছে ফেলে দেবার মত ওই হাদিসগুলোকে বাদ দিয়ে সহি হাদিসের কাজ হাতে নিয়েছেন। এর ফলে আমরা পেয়ে যাব আমাদের প্রিয় নবীজীর সত্য-সুন্দর উদাহরণ, আর সেই সাথে ওইসব হিংস্র হাদিস বাতিল হলে হাদিস-নির্ভর শত শত শারিয়া আইনের ভিত্তি টলে যাবে।

ইজমা, অর্থাৎ সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। কিন্তু ইজমা কাকে বলে সে ইজমাটাই মওলানারা ঠিক করতে পারেননি ১৪০০ বছরে। দুনিয়াজুড়ে কোটি মওলানাদের বা দেশজুড়ে হাজার হাজার মওলানাদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অসম্ভব। তাছাড়া, কোন মওলানা এক সময়ের ইজমা অন্য সময়ে বদলে ফেললে 'আল্লা'র আইন'- এর কি হবে ? এজন্যই শারিয়া কেতাবে বলছে কিছু ইমামের মতে কোন মওলানার ইজমা শুধু তাঁর মৃত্যুর পরেই গ্রহণযোগ্য (বি-ই-আ ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৬) !

কিয়াস, অর্থাৎ মওলানাদের ব্যক্তিগত যুক্তি। কিন্তু দুনিয়াজুড়ে কোটি মওলানাদের ও দেশজুড়ে হাজার হাজার মওলানাদের কিয়াস পরস্পর-বিরোধী হবেই। সেজন্যই ইসলামের ইতিহাস মওলানাদের প্রতি মওলানাদের 'কাফের-মুনাফেক' ফতোয়া দিয়ে ভর্তি, সেজন্যই অবিভক্ত ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান দু'টো ইসলামি প্রতিষ্ঠানের দেওবন্দী আর বেরিলভীরা একে অন্যকে কাফের বলেছেন, মওলানা মওদুদিকেও কাফের বলেছেন ভারত-বিখ্যাত মওলানারা। বিখ্যাত ইমাম হৌজ-এর নেতৃত্বে বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী'র মত দরবেশকেও 'কাফের' ফতোয়া দিয়েছিল এক হাজার মওলানা ঃ সূত্র – ফতহুল গয়ব (বড়পীর সাহেবের বক্তৃতা-সঙ্কলনের মুখবন্ধ)।

প্রাচীন কেতাব থেকে : যেমন স্বামীকে তালাক দিতে চাইলে স্ত্রীকে যেতে হবে

শারিয়া আদালতে স্বামীর অনুমতি আদায়ের জন্য (ইহুদীদের গে'ট আইন), কিংবা জ্বেনাকারী ও মুরতাদের প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড, ইত্যাদি (ইহুদীদের ডিউটেরোনমি'র ১৩ থেকে ২৯ নং ভার্স)।

স্থানীয় প্রথা থেকে : বিধিবদ্ধ ইসলামি আইনের ১ম খণ্ড আইন নং ২২০-তে স্বীকার করাই আছে এ-আইন 'স্থানীয় প্রথার প্রভাব।' তাছাড়া আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে (ক) উরফি বিয়ে (কোন রকম দলিল ছাড়া গোপন বিয়ে), (খ) মাইসার বিয়ে যাতে কনে স্বীকার করে নেয় স্বামী তার থাকা-খাওয়া সহ কোন আর্থিক দায়িত্বই নেবে না, এবং (গ) মেয়েদের মুসলমানি করার আইন, ইত্যাদি স্থানীয় প্রথার আইন - দেখুন 'নারীর মুসলমানি' নিবন্ধ। ইমাম শাফি'র বিখ্যাত কেতাব রিসালা-তেও আছে : "প্রাচীন ব্যবিলন ও আরমাইক ছাড়াও রোমান ও ইরাণের আইনগুলি মুসলিম আইনবিদগণকে প্রচুর আইন বানাইবার কাঁচামাল দিয়াছে" – পৃঃ ৫। এভাবে জাহিল যুগের অনেক আইন শারিয়ায় ঢুকে গেছে। কিন্তু খুলে দেখুন কোরাণ কি বলছে – "তোমরা কি জাহেল যুগের আইন চালাতে চাও ?" (মায়েদা ৫০)। জাহেল যুগের আইন না চালাতে বলেছে সহি বোখারিও – নবম খণ্ড হাদিস নম্বর ২১।

অন্যান্য উৎস : (৭) সামাজিক রীতি-ভিত্তিক আইন, যেটা দেশে-বিদেশে বিভিন্ন হতে বাধ্য, (৮) মওলানাদের স্বাধীন মতামত, এটা কিয়াস-এর কাছাকাছি এবং কিয়াস-এর মতই অবাস্তব, (৯) জনকল্যাণ, যাতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মওলানার বিভিন্ন মতামত হবেই, (১০) সাম্য, যা সম্বন্ধেও বিভিন্ন মওলানার বিভিন্ন মতামত হতে বাধ্য, (১১) আগে থেকে যা চলে এসেছে যেমন "ইসলামের আগের যে-সব প্রথাকে ইসলাম উচ্ছেদ করে নাই তাহা শারিয়ায় যোগ করা হইয়াছে" (রিসালা পৃঃ ৪৪, ইত্যাদি)।

ইমামদের আইন নিয়েও এত বিভিন্ন দলিল পাওয়া যায় যে কোন্‌টা ঠিক তা কেউ নিশ্চিতভাবে বলতে পারবে কিনা সন্দেহ। দেখুন শারিয়া-সমর্থক আইনের প্রবীণ অধ্যাপক কি বলছেন ঃ

"চারিজন সুন্নি আইনিদাতার মধ্যে একমাত্র ইমাম মালিকই হাদিস সঙ্কলন করিয়াছিলেন। ইমাম মালিক নিজে এ-কাজ করেন নাই, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ছাত্ররা করিয়াছিল ... মুয়াত্তা (ইমাম মালিকের হাদিস) সম্পাদনা করিয়াছিলেন তাঁহার ছাত্র শায়বানী যিনি ইমাম আবু হানিফারও ছাত্র ছিলেন...'মসনদ আবু হানিফা'ও ইমাম আবু হানিফা (মৃত্যু ৭৬৭ সালে) নিজে করেন নাই, উহা ১২৭৫ সালে সঙ্কলিত করিয়াছিলেন ইমাম মুয়াইদ খারাজামী ...হানাফি আইনের ভিতর তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে আবু ইউসুফ, শায়বানী, যুফার ও হাসানের অবদান আছে। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, ইমাম হাম্বলের মৃত্যুর পরে তাঁহার মসনদের সঙ্কলন করিয়াছিলেন তাঁহার পুত্র আবু বকর ক্বাতি ও অন্যান্যরা... বস্তুতঃপক্ষে ইমাম শাফি'র আইনগুলি যোগাড়, সঙ্কলন ও প্রকাশিত করিয়াছেন তাঁহার ছাত্ররা। 'মসনদ শাফি' সঙ্কলিত করিয়াছেন তাঁহার ছাত্র রাবি সুলায়মানের অনুমতিক্রমে ইয়াকুব আল্‌ আছাম" (মুসলিম জুরিস্প্রুডেন্স অ্যাণ্ড ল' অব্ ক্রাইম্‌স – ডঃ মীর ওয়ালিউল্লাহ, প্রিন্সিপ্যাল, আইন বিভাগ পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়)।

সব মিলিয়ে সত্যটা হলো – "ইজতিহাদের মাধ্যমে মানুষের যুক্তি শারিয়ার গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়েছে" (হাশিম কামালি, মুখবন্ধ)। এ-কারণেই শারিয়াকে আল্লার আইন বলা যায় না। শারিয়াপন্থীদের প্রিয় বিখ্যাত লেখিকা ক্যারেন আর্মস্ট্রং বলেন – "ইমাম আবু হানিফা নিজে সামান্যই লিখিয়াছিলেন, তাঁহার ছাত্ররা তাঁহার শিক্ষাকে ভবিষ্যতের জন্য রক্ষা করিয়াছিল। পরবর্তিকালে কিছুটা ভিন্নমতের আইনবিদগণ মজহাব প্রতিষ্ঠা করেন" (ইসলাম, এ শর্ট হিস্ট্রি, পৃঃ ৪৯)। হাম্বলি আইনও প্রথমে সঙ্কলন করেন ইবনে কাদামাহ্‌ তাঁর আল্‌ মুঘনি বইতে, ইমাম হাম্বলের মৃত্যুর প্রায় পাঁচশ' বছর পরে !

কোরাণ থেকে শারিয়া আইন যেভাবে বানানো হয়েছে তাতে কিছু ভুল পাওয়া যায়। আয়াতগুলো এত স্পষ্ট ও বিখ্যাত যে এগুলোকে অনিচ্ছাকৃত ভুল বলা কঠিন। যাহোক, ইচ্ছেকৃত হোক বা না হোক এ-ধরনের ভুল অত্যন্ত মারাত্মক। এতে কোরাণ-বিরোধী ও কোরাণ-নিরপেক্ষ আইনকেও কোরাণের আইন হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। আরো দু'একটা উদাহরণ দিচ্ছি আমাদের ইসলামি ফাউণ্ডেশন থেকে প্রকাশিত বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন থেকে। ওটা হাতের কাছে পাওয়া যায় বলে আপনারা মিলিয়ে নিতে পারেন।

১। ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ২৮৬ থেকে উদ্ধৃতি ঃ "হত্যাকারীর অপরাধ প্রমাণের জন্য অন্ততপক্ষে দুইজন মুসলিম পুরুষ সাক্ষীর প্রয়োজন হইবে। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ (সুরা বাকারা ২৮২ ও সুরা ত্বালাক ২-এর উল্লেখ)"– উদ্ধৃতি শেষ।
কোরাণ খুলে দেখুন ওই আয়াত দু'টোয় দু'জন সাক্ষী রাখার নির্দেশ আছে শুধুমাত্র ধার-কর্জের দলিলের বেলায় (বাকারা ২৮২) আর স্ত্রী-তালাকের বেলায় (ত্বালাক ২)। এ-আইন কোরাণ-বিরোধী, কোরাণে কোথাও কোনো ব্যাপারে নারীর চাক্ষুষ সাক্ষ্য বাতিল করা হয়নি।

২। ১ম খণ্ড ৩১১ পৃষ্ঠা ও ২য় খণ্ড ২৭৯ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃতি ঃ "জ্বেনার সাক্ষীর ক্ষেত্রেও সাক্ষ্য-আইনের সাধারণ শর্তাবলী প্রযোজ্য হইবে" – উদ্ধৃতি শেষ।
এই সাধারণ শর্তাবলীর উৎস হিসেবে আবারো দেয়া আছে সুরা ত্বালাক আয়াত ২। অথচ তালাকের শর্তটা ঢালাও ভাবে 'সাক্ষ্য-আইনের সাধারণ শর্তাবলী' করা যায় না।

৩। ২য় খণ্ড ২৭০ পৃষ্ঠায় ইবনে মাজাহ্‌ হাদিস নং ১৪৫৪ ও ২৬৬৬-এর সূত্রে বলা আছে এক ধর্ষিতার সাক্ষ্যে ও গয়না-ডাকাতির শিকার এক বালিকার সাক্ষ্যে নবীজী অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। কিন্তু আপনারা ইবনে মাজাহ্‌ খুলে দেখুন (২য় ও ৪র্থ খণ্ড পৃষ্ঠা যথাক্রমে ৩৪১ ও ৭৫), হাদিস ১৪৫৪-এ ধর্ষণের কোন কথাই নেই, আছে শুধু মৃতের খোলা চোখ হাত দিয়ে বন্ধ করে দেয়া। হাদিস নং ২৬৬৬-তেও গয়না-ডাকাতকে খোঁজা বা ধরার উল্লেখ নেই, মৃত্যুদণ্ড তো নেই-ই নেই।

শারিয়াপন্থীরা সর্বদাই বলেন আল্লাহ্‌ "নোজ্‌ দ্য বেস্ট" (আল্লাহ সবচেয়ে ভাল জানেন)। কিন্তু তাহলে রাষ্ট্র-আইন বানিয়ে নিজের মতামত অন্যের ওপরে চাপিয়ে দেয়াটা ইসলামি হয় কি করে এ প্রশ্নটার জবাব তাঁরা দেন না ॥

আইনে আইনে বিরোধ

শারিয়া আল্লার আইন হলে আইন একটাই হতো, চার-পাঁচ রকম হতো না। বিভিন্ন শারিয়ার মধ্যে পার্থক্য, বিরোধ বা উল্টো আইনও থাকত না। কিন্তু শারিয়ার আইনগুলোতে শত শত মারাত্মক স্ববিরোধীতা আছে। এই পরস্পর-বিরোধীতা মাঝে মাঝেই করুণ ও হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি করে। খুনের অপরাধে মির্জা তাহিরকে পাকিস্তানের শারিয়া কোর্ট (১) মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে ১৯৮৯ সালে, (২) সেটা বদলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে ১৯৯৪ সালে, (৩) সেটা বদলে নিরপরাধ হিসেবে ছেড়ে দিয়েছে ১৯৯৬ সালে, (৪) আবার ওই একই অপরাধে দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তার করে দ্বিতীয়বার মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে ১৯৯৮ সালে, (৫) তার প্রাণভিক্ষার আবেদন বাতিল করেছে ২০০৩ সালে, এবং (৬) অবশেষে তাকে সম্পূর্ণ মুক্তি দিয়েছে ২০০৬ সালে। বেচারা মির্জা তাহির শারিয়ার এই জগাখিচুড়ির শিকার হয়েছে ১৭ বছর জেলখানায় বন্দী থেকে (খবর বি-বি-সি'র)।

ইমাম শাফি'র বিখ্যাত কেতাব 'রিসালা'-তে আছে ঃ "ইমাম শাফি ইমাম মালিকের মতামতের সাথে অপ্রত্যাশিতভাবে ভিন্নমত পোষণ করিতেন" (পৃঃ ১৩)। কিছু উদাহরণ দিচ্ছি ঃ

১। অমুসলিমদের কাছে কোরাণ বিক্রয় নিষিদ্ধ (শাফি'ই আইন নং k.1.2.e)। এ-আইন লঙ্ঘন করে সুরা ওয়াক্বেয়া, আয়াত ৭৯ – "পাক-পবিত্র ছাড়া আর কেউ একে স্পর্শ করবে না।" এতে মুসলিম-অমুসলিম কিছু বলা হয়নি কারণ কোরাণ তো এসেছেই অমুসলিমদেরকে মুসলিম বানানোর জন্য। ও-আইন প্রয়োগ হলে ভাই গিরিশচন্দ্র কোরাণের প্রথম বাংলা অনুবাদ করতে পারতেন না, নবীজীর প্রশংসা করতে পারতেন না ডঃ রাধাকৃষ্ণ, গান্ধিজী, গুরু নানক থেকে শুরু করে ডঃ মরিস বুকাইলি, ডঃ কেনেথ মূর, বার্ট্রাণ্ড রাসেল, মাইকেল হার্টজ প্রমুখ অসংখ্য পশ্চিমা দার্শনিক বিশেষজ্ঞগণ। হানাফি আইনে অমুসলিমদের কাছে কোরাণ বিক্রয় বৈধ।

২। যদি দৈহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে চারজন বয়স্ক মুসলমানের চাক্ষুষ প্রমাণ না থাকে তাহলে সন্তানধারণ করলে মালিকি আইনে কুমারীকে চাবুক ও বিধবাকে পরকীয়ার অপরাধে প্রস্ত রাঘাতে মৃত্যুদণ্ড হয়। কিন্তু হানাফি আইনে তারা বেকসুর খালাস পায় – (বি-ই-আ ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৯ এবং পেনাল ল' অব্ ইসলাম পৃঃ ৭১)। আল্লার আইনে এমন হয় না।

৩। অবিবাহিতদের পরকীয়ার জন্য চাবুকের শাস্তি। সেই পরকীয়াতে কন্যা জন্মালে তাকে সেই পিতা হানাফি আইনে বিয়ে করতে পারবে না কিন্তু শাফি' আইনে পারবে (প্রিন্সিপল্‌স্ অব্ ইসলামিক জুরিস্প্রুডেন্স – ডঃ হাশিম কামালি, পৃঃ ২৯।

৪। বিবাহিতা নারী পরকীয়া করলে হানাফি আইনে আজীবন কারাবাস, কিন্তু হাম্বলি, শাফি' ও মালিকি আইনে মৃত্যুদণ্ড।

৫। হানাফি আইনে নারী-মুরতাদের আজীবন কারাবাস কিন্তু হাম্বলি, শাফি' ও মালিকি আইনে মৃত্যুদণ্ড।

৬। সাক্ষী থাকুক বা না থাকুক গোপন বিবাহ মালিকি শারিয়ায় অবৈধ, কিন্তু সাক্ষী থাকলে অন্য মজহাবে বৈধ। সূত্র ঃ বিশ্ব-শারিয়াদলের বর্তমান প্রধান নেতা ডঃ ইউসুফ কারজাভি – http://memri.org/bin/articles.cg?Page=archives&Area=ia&ID=IA29106 (Inquiry and Analyses Series – No. 291)

৭। কোনো অবিবাহিত বা অবিবাহিতা পরকীয়ার শাস্তির পর তওবা করলে অন্যান্য মামলায় শাফি' আইনে তার সাক্ষ্য নেয়া যাবে, কিন্তু হানাফি আইনে নেয়া যাবে না" ("মুসলিম জুরিস্প্রুডেন্স অ্যাণ্ড কুরাণিক ল' অফ ক্রাইম্‌স্" পৃঃ ১৪৬)।

৮। কেউ অন্যায় অপবাদ দিয়ে শাস্তি পাবার পর তওবার পরে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য (শাফি'-মালিকি-হাম্বলি আইন)। কিন্তু হানাফি আইনে নয় – (বি-ই-আ ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮২৫)।

৯। বোবার সাক্ষ্য স্পষ্ট হলেও হানাফি, শাফি' ও হাম্বলি আইনে গ্রহণযোগ্য নয়, তবে মালিকি আইনে গ্রহণযোগ্য – (বিধিবদ্ধ ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৩)।

১০।হানাফি আইনের সাথে অন্যান্য আইনের বহু বিরোধের অন্যতম কারণ হলো ঃ "হানাফি মতে মুহসান হওয়ার জন্য মুসলমান হওয়া অন্যতম শর্ত, কিন্তু অন্যান্য আইনে তা নয়" (বিধিবদ্ধ ৩য় খণ্ড পৃঃ ৩৭০)।

১১।রাষ্ট্রদ্রোহীতার শাস্তি বাকি সব আইনে মৃত্যুদণ্ড কিন্তু হানাফি আইনে আজীবন কারাগার – ডঃ হাশিম কামালি, পৃঃ ৩০।

১২।ইমাম আবু হানিফা প্রস্তাব করেছিলেন মানুষ মাতৃভাষায় নামাজ পড়ুক। পরে শারিয়াপন্থীদের চাপে তিনি এ প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন – ডঃ হাশিম কামালি, পৃঃ ১৯।

১৩।কোনো অমুসলিমকে খুনের অপরাধে কোন মুসলিমের প্রাণদণ্ড হবে না – পেনাল ল' অব্ ইসলাম, পৃঃ ১৪৯। মওলানা আজিজুল হকের অনুদিত বোখারি ৫ম খণ্ড ৫৩৮ পৃষ্ঠায় আছে হাদিস নং ১০২১ – জিম্মিকে খুন করলে বেহেশ্‌তের গন্ধও পাবে না। (এ বইটা আপাততঃ হাতের কাছে নেই বলে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল না)।

১৪।মৃতের সৎ মা সম্পত্তির অংশ পাবে না, কিন্তু সৎ ভাই-বোন অংশ পাবে – বিধিবদ্ধ ১ম খণ্ড ধারা ৪১৮ ও ৪২৩।

১৫।ঠাট্টায়, নেশার ঘোরে বা চাপের মুখে স্বামী তালাক দিলে হানাফি আইনে বৈধ কিন্তু শাফি' আইনে অবৈধ – ইসলামিক ল' – পৃঃ ১৭৪।

১৬।পরস্পরের ব্যাপারে অমুসলিম জিম্মিদের সাক্ষ্য হানাফি আইনে গ্রহণযোগ্য কিন্তু শাফি ও মালিকি আইনে নয় – হানাফি আইন হেদায়া পৃষ্ঠা ৩৬৩, বিধিবদ্ধ

ইসলামি আইন ২য় খণ্ড আইন নং ৫৭৬।
১৭।স্বামীকে কেউ জোর করে বা ভয় দেখিয়ে স্ত্রী-তালাকে বাধ্য করলে সে তালাক হানাফি আইনে বৈধ কিন্তু মালিকি, শাফি' ও হাম্বলি আইনে অবৈধ – (বি-আ-ই ১ম খণ্ড ধারা ৩৪৯ – বিশ্লেষণ)।
১৮।স্বামীর মাথা খারাপের রোগ হলে শারিয়া কোর্টে স্ত্রী'র বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন করার অধিকার হানাফি আইনে নাই কিন্তু মালিকি, শাফি' ও হাম্বলি আইনে আছে – (বি-আ-ই ১ম খণ্ড ধারা ৩৬৫ – বিশ্লেষণ)।
১৯।ইশতিহশান নিয়ে হানাফি ও শাফিদের দ্বন্দ্ব সুবিদিত – প্রিন্সিপল্স্ অফ্ ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স – ডঃ হাশিম কামালী, পৃঃ ৩৩৯
২০।একই বিষয়ে শারিয়া-ইমামদের প্রবল মতভেদের বহু উদাহরণ দেখুন বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬৬-৩৭২।

এই যে বিরোধ ও বিভ্রান্তি, এটা কেন হচ্ছে ? নারী-বিরোধী পুরুষতন্ত্র ও ক্ষমতার লড়াইয়ের রক্তাক্ত ষড়যন্ত্র ছাড়াও এর আরেক কারণ হল কোরাণের কোন্ আয়াত কখন কিজন্য এসেছিল তা আমরা হয় জানছি না অথবা মানছি না। এ-ব্যাপারে আদি যুগে দু'টো কেতাব লেখা হয়েছিল নবীজীর প্রায় দেড়শ' বছর পরে, ইবনে হিশাম ইবনে ইশাক ও তারিখ আল্ তাবারি। অন্য এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল আমরা হারিয়েছি বলে সমস্যাটা আরো বেড়েছে। উদ্ধৃতি দিচ্ছি হাদিস আল্ কাফি থেকে ঃ
"পয়গম্বর (সাঃ)-এর মৃত্যুর পরে হজরত আলী প্রতিজ্ঞা করিলেন কোরাণের সঙ্কলন না করা পর্যন্ত তিনি ঘরের বাহিরে যাইবেন না। তাঁহার সঙ্কলিত কোরাণে বিভিন্ন আয়াত সম্বন্ধে স্বয়ং নবীজীর মতামত ছিল। ইহাতে কোন্ আয়াতের পর কোন্ আয়াত আসিয়াছে, কোন্ ঘটনায় কখন কাহার উপর আসিয়াছে ইত্যাদির বিবরণ ছিল। এইগুলি ব্যতীত তাঁহার সঙ্কলনটি আয়াতের দিক দিয়া মুসলিম বিশ্বে প্রচারিত কোরাণের মতই। সঙ্কলনের পরে তিনি শাসকদের সামনে তাহা পেশ করেন। কিন্তু শাসকেরা তাহা গ্রহণ করেন নাই" (হাদিস আল্ কাফি ১ম খণ্ড, আল্ উসুল ২য় পর্ব, অধ্যায় ৪-এর ২, পৃষ্ঠা ১৭৫-১৭৭)।

যেখানে এত স্ববিরোধীতা, যেখানে কোন কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ নেই, যেখানে কেউ কারো কথা শোনে না, যেখানে বিভিন্ন দলের মওলানারা পরস্পরকে কাফের-মুনাফেক বলে ঘোষণা করেন, যেখানে কোরাণের আয়াতগুলোর বিভিন্ন অর্থ সম্ভব, যেখানে কোরাণের নির্দেশের প্রত্যেকটিতে মুসলমান দার্শনিকদের ভেতরেই মতভেদ আছে তা দিয়ে "সর্বসম্মত" আইন বানানো যায় না। আর সর্বসম্মত না হলে কোন আইনই আল্লা-রসুলের নামে জাতির ঘাড়ে চাপানো যায় না। মানুষের জীবন ও বিশ্বাস কারো খেলার পুতুল নয়॥

শারিয়া কি এখন অচল ?

মোটেই নয়। কোরাণে শারিয়া শব্দের অর্থ হল মূল্যবোধ। মূল্যবোধ কি কখনো অচল হয় ? "পিতা-মাতাকে ভক্তি করিও" কিংবা "সুবিচার কর, এটাই আল্লাহ'র অধিক নিকটবর্তী" (সুরা মায়েদা ৮), এ-কথা কি অচল হয় কখনো ? হয় না, বরং ওটাই মানুষকে মানুষ বানায়। কিন্তু এক দেশে এক যুগের এক সমাজের অনেক আইন অন্য দেশে অন্য যুগের অন্য সমাজে অচল হবেই। সেজন্যই বুঝি বাস্তববাদী ইমাম তাইমিয়া বলেছিলেন ঃ "মুসলিম-বিশ্বে একটি চিরন্তন আইনব্যবস্থা বাস্তবভিত্তিকও নয়, সম্ভবও নয়" ("দ্য পলিটিক্যাল থট অফ ইবনে তাইমিয়া, পৃঃ ১০৬ – প্রফেসর কামরুদ্দীন খান – আদম প্রকাশনী, দিল্লী)। অবস্থার পরিবর্তনের সাথে বিধানের পরিবর্তন হতেই হবে। এ-পরিবর্তনের স্বীকৃতি দেয়া আছে খোদ কোরাণেই ঃ "আমি কোন আয়াত রহিত করিলে কিংবা ভুলাইয়া দিলে তাহা অপেক্ষা উত্তম অথবা সমপর্যায়ের আয়াত আনি" (বাকারা ১০৬), "যখন আমি এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত উপস্থিত করি এবং আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করেন তাহা তিনিই ভাল জানেন" (নাহ্‌ল ১০১)। একে বলে নস্‌খ্‌।

বিশেষজ্ঞ বলছেন ঃ "নস্‌খ্‌-এর উপলব্ধি আসিয়াছে মানুষের উপকারের জন্য সমাজের বিদ্যমান পটভূমি ও আইনের সমন্বয় করার প্রয়োজন হইতেই" (প্রিন্সিপল্‌স্‌ অব্‌ ইসলামিক জুরিস্প্রুডেন্স – ডঃ হাশিম কামালি, পৃঃ ২০৩)। তিনি এ-ও বলেছেন ঃ "কোরাণ ধীরে ধীরে ক্রমাগত ২৩ বছর ধরিয়া নাজিল হইয়াছিল, এ-সত্য ইহাই প্রমাণ করে যে কোরাণ সেই সময়ের পরিবর্তনগুলিকে গণনায় ধরিয়াছিল" পৃষ্ঠা ৫০৪। ঠিকই তো, নাহলে তো কোরাণ একদিনেই নাজিল হতে পারত। সমাজের বর্তমান পরিস্থিতিকে গণনায় ধরতেই হবে এটা কোরাণেরই নির্দেশ। আইন বানাবার ক্ষেত্রে সেটা হয়নি বলেই আজ মুসলিম সমাজে বহু বিপর্যয়। আমাদের দিব্যদৃষ্ট বাউলও কি সুন্দর গেয়ে গেছেন ঃ "দেশ সমস্যা অনুসারে, ভিন্ন বিধান হতে পারে" (লালন শাহ্‌)। ২০০৩ সালে পাকিস্তানের সরকারি কমিটিও রিপোর্টে বলেছে "ইহা অতি পুরানো কাপড়ের মত। ইহাকে সোজা করিতে গেলে ছিঁড়িয়া যাইবে" (পাকিস্তানের জাতীয় কমিশন রিপোর্ট)। পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত শারিয়া-সমর্থক বিশেষজ্ঞের দলও পইপই করে বিশ্ব-মুসলিমকে সাবধান করে বলেছেন শারিয়ায় মহা সমস্যা আছে, সেগুলো ঠিক না করা পর্যন্ত যেন শারিয়া আইন প্রয়োগ করা না হয়। উদ্ধৃতির সারাংশ দিচ্ছি তাঁদের বই থেকেই।

"শারিয়াকে এ-যুগে চালাইতে হইলে অবশ্যই যে প্রচণ্ড ঘষামাজা করিতে হইবে সে-ব্যাপারে আমি সবাইকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি...সেই যুগে যে উদ্দেশ্যে শারিয়ার উসুল বানানো হইয়াছিল, অনেক কারণেই এখন উহা সেই উদ্দেশ্য অর্জন করিতে সক্ষম নহে...শারিয়ার উসুল নিজের পদ্ধতি ও তত্ত্বের ভেতর সমাজের স্থান-কালের ব্যাপারকে ঠিকমত অন্তর্ভুক্ত করে নাই" (প্রিন্সিপল্‌স্‌ অব্‌ ইসলামিক জুরিস্প্রুডেন্স – ডঃ হাশিম কামালি, পৃঃ ১৩, ৫০০, ৫০৪)।

"শারিয়ায় সেই সমাজ প্রতিফলিত যে-সমাজে শারিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল...বর্তমান মানুষের বাস্তব প্রয়োজন মিটাইতে পারে নাই...শাফি'র পরে শারিয়া ধীরে ধীরে মানুষের প্রয়োজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে" (ইমাম শফি'র রিসালা, পৃঃ ১, ৩ ও ৩৪৪)।

"কোরাণের বিধানগুলো হইতে বোঝা যায় যে, বিধানগুলো নাজিল হইয়াছিল যখন কোন সামাজিক, নৈতিক বা ধর্মীয় দরকার হইয়াছিল, কিংবা যখন সাহাবীরা নবীজীর সাথে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন" (শারিয়া দি ইসলামিক ল' – ডঃ আবদুর রহমান ডোই, পৃঃ ৭)। বলা বাহুল্য, এ-ধরনের উদাহরণ আছে মাত্র কয়েকটা, যা দিয়ে একটা দেশ চলতে পারে না।

"সমস্যা তখনই হয় যখন (শারিয়ার) অতীতের প্রয়োজনকে এখনকার রাজনৈতিক ব্যাখ্যায় প্রয়োগ করা হয়" (দি ইসলামিক রুট্‌স্‌ অব্‌ ডেমোক্র্যাটিক প্লুরালিজ্‌ম্‌, পৃঃ ৫৭) – ডঃ আবদুল আজিজ সাচেদিনা, বিশ্বের সর্বোচ্চ ইসলামি বিশেষজ্ঞদের একজন, অতীতে বর্তমানে এঁদের কথার সত্যতা প্রমাণ হয়েছে অসংখ্য বাস্তব ঘটনার মধ্য দিয়ে।

"সমাজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করিয়া সঙ্কীর্ণ মনের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কোরাণের আয়াতকে ব্যবহার করাও ইসলামি নহে" (হিউম্যান রাইট্‌স্‌ ইন্‌ দ্য মুসলিম ওয়ার্লড – ডঃ মায়মুল আহসান খান, পৃঃ ৫৮)।

যে কোনো সমাজবিজ্ঞানীর গবেষণায় সমাজের পরিস্থিতির কথাটা বারবার ফিরে আসে। মওলানা মুহিউদ্দিনের বাংলা কোরাণের ৩৩৪ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত বলা আছে, সমাজ পরিবর্তনের সাথে "শাখাগত বিধিবিধান পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে।" আসলে শারিয়া ও আচার-অনুষ্ঠান দু'টোই বিবর্তিত হচ্ছে। শুরুতে জাকাত ছিল রাষ্ট্রের পাওনা, এখন সেটা গরিবদের। হজ্বের সময় পাথর মারার পদ্ধতি বদলে গেছে সম্প্রতি। রক্তমূল্যের পরিমাণ নবীজী যা ধার্য করেছিলেন তা এখন আর নেই। মাবিয়া মক্কা-মদীনায় এসে বলেছিল – "নবীজীর সময়ের অনেক কিছু এখন আর চলে না," মুসলমানরা তা মেনেও নিয়েছিল। (হজরত ওসমানের সময়) মুসলমানেরা জামাতে নামাজ পড়া ছাড়া অনেক ভাল কাজ করা ছেড়ে দিয়েছে – বোখারি ১ম খণ্ড হাদিস ৬২২। তামাত্তু হজ্বের পদ্ধতিও বদলে গেছে তখনই

(বোখারি ২য় খণ্ড হাদিস ৬৩৪)। বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শারিয়া-নেতা মুহম্মদ আবদুহ্ এখন শারিয়ার অনেক আইন বদলাবার প্রস্তাব করেছেন। এমনকি সম্প্রতি সোমালিয়ার বিজয়ী সামরিক নেতা ও ইমাম স্পষ্টই বলেছেন শারিয়ার আইন বদলানো হবে (টাইম অন্ লাইন ২২ নভেম্বর, ২০০৬)। অপরাধের বিবর্তন হয় বলে শাস্তিরও বিবর্তন হতে হবে, নাহলে অপরাধীরা শাস্তি পাবে না। ভেবে দেখুন, আগের আমলের চুরি আর এখনকার চুরি কি এক জিনিস ? যারা আজ ব্যাঙ্ক থেকে কোটি কোটি টাকা ধার নিয়ে কখনোই শোধ দেয় না, কিংবা যে শেয়ার-ব্যবসায়ী কোলকাতায় বসে বাংলাদেশের হাজার হাজার মানুষের লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিল, তারা কি চোর ? না হলে, কেন নয় ? চোর হলে তাদের কি হাত কাটার শাস্তি হবে ? না হলে, কেন হবে না ?

এগুলো গুরুতর প্রশ্ন। কাজেই সামাজিক বিবর্তনকে উপেক্ষা করা যায় না, কোরাণ-রসুল তা করেনও নি। এমনকি মওদুদিও সে কথা বলেছেন। মুসলিম খলীফারা তাঁদের মন্ত্রীদেরকে নিজেরাই মনোনীত করতেন, মন্ত্রীরা কেউ জনগণের নির্বাচিত হতো না। মওদুদির সময়ে এ-পদ্ধতির বিরুদ্ধে সমালোচনা হলে তিনি সে সমালোচনাকে পাত্তা দেননি এই বলে ঃ "তৎকালীন বিদ্যমান পরিস্থিতি উপেক্ষা করিয়া ঐ সময়ের ঘটনাকে বর্তমানের আলোকে দেখিবার জন্যই এই ভুল হইয়াছে" (ইসলামিক ল' অ্যাণ্ড কন্সটিটিউশন, পৃঃ ২৩৬)। মওদুদির কথাটা সত্যি, অথচ সেই মওদুদিই শারিয়া সমর্থন করতে গিয়ে চরমভাবে কোরাণ-সুন্নতের "তৎকালীন বিদ্যমান পরিস্থিতি" উপেক্ষা করেছেন। তাঁর প্রচণ্ড আতঙ্ক ছিল, জনগণ যদি টের পায় শারিয়ায় একটা হলেও কোরাণ-বিরোধী আইন আছে তবে তারা শারিয়ায় অন্যান্য কোরাণ-বিরোধী ও মানবতা-বিরোধী আইন খুঁজে বের করে ফেলবে। তাতে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হয়ে পড়বে। এ-কথা তিনি বলেছেনও তাঁর "ইসলামি আইনে মুরতাদের সাজা" বইতে।

আসলে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে হজরত ওমরের কাছ থেকে। এমনকি, "হজরত ওমর বাকী সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে হাদিস ২০৩কে বলবৎ করেন ও হাদিস ২০৪, ২০৫ ও ২০৬কে রহিত করেন" – আজিজুল হকের বোখারীর অনুবাদ ১ম খণ্ড পৃঃ ১৯৭-এ থাকার কথা)। তিনি দুর্ভিক্ষের সময় চোরের হাত কাটেননি এবং এক অসুমলিম গোত্রের কাছ থেকে জিজিয়া নেননি। তিনি কি তাহলে কোরাণ লঙ্ঘন করেছিলেন ? আক্ষরিক দিক দিয়ে করেছিলেনই তো, কারণ কোরাণে স্পষ্ট লেখা আছে চোরের হাত কেটে দিতে এবং অমুসলিম নাগরিকদের কাছ থেকে জিজিয়া কর নিতে। কিন্তু কোরাণের অক্ষর অতিক্রম করে তিনি বজায় রেখেছিলেন কোরাণের মর্মবাণী। বাস্তবের সাথে এই সামঞ্জস্য ইসলামের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। আইনে আমরা এটাই প্রতিফলিত দেখতে চাই। এটাই আমরা আশা করি আমাদের বর্তমান শারিয়াবিদদের কাছ থেকে। কাজটা হচ্ছেও, দেখুন ঃ

"পৃথিবীতে ফৌজদারি আইনের সর্বোচ্চ বিশেষজ্ঞদের একজন পেনসিলভেনিয়া ল' স্কুলের প্রফেসর ডঃ পল এইচ. রবিনসন মালদ্বীপের জন্য নূতন আইনের খসড়া করিতেছেন।...যেহেতু গঠনতন্ত্র অনুযায়ী মালদ্বীপ একটি ইসলামি রাষ্ট্র এবং আইনগতভাবে সকল নাগরিকই মুসলিম, তাই এই আইন হইবে পৃথিবীর প্রথম শারিয়া-ভিত্তিক আধুনিক ফৌজদারি আইন" (২৪ জুলাই – ২০০৫ frontagemag.com)। এমন অনেক উদাহরণ এ বইতে দেয়া আছে ॥

শারিয়া কি অপরিবর্তনীয় ?

বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ১ম খণ্ডে আছে ঃ "তাঁহারা (ইমাম আবু হানিফা ও তাঁহার সহচরবৃন্দ) কেবল সমকালে উদ্ভূত সমস্যার আইনগত সমাধান পেশ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বরং ভবিষ্যতে কি ধরনের সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে এবং তাহার সমাধানই বা কি হইতে পারে তাহাও তাঁহারা গবেষণা করিয়া স্থির করিয়া উহার আইনগত সমাধান নির্ণয় করিয়াছেন" (বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ৮)।

সম্ভব ?

না, সম্ভব নয়। দু'শো, পাঁচশ', দশ হাজার, ত্রিশ লক্ষ এবং পঞ্চাশ কোটি বছর পরের বিশ্বব্যাপী তাবৎ মুসলিম সমাজের তাবৎ সমস্যার সমাধান দিতে পারে না কেউ। তাছাড়া, এ-কথা ঠিক হলে ইজমা, কেয়াস, রাই, ইস্তিসান, ইস্তিসলাহ ইত্যাদির কি হবে ? শ্লোকেও বলে, "পুরুষস্য ভাগ্যম্ দেবা ন' জানন্তি, কু'তো মনুষ্যাঃ" ('স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম'টা বাদ দিচ্ছি, ওতে মা-বোনদের প্রতি কুৎসিৎ শ্লেষ আছে)। অর্থাৎ দেবতারাও ভবিষ্যৎ জানে না মানুষ তো কোন্ ছার। আমরা চাই আমাদের শারিয়া-পণ্ডিতেরা কোরাণ-সুন্নতের আলোকে নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি খাটিয়ে যুগোপযোগী মুসলিম-আইন বানাবেন। কিন্তু তাঁরা তা না করে মরণপণ ছুটেছেন লক্ষ লক্ষ পৃষ্ঠা ঘেঁটে হাজার বছর আগে কে কি করেছেন তা বের করে তার ফটোকপি আজকের সমাজে প্রয়োগ করতে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মত বিশাল বিপুল ঘটনা বিশ্ব-ইতিহাসে কমই আছে। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতার লড়াইয়ের মধ্যে পড়ে মাত্র ৩৫ বছরে সে-ইতিহাস, সে-দলিলের যা হাল হয়েছে তাতে আগামী প্রজন্মের পক্ষে নিজেদেরই এত বড় গৌরব সম্বন্ধে বস্তুনিষ্ঠ সত্য পাওয়া অসম্ভব হয়ে গেছে। একই কথা খাটে মুসলিম খেলাফত সম্বন্ধেও – জনকয়েক জ্ঞানী খলীফা ছাড়া ১৪০০ বছরের সে দীর্ঘ ইতিহাস মুসলমানের হাতে অসংখ্য মুসলমানের ষড়যন্ত্র, ক্রমাগত গৃহযুদ্ধ ও গণহত্যায় পরিপূর্ণ। মুসলিম ইতিহাসে আমরা কমপক্ষে ২০টি রাজতন্ত্র দেখি 'ইসলামের খলিফা' হিসেবে, পরস্পরের সাথে ক্ষমতার লড়াইয়ের কামড়াকামড়ি করতে। সেই ষড়যন্ত্র, সেই ক্ষমতার লড়াইয়ে কোন্ দলিলের কি হাল হয়েছে তা আজ বলা সম্ভব নয়। আর, চিরকালের ভবিষ্যতের জ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের কোরাণ কি বলছে ? বলছে – যুক্তির কথা, সাধারণ জ্ঞানের কথা।

- সুরা হুদ ৩১ ঃ হজরত নূহ – "এ কথাও বলি না যে আমি গায়েবী খবরও জানি।"
- সুরা আরাফ ১৮৮ ঃ খোদ নবীজী – "আমি যদি গায়েবের কথা জানিয়া লইতে পারিতাম তাহা হইলে বহু মঙ্গল অর্জন করিতে পারিতাম।"
- সুরা আন-নমল ৬৫ ঃ "বলুন, আল্লাহ ব্যতীত নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে কেউ গায়েবের খবর জানে না।"
- সুরা লোকমান ৩৪ ঃ "কেউ জানে না আগামী কল্য সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন দেশে সে মৃত্যুবরণ করবে।"

হলো ? 'আলীমুল গায়েব' (অজানার জ্ঞানী) আমরা বলি আল্লাহ্কে, কোন মানুষকে নয়। স্বয়ং নবীজী বলেছেন "আগামী কাল আমার কি হবে আমি জানি না"- আহক্বাফ ৯। এর ব্যাখ্যায় মওদুদি এটা সমর্থনও করেছেন ঃ "আমি অদৃশ্য কিছু জানি না যে দুনিয়ার সবকিছু জানিব কিংবা অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যতের সবকিছু বলিতে পারিব। তোমাদের ভবিষ্যৎ দূরের কথা আমি আমার নিজের ভবিষ্যৎও জানি না" – ওয়েবসাইট তাফহিমুল কুরাণ।

ক্যানাডার সম্মানিত ও বিখ্যাত ইমাম শেখ আহমেদ কুট্টি বলেছেনঃ http://www.al-islamforall.org/Misc/islamonm.htm – (সহি বোখারী ঃ ডঃ মহসীন খান - ভল্যুম ৭ হাদিস নং ৭৭) "এক বিবাহ অনুষ্ঠানে যখন বালিকারা গাহিতেছিল 'আমাদের মধ্যে এক রসুল আছেন যিনি জানেন আগামীকাল কি ঘটিবে' তখন তিনি তাহাদিগকে থামাইয়া বলিয়াছেন 'এই বাক্যটি বাদ দাও এবং গাহিতে থাক।'" হাদিসেও আমরা একই তথ্য পাই – "এখন আমি যাহা জানি তাহা যদি আগে জানিতাম..." (সহি ইবনে মাজাহ ৪র্থ খণ্ড ৩০৭৪)।

কেউ কেউ বলেন, শারিয়া বানাবার জন্য ভবিষ্যতের ইলহাম আল্লাহ্ শারিয়া-ইমামদের দিয়েছেন। কিন্তু "যেহেতু ইলহাম শুধুমাত্র মনের চিন্তা, তাই ইহাতে অন্যকছুর মিশ্রণ বা ভুল থাকিতে পারে। কাজেই ইলহাম কোন আইন বা পদ্ধতির ভিত্তি হইতে পারে না" (ইমাম শাফি'র শারিয়া কেতাব "উমদাত্ আল সালিক" পৃঃ ১০১৮)। আর, ইলহাম পাওয়াটা তো চোখে দেখা যায় না, তাই বাস-ট্রেনের "তারা মার্কা কৃমি-রাক্ষসী"র বিক্রেতার মত কে কি মতলবে কি ইলহাম দাবি করছে তা বলা বড্ড মুশকিল। আমাদের বরিশাল-ভোলার প্রিন্সিপ্যাল আলহাজ্জ মৌঃ সুফী হাবিবুর রহমান সাহেব এম.এ. ১৯৪৮ সালের ১৮ই জুন শুক্রবার রাতে স্বপ্নে আল্লাহকে পালকি চড়তে দেখেছেন (হাকীকত-খনি পৃঃ ১৩৪)। এধরনের ভয়াবহ সম্ভাবনা বুঝেই ইমাম শাফি আমাদের ওপরের হুঁশিয়ারিটা দিয়ে গেছেন। তাছাড়া শারিয়ার ক্ষেত্রে আমরা তো এক-আধটা ইলহামের কথা বলছি না, অনন্ত ভবিষ্যতের অন্তহীন সমাজের অসংখ্য ঘটনা-অপরাধের কথা বলছি। তেমন অনন্ত অসীম ইলহাম একেবারেই অবাস্তব।

ঠিক সেজন্যই কোরাণ থেকে মূল্যবোধ নিয়ে শারিয়াকে পরিবর্তিত হতে হবে যুগের সাথে। বহু ইসলামি নেতা এ-কথা বলা শুরু করেছেন, বিশ্ববিখ্যাত হাসান তোরাবী তাঁদের একজন। তিনি বলেন, "লোকে ভ্রান্তভাবে মনে করে শারিয়া হল আইন। কিন্তু আসলে শারিয়া হল জীবন-পদ্ধতি" – সুদান ট্রিবিউন ০৬ জুন, ২০০৬ ॥

ইসলামের নামে ইসলাম লঙ্ঘনের পদ্ধতি

এবারে আমি আপনাদের একটু গভীরে নিয়ে যাবো। ধর্মকে অপব্যবহার করার কিছু সূক্ষ্ম পদ্ধতি আছে যা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না, পারার কথাও নয়। এই রকম পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে নারী-অধিকার হরণের জন্যও। এ দলিলগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারব কোরাণ কিভাবে দাসপ্রথা উচ্ছেদের প্রাথমিক পদক্ষেপ নিয়েছিল এবং পরিণামে সম্পূর্ণ উচ্ছেদের পথনির্দেশ করেছিল। তারপরে কিভাবে ক্ষমতাশালীরা ওই ইসলামের নামেই নানারকম শারিয়া আইন ও হাদিস বানিয়ে ধূর্তভাবে দাসপ্রথাকে আবার সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল।

নবীজীর পর বহু শতাব্দী ধরে বহু দেশ বিজয়ের ফলে মুসলমানরা অসংখ্য দাস-দাসীর মালিক হয়েছিল। হাকিম বিন হাজাম একাই মুক্ত করেছিলেন ২০০ জনকে (সূত্র ৫)। মাত্র সাতজন সাহাবী মুক্ত করেছিলেন ৩৯,২৫৯ জন দাস-দাসীকে (সূত্র ৪)। কিন্তু এই শতাব্দী-প্রাচীন শক্ত কুপ্রথাকে কোরাণ হঠাৎ একদিন বিপ্লব করে উচ্ছেদ করেনি। কারণ তাতে ভেঙে পড়ত সমাজের অর্থনীতি, মানুষ হয়ে পড়ত দ্বিধাগ্রস্ত-উদ্ভ্রান্ত আর হাজার হাজার দাস-দাসী হয়ে পড়ত নিরাশ্রয় অন্নহীন। কোরাণ রসুল ভাল করেই জানতেন জনগণ যদি মনের দিক থেকে তৈরি না হয় তবে যে কোনো ভাল জিনিসও জোর করে চাপিয়ে দিলে ফল খারাপ হতে বাধ্য। মূল্যবোধের দিক দিয়ে সে-জন্য সামাজিক বিবর্তনই ভাল। অতীত-বর্তমানে এর বহু উদাহরণ আছে।

দাসদের ওপরে অনিয়ন্ত্রিত অত্যাচার হত ইসলাম আসার আগে। কোরাণ সেটা উচ্ছেদ করতে ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে এগিয়েছে। যেহেতু যুদ্ধবন্দিনী হিসেবে এরা ছিল দাসী, তাই এদের সাথে শোয়া বিজয়ী মুসলিম-সৈন্যদের জন্য প্রথম দিকে জায়েজ ছিল (সূত্র ২২, ২৬, ২৯)। ডঃ আসগর আলী ইঞ্জিনিয়ার, আমীর আলি, হারুন ইয়াহিয়া প্রমুখ বিশেষজ্ঞরা দাবি করেন, দাসীর সাথে শোয়ার ব্যাপারটা বুঝবার ও অনুবাদের গোলমাল, কোরাণ কখনো একে অনুমতি দেয়নি। যাই হোক, যুদ্ধবন্দিনীদের দূর দেশে পাঠিয়ে দাসের হাটে বিক্রীও করা হত (সূত্র ২৩)। আমরা দেখি কোরাণ প্রথমে দাসদের সাথে দুর্ব্যবহার করা বন্ধ করেছে। তারপরে তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করেছে এবং সবশেষে দাসপ্রথার মূলে আঘাত করে পুরো উচ্ছেদের বিধান দিয়েছে সুরা মুহম্মদ আয়াত ৪-এ ঃ যুদ্ধবন্দিদের মুক্তি দাও পণ নিয়ে বা পণ ছাড়াই। কারণ যুদ্ধবন্দিই ছিল দাসপ্রথার শেকড়, ওটা বন্ধ হলে ধীরে ধীরে দাসপ্রথা উচ্ছেদ হতে বাধ্য। খেয়াল করলে দেখবেন দাসমুক্তির জন্য কোরাণ এতই উদ্বিগ্ন ছিল যে, যে-সব ব্যাপারের সাথে দাসপ্রথার কোনোই সম্পর্ক নেই সেগুলোকেও প্রয়োগ করেছে দাসমুক্তির জন্য। যেমন ঃ

১। সূর্য্য বা চন্দ্রগ্রহণ হলে দাস-দাসীদের মুক্তি দাও (সূত্র ১১)।
২। রমজানে রোজা না রাখলে বা রোজা রাখার প্রতিজ্ঞা ভাঙলে, ক্ষতিপূরণ হিসেবে দাস-দাসীদের মুক্তি দাও (সূত্র ২)।
৩। রোজা অবস্থায় হঠাৎ আল্লা-রসুলের প্রতি খারাপ কথা মুখ দিয়ে বের হয়ে গেলে দাস-দাসী মুক্তি দাও (সূত্র ২৫)।
৪। জাকাতের পয়সা দিয়ে দাস-দাসী কিনে তাদের মুক্তি দিতে পারো (সূত্র ২৭)।
৫। কোন গর্ভবতীকে আঘাত করে কেউ গর্ভপাত ঘটালে তাকে দাস-দাসী দিয়ে ক্ষতিপূরণের রায় দিতে পারে আদালত (সূত্র ৩)।
৬। ক্রীতদাসদের বলা হয়েছে 'ভাই', অর্থাৎ দাসীরা বোন। একই খাবার-পোশাক দিতে বলেছেন নবীজী, সাধ্যাতীত কাজ দিতে নিষেধ করেছেন, আরো অনেক ভালো কথা আছে (সূত্র ১৫)।
৭। দাসীদের মুক্ত করে বিয়ে করার চাপও দিয়েছে ইসলাম, একেবারে দ্বিগুণ সওয়াবের কথা বলে উদ্বুদ্ধ করেছে (সূত্র ১৪, ১৮, ১৯)। কিন্তু পরে দেখা গেল, কারো কাছে স্বাধীন নারীকে বিয়ে করার পয়সা থাকলে দাসীকে বিয়ে করা মাকরূহ করা হয়েছে (সূত্র ৮)।

যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মুসলিম ক্রীতদাসদেরই মুক্ত করার কথা বলেছে কোরাণ (সূত্র ৬), তবু সব মিলিয়ে মানবাধিকারের পথে সে আমলে এ-এক অসাধারণ বিপ্লব।

কিন্তু পরে ইসলামের এই মানবাধিকারকে সম্পূর্ণ উল্টে দেয়া হল। স্বার্থের জন্য দাস-ব্যবসা আবার প্রতিষ্ঠিত করা হল, ওই ইসলামের নামেই। দাস-দাসীর ওপরে এমন অনেক হাদিস আছে যেগুলো ওপরে দেখানো সূত্রের বিরোধী, স্বভাবতই সেগুলো স্বার্থের জন্য বানানো। আমরা মনে করি নবীজী কখনো বন্দিনীদের সাথে দুর্ব্যবহারের অনুমতি দেননি। কিন্তু দেখুন, তাঁর মৃত্যুর অনেক বছর পরে শারিয়ার এই আইন বানানো হয়েছে –"যুদ্ধবন্দিনী হওয়া মাত্র নারীদের পূর্বের বিবাহ বাতিল হইবে" (সূত্র ঝ)। বিয়ে বাতিলের মতলবটা হল, বিজয়ী সৈন্যেরা বলছে – "আমরা যুদ্ধের গণিমত হিসেবে প্রাপ্ত রমণীদের সাথে আজ্‌ল (নারী-দেহের বাইরে বীর্যপাত) করিতাম" (সূত্র ৭)। এমনকি, যুদ্ধজয়ের পরপরই কিছু সৈন্য বন্দিনীদের স্বামীদের সামনেই তাদের ধর্ষণ করত, – কিছু সৈন্য "তাহা পছন্দ করিত না"– সূত্র ৩২। এই করে নবীজীর নামে দাসী-সংসর্গকে বৈধ করা হয়েছে। যে হতভাগী দাসীগুলোর একই সাথে দুই, তিন, বা দশ-বারো জন মনিব ছিল, কিভাবে কাটত তাদের দিন-রাত ? দু'একটা নয়, ছয় ছয়টা হাদিসের দলিলে সহি বোখারী এবং হানাফি আইন বলছে দাসীদের একসাথে কয়েকজন মনিবের প্রথা ছিল এবং মনিবদের অধিকার ছিল তাদের পারস্পরিক সম্মতিতে ঐ দাসীদের সাথে শোয়ার (সূত্র

৯)। নবীজীর চোখের সামনে এ অনাচার হয়েছে তা আমরা বিশ্বাস করি না, এ-সব হাদিস নিশ্চয় পুরুষতন্ত্রের স্বার্থের জন্য পরে বানানো হয়েছে। কে জানে কত লক্ষ লক্ষ হতভাগী নিরপরাধিনীর জীবন-যৌবন শুধু এর-ওর-তার বিছানায় বিছানায় কেটেছে। কোন্ ধরনের ইসলাম এটা ? সূত্রের একটা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি, সহি বুখারী ভল্যুম ৩, হাদিস নং ৬৯৮ থেকে, এর সমর্থন আছে হাদিস ৬৯৭, ৬৯৯, ৭০১ ও ৭০২-তেও ঃ

"আল্লাহ'র নবী (দঃ) বলেছেন, যদি কেউ কোন এজমালি (যার অনেক মালিক আছে) দাস-দাসীকে নিজ অংশ থেকে মুক্ত করে এবং তার কাছে পুরো মুক্তি দেবার মত যথেষ্ট অর্থ থাকে তাহলে তার উচিত কোন ন্যায়পরায়ণ লোক দ্বারা সেই দাস-দাসীর উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ করা, এবং তার অংশীদারদের তাদের অংশের মূল্য দিয়ে সেই দাস-দাসীকে মুক্ত করে দেয়া। তা না হলে সে শুধু সেই দাস-দাসীকে আংশিক মুক্ত করল।" এর সাথে হানাফি আইনটা মিলিয়ে নিলে উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার হবে ঃ "অংশীদার (মালিকগণ) পরস্পরের সম্মতিক্রমে ক্রীতদাসীকে দৈহিকভাবে উপভোগ করিতে পারিবে" (সূত্র ১)। আশ্চর্য নয়, মুসলমানদের অমঙ্গল এসেছে তাদেরই আচরণ থেকেই (সূত্র ঃ ২৮)। আরো দেখুন ঃ

১। "দাসী (স্ত্রীর) গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে মালিকের গোলাম হয়" (সূত্র ১০)। বিয়ে করা দাসীর বাচ্চা-ই যদি গোলাম হয় তবে বিয়ে না-করা দাসীর বাচ্চারা তো গোলাম হবেই। এতে দাসপ্রথা কখনোই বন্ধ হবে না।

২। ট্যাক্স দেয়া বড্ড কষ্ট, চিরকাল মানুষ এটা ফাঁকি দিতে চেয়েছে। আর ফাঁকি দেবার পদ্ধতিটা হালাল হলে তো কথাই নেই। দেখুন, কিরকম আইন বানানো হয়েছে ঃ "অন্যান্য সম্পত্তির ওপরে জাকাত থাকলেও ক্রীতদাস-সম্পত্তির ওপরে জাকাত নেই" (সূত্র ১২)। অর্থাৎ দাস-ব্যবসায়ে টাকা খাটানোকে উৎসাহিত করে দাসপ্রথাকে শক্তিশালী করা হলো।

৩। ক্রীতদাস যদি মালিক ও আল্লাহকে ঠিকমত মেনে চলে তাহলে তার দ্বিগুণ সওয়াব হবে (সূত্র ১৩ ও ১৪)। অর্থাৎ মালিককে একেবারে আকাশে তুলে দাসের মনে আরও একটা শেকল পরানো হল, সে আর বিদ্রোহ করার কথা চিন্তাও করবে না।

৪। এটা একটা মারাত্মক কথা। এবং আরও অবিশ্বাস্য। এবং মর্মান্তিক। যদি কোন দাস বা দাসী তার মালিকের কাছ থেকে পালিয়ে যায় তবে ফিরে না আসা পর্যন্ত তার কোন ইবাদত কবুল হবে না (সূত্র ২১)। এই নিয়মে দাসপ্রথাকে একেবারে চরম শক্তিশালী করে তোলা হল। মালিকের ক্রমাগত অত্যাচারে দাসের প্রাণান্ত হতে পারে কিন্তু সে বিদ্রোহ তো দূরের কথা, জান নিয়ে পালাতেও পারবে না।

৫। এমনকি মুক্ত করে দেবার পরও দাস-দাসীরা প্রাক্তন মালিকের কাছে অদৃশ্য মালিকানায় বাঁধা থাকত, – অন্য কারো সাথে এমনকি বন্ধুত্ব করাও নিষেধ ছিল। করলে হুমকি ছিল তাদের কোনো ইবাদত কবুল হবে না – সূত্র ২০।

৬। মালিকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করলে তা অবৈধ, – সেটা ব্যভিচার হবে (সূত্র ৩৫)।

হাদিসে আছে ঃ "যেমনভাবে দাস-দাসীদের মার, তেমনভাবে কখনো স্ত্রীদের মারবে না। তারপর (অর্থাৎ স্ত্রীদের মারার পর) রাতে তাদের সাথে শোবে" (সূত্র ২৪)। আবারো বলছি, এ-সব হাদিস আমরা বিশ্বাস করি না, পরকীয়া ছাড়া স্ত্রী-প্রহারকে নবীজী কখনো বৈধতা দেননি (সূত্র ৩৩ ও ৩৪)। আর দাসীদের বিয়ে করাকে প্রথমে উৎসাহিত করা হলেও নবীজীর পরে আইন হয়েছে ঃ "হজরত ইমাম শাফেয়ী ও অন্যান্য ইমামের মতে ইহুদী বা খ্রীষ্টান দাসী বিয়ে করা সর্বাবস্থায় অবৈধ" (সূত্র ১৭)।

সারাংশ ঃ মোদ্দা কথাটা হল, কোরাণ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার পথ দেখিয়েছে কিন্তু কিছু মুসলমান বিভিন্ন আইন বানিয়ে কোরাণের নামে কোরাণ লঙ্ঘন করেছে। আজ আমরা যখন মুসলিম সমাজে হারিয়ে যাওয়া মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করি তখন কিছু শক্তিশালী শারিয়া-সমর্থক আমাদের মুরতাদ বলে খুন করার চেষ্টা করেন। যেমন, আমরা যখন বলি ইসলাম দাসপ্রথাকে প্রথমে কমিয়ে এনে পরে উচ্ছেদ করেছে তখন এক শারিয়া-সম্রাট বলেন আমরা নাকি মুরতাদ। তিনি বলেন ঃ "দাসপ্রথা ইসলামের অঙ্গ। দাসপ্রথা জিহাদের অংশ এবং ইসলাম যতদিন থাকিবে দাসপ্রথাও থাকিবে। যাহারা বলে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সাম্য আনিয়া ইসলাম দাসপ্রথাকে উচ্ছেদ করিয়াছে তাহারা অজ্ঞ, তাহারা কাফের" (ডঃ শেখ সালেহ্ আল্ ফওজান, সৌদী আরবের ধর্মীয় সংস্থা 'কেন্দ্রীয় বর্ষীয়ান ইমাম পরিষদ'-এর সদস্য, বিন সৌদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর, ধর্মীয় গবেষণা ও সিদ্ধান্ত কাউন্সিলের সদস্য, রিয়াদের প্রিন্স মিতায়েব মসজিদের ইমাম এবং সৌদি শিক্ষা-সিলেবাসের প্রধান রচয়িতা – সূত্র ১৬)। দুঃখের সাথে মওলানা মওদুদিকেও স্মরণ করতে হচ্ছে ঃ "ইসলামি আইন অনুসারে যুদ্ধবন্দির নিজের দেশ যদি মুক্তিপণ দেয় তবে বন্দিরা মুক্ত হইবে। বন্দি-বিনিময়ও চলিবে। এই দুই উপায় না থাকিলে যুদ্ধবন্দিরা দাস-এ পরিণত হইবে" (সূত্র ৩০)। মওদুদির এই অভিমত সরাসরি সুরা মুহম্মদ আয়াত ৪-এর বিরোধী যেখানে আল্লাহ বলছেন যুদ্ধবন্দিকে মুক্তিপণ নিয়ে বা না নিয়ে ছেড়ে দিতে।

আসলে কোরাণ-বিরোধী কর্মকাণ্ডের প্রমাণ আছে সাহাবীর এই কথায়, – "হে ভাতিজা ! তুমি তো অবগত নও রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর ইহকাল ত্যাগের পর আমরা কি কি বিপরীত কার্য্য করিয়াছি" – সূত্র ৩১। আমাদের দেশে কিছু মুসলমান এই ভয়াবহ তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে চান। জনগণকে বুঝিয়ে তাঁদের থামাতে হবে ॥

নিবন্ধ সূত্র ঃ

১। চ-এর পৃষ্ঠা ২৩১।
২। খ-এর আইন নং ১৬৬৯, ১৬৭৪, ১৬৮১, ইত্যাদি।
৩। গ-এর হাদিস নং ২৬৩০ এবং ২৬৩১।
৪। ক-এর পৃষ্ঠা ১২৫৭।
৫। ঘ-এর ভল্যুম ৩, হাদিস নং ৭১৫।
৬। সুরা নিসা, ৯২।
৭। গ-এর হাদিস নং ২৪৩৪ ও ২৪৩৫ ; ঘ-এর ৩য় খণ্ড, হাদিস ৭১৮ ও অন্যান্য।

৮। ক-এর পৃষ্ঠা ২৪২।
৯। ঘ-এর ভল্যুম ৩, হাদিস নং ৬৯৭, ৬৯৮, ৬৯৯, ৭০১, ৭০২, ৭০৩ ও ৭০৪।
১০। ক-এর পৃষ্ঠা ২৪২।
১১। ঘ-এর ভল্যুম ৩, হাদিস নং ৬৯৫ ও ৬৯৬।
১২। ঘ-এর ভল্যুম ২, হাদিস নং ৫৪২ ও ৫৪৩ এবং গ-এর হাদিস নং ১১০৮।
১৩। গ-এর হাদিস নং ২৩৮৮।
১৪। ঘ-এর ভল্যুম ৪, হাদিস নং ২৫৫।
১৫। গ-এর হাদিস নং ২৩৮৯ থেকে ২৩৯১-এর অংশ ও ২৬১৭।
১৬। সৌদি ইনফরমেশন এজেন্সি, ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট সৌদি নিউজ editor@arabiannews.org ৭ই নভেম্বর ২০০৩।
১৭। ক-এর পৃষ্ঠা ২৪২।
১৮। ঘ-এর ভল্যুম ৩, হাদিস নং ৭২০, ভল্যুম ৭, হাদিস নং ২০।
১৯। গ-এর হাদিস নং ২৩৮৬।
২০। ঘ-এর ভল্যুম ৩, হাদিস নং ৯৪ ও ভল্যুম ৪, হাদিস নং ৪০৪।
২১। ছ-এর পৃষ্ঠা ৩৭৭।
২২। সুরা আল মুমিনন, আয়াত ৫, ৬, ৭।
২৩। জ-এর ভল্যুম ৩, পৃষ্ঠা ১১২।
২৪। গ-এর হাদিস নং ২৪৬৮।
২৫। খ-এর আইন নং ১৬৭৫।
২৬। সুরা আল্-আহযাব, আয়াত ৫২।
২৭। খ-এর আইন নং ১৯৩৩ (৫)।
২৮। ক-এর পৃষ্ঠা ২৬৭।
২৯। সুরা আল্ মা'আরিজ, আয়াত ২৯, ৩০, ৩১।
৩০। মুনির কমিশনের সামনে মওদুদির বক্তব্য, পৃষ্ঠা ২২৫। http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=story_5-7-2005_pg3_2
৩১। ঞ-এর পৃষ্ঠা ২৯৭, হাদিস নং ১৫০৫।
৩২। ট-এর হাদিস নং ১১-এর ২১৫০।
৩৩। ঠ-এর পৃষ্ঠা ৮৫২, ধারা ১৩২২ – বিশ্লেষণ।
৩৪। ড-এর পৃষ্ঠা ১৭১।
৩৫। সহি আবু দাউদ, হাদিস ২০৭৩।
(ক) বাংলায় কোরাণ শরীফের অনুবাদ – মওলানা মুহিউদ্দীন খান।
(খ) ইসলামী আইন ঃ আয়াতুল্লাহ আল্ উজামা সৈয়দ আলী আল্ হুসায়নী আল্ সীস্তানী।
(গ) বাংলায় সহি বোখারীর সঙ্কলন ঃ মুহম্মদ আবদুল করিম খান।
(ঘ) সহি বোখারীর ইংরেজী অনুবাদ ঃ ডঃ মুহম্মদ মহসীন খান, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়।
(ঙ) হাদিস সঙ্কলনের ইতিহাস ঃ মওলানা মুহম্মদ আবদুর রহীম।
(চ) হানাফি আইন হেদায়া – ইংল্যাণ্ডের ব্যারিস্টারী স্কুলে পড়ানো হয়।
(ছ) রুহুল কোরাণ ঃ মওলানা আবদুদ দাইয়ান।
(জ) "ক্যাসাসুল আম্বিয়া"র অনুবাদ ঃ মওলানা বশিরুদ্দীন ও মওলানা বদিউল আলম।
(ঝ) উমদাত আল্ সালিক – ইমাম শাফি'র আইন নং o.9.13, পৃঃ ৬০৪।
(ঞ) সহি বোখারীর বাংলা অনুবাদ – মওলানা আজিজুল হক সাহেব।
(ট) সহি সুনান আবু দাউদ – ইন্টারনেট সংস্করণ।
(ঠ) বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ৩য় খণ্ড।
(ড) রিয়াদুস্ সালেহীন – আল্লামা ইমাম নববী।

ব্যাখ্যার ভয়াবহতা

ওপরে আমরা যা দেখলাম তা দেখলাম। তখন মুসলিম সৈন্যেরা শত শত বছর ধরে সিন্ধু থেকে স্পেন পর্যন্ত দেশের পর দেশ জয় করেছিল। বাপ-দাদার আমল থেকে যুদ্ধজয় দেখতে দেখতে কিছু ইমাম হয়ত মনে করতেন এভাবে যুদ্ধ করে সারা পৃথিবী জয় করে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতেই নবীজী ধরায় এসেছিলেন। তাই কিছু ইমাম ইসলামের ভয়ঙ্কর ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা আমি এখানে তুলে ধরব অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য কেতাব থেকে, - সুরা তওবা আয়াত ২৯ হল ঃ 'তোমরা যুদ্ধ কর আহ্‌লে-কিতাবের (ইহুদী-খ্রীষ্টান) ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ইমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রসুল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং সত্যধর্ম গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না তারা হাত জোড় করে জিজিয়া প্রদান করে।' 'তলোয়ার আয়াত' নামেই সুরা তওবা আয়াত ২৯ বিখ্যাত।

"তখন সমস্ত বাধ্যবাধকতা (অমুসলিমদের সাথে চুক্তি ইত্যাদি) বাতিল করিতে আল্লাহ সুরা তওবা-তে হুকুম জারি করিলেন। এবং আদেশ করিলেন যুদ্ধ করিতে সকল মুশরিকদের সহিত, এবং ইহুদী-খ্রীষ্টানদের সহিত, যদি তাহারা ইসলাম গ্রহণ না করে, অথবা স্বেচ্ছায় অপমানিতভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া জিজিয়া কর না দেয় যাহা সুরা তওবা আয়াত ২৯-এ নাজিল হইয়াছে। সুতরাং, পৌত্তলিক, ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাতিল করার বা সমঝোতায় আসিবার বা হিংস্রতা বাতিল করার অনুমতি মুসলমানদিগকে দেওয়া হইল না চিরকালের জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানেরা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শক্তি রাখে। সুতরাং ইহা স্পষ্ট যে, প্রথমে যুদ্ধ নিষিদ্ধ ছিল। তারপর যাহারা মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং যাহারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপাসনা করে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রথমে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হইল ও পরে যুদ্ধকে বাধ্যতামূলক করা হইল।"- সূত্র ঃ মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ মুহসিন খান-এর অনুদিত সহি বুখারী (অখণ্ড) পৃঃ ১০৮১।

ইসলামের এ-এক ভয়াবহ ব্যাখ্যা। বর্তমান বিশ্বের দিকপাল শারিয়া-সমর্থক ডঃ হাশিম কামালি এতে বিচলিত হয়ে বলেছেন ঃ "কোরাণের একশ'টির বেশি মূল্যবোধের আয়াত – যেমন দয়া, ক্ষমা, শান্তি, ন্যায়-ব্যবহার ও সহনশীলতাকে 'তলোয়ার আয়াত' বাতিল করিয়াছে বলিয়া দাবি করা হয়...ইহা হয়ত তখনকার সময়ে কাজে লাগিয়াছে যখন মুসলমানেরা পৃথিবীতে রাজনৈতিক-সামরিক শক্তিতে অনন্য ছিল। কিন্তু ইহা তখনো যথার্থ ছিল না, এখনো এই পরিবর্তিত বিশ্বে ইহা গ্রহণযোগ্য নহে" (প্রিন্সিপল্‌স অব্‌ ইসলামিক জুরিস্প্রুডেন্স, পৃঃ ৫০৭)।

"কুরাণিক ল' অব্‌ ক্রাইম্‌স্‌" বইটি দুঃখ করে বলেছে ঃ "এই একটি মাত্র তলোয়ার-আয়াত দ্বারা একশ' চব্বিশটির বেশি (মূল্যবোধের) আয়াতকে বাতিল করিয়াছে, এমনকি বাকারা ২৫৬-কেও ('ধর্মে জবরদস্তি নাই')" পৃঃ ৮।

ডঃ সাচেদিনার মত বিশাল পণ্ডিতও দুঃখ করে বলেছেন ঃ "শারিয়া নেতাদের মতে কোরাণের সহনশীলতার আয়াতগুলিকে বাতিল করিয়াছে 'তলোয়ার-আয়াত' সুরা তওবা আয়াত ২৯ যাহা ইহুদী-খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে (চিরকালের জন্য) যুদ্ধের আদেশ দেয়" (দি ইসলামি রুট্‌স্‌ অব্‌ ডেমোক্র্যাটিক প্লুরালিজ্‌ম্‌, পৃঃ ৪৮)। এ অপব্যাখ্যার প্রভাব মুসলিম সমাজকে পথভ্রষ্ট করছে। ইসলামের এই হিংস্র ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে চলেছে বর্তমানের শারিয়াপন্থীরাও, সূত্রঃ দৈনিক সংগ্রাম, ০৪ জানুয়ারী, ২০০৭। এ-রকম বহু উদাহরণ আছে।

হুবহু ঠিক এই অপদর্শনের ভিত্তিতেই মওলানা মওদুদি বলেছেন ঃ "ইসলাম দেশ-জাতি নির্বিশেষে ইসলামের দর্শন ও কর্মপদ্ধতির পরিপন্থী সকল রাষ্ট্র ও সরকারকে পৃথিবী হইতে ধ্বংস করিতে চায়" (ইসলামে জিহাদ, পৃঃ ৬)। এই অপদর্শনটা পৃথিবীর তাবৎ অমুসলমানের বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা জানার পর ইউরোপ-আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়া যদি একযোগে পৃথিবীর সব মুসলমানকে সামরিক আক্রমণ করে তবে কি হবে ? ওই আক্রমণাত্মক দর্শনেই মওদুদি তাঁর দল গঠন করেছেন এবং বলেছেন ঃ " 'পার্টি' শব্দটির জন্য কোরাণ 'উম্মা' শব্দ ব্যবহার করিয়াছে...হজরত আবুবকর 'মুসলিম পার্টি'র নেতৃত্ব দিয়াছিলেন" (ইসলামে জিহাদ পৃঃ ৫, ১০ ইত্যাদি)। অর্থাৎ তিনি বিশ্ব-মুসলিমকে 'পার্টি' বলতে গিয়ে কোরাণ ও হজরত আবুবকরকে পর্যন্ত জড়িয়ে ফেলেছেন। কিন্তু পৃথিবীতে অসংখ্য মুসলমান এটা অত্যন্ত অপছন্দ করেন। দেখুন, মদিনার শান্তিচুক্তির ৪৭টা ধারার ২ নং ধারায় নবীজী নিজেই মদিনার মুসলিম-ইহুদী-খ্রীষ্টান-পৌত্তলিক সবাইকেই 'উম্মা' হিসেবে চিহ্নিত করে দলিলে সই করে গেছেন (দ্য ফার্স্ট রিট্‌ন্‌ কন্সটিটিউশন অব্‌ দ্য ওয়ার্লড – হামিদুললাহ ১৯৪১, পৃঃ ৪২ ও ইবনে হিশাম ইবনে ইশাক, পৃঃ ২৩১)। শারিয়াপন্থীদের তুমুল জনপ্রিয় লেখিকা ক্যারেন আর্মস্ট্রংও বলেছেন, "মুসলিম, ইহুদী, পুতুল-পূজক সকলেই এক 'উম্মা'র অন্তর্ভুক্ত ছিল" (ইসলাম, এ-শর্ট হিস্ট্রি পৃঃ ১৪)। সে-হিসেবে যে-কোনো শাসনকার্যের আওতায় সবাই এক উম্মা, অর্থাৎ এক জাতি, যেমন আমরা জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সবাই বাংলাদেশী। কিন্তু মওদুদি তাঁর নিজস্ব বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নবীজীর দেয়া শব্দের অর্থ বদলালেন ও নবীজীকে 'আক্রমণকারী' বানালেন। তিনি বললেন ঃ "পরে চারপাশের দেশগুলিতে নবী (দঃ) ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ পাঠান। যখন ওই দেশগুলির শাসনকর্তারা তাঁর আমন্ত্রণ অস্বীকার করিল, তখন নবী (দঃ) তাহাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন" (ইসলামে জিহাদ, পৃঃ ২৩)।

ইসলামের এ-এক ভয়াবহ ব্যাখ্যা। যুদ্ধের আয়াত দিয়ে কোরাণের দয়া-মায়া-ক্ষমা-সহ্যগুণ এসবের আয়াতকে বাতিল করে ইসলামের ভিত্তিই টলিয়ে দেয়া হয়েছে। এটাই শারিয়া-ইসলাম। এজন্যই বিশ্বের অগণিত মুসলমান এ-ব্যাখ্যাকে বাতিল করেছেন, বহু অমুসলমান ইসলামকে ভয় পেতে শুরু করেছে। অন্যদিকে খাজা

মঈনুদ্দীন চিশতি, শাহজালাল-শাহ-মখদুম-নিজামুদ্দীন আওলিয়াকে কেউ কোনদিন কোনো সমালোচনা করেনি, আজও উনাদের দরগায় শত শত নয়, হাজার হাজার মুসলিম ও অমুসলিম পর্যন্ত গিয়ে শান্তি পায়। ইসলাম যদি শান্তির ধর্ম হয় তবে এমন শান্তি আর কোথায় আছে ? মওদুদির ওই ব্যাখ্যা আর শারিয়া দেশগুলোর মানবাধিকার লঙ্ঘন দেখে দেখে পশ্চিম বিশ্বে সাধারণ জনগণও এখন বলা শুরু করেছে ঃ "শারিয়া হইল সন্ত্রাসের জনক" (র‍্যাডিক্যাল ইসলাম রুল্স্,পৃঃ ১৬)। সে-জন্যই শারিয়াকে শুধুমাত্র একটা নিরীহ আইনের বই মনে করা মহাভুল হবে। আসলে শারিয়া হল "অন্য সকল রাষ্ট্র ও সরকারকে পৃথিবী হইতে ধ্বংস" করে বিশ্ব-ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভয়াবহ অপদর্শন।

ব্যাখ্যা জিনিসটাই এমন। ব্যাখ্যা দিয়ে তিলকে তাল করা যায়, একটা বঞ্চিত নিপীড়িত জাতির মরণপণ রক্তাক্ত স্বাধীনতা যুদ্ধকে 'গণ্ডগোলের সময়' কিংবা 'ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া' বলা যায়। আরো দেখুন, সৈন্যদলের একমাত্র কাজ হল বিদেশী আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা। এটা স্বীকার করে তাদেরকে শপথও নিতে হয়। সেই শপথ শিকেয় তুলে তারা যদি বিপুল বিক্রমে নিজের দেশকেই জয় করে ফেলে তাবে তা নির্ঘাৎ অন্যায়। কিন্তু এ-হেন শপথ-ভঙ্গ ও গণতন্ত্রের হত্যাকারী সামরিক অভ্যুত্থানকেও ইসলামি বলে ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব যেমন ঃ "কোরাণের আয়াত অনুযায়ী বানানো ইসলামি আইন মোতাবেকই সুপ্রীম কোর্ট রায় দিয়াছে পাকিস্তানের বর্তমান (১৯৮৪ সালের) মার্শাল ল' বৈধ" (জুরিস্টিক ডিফারেন্সেস অ্যাণ্ড হাও টু রিজলভ্ দেম" পৃঃ ১০ – মিঃ আফজাল চীমা, চেয়ারম্যান, কাউন্সিল অফ ইসলামিক আইডিয়োলজি, পরিচালক – রাবিতা, এশিয়ান বিভাগ, ইসলামাবাদ ও প্রাক্তন বিচারক)। এরই নাম ইসলাম বিকৃতি। ইসলামের এ-রকম ভয়ঙ্কর ব্যাখ্যা দ্বারাই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি মুসলিম সৈন্য দ্বারা বাঙালি হিন্দু নারীকে ধর্ষণ করাকে হালাল ঘোষণা সম্ভব হয়েছে। কোনো শারিয়াপন্থীরা তার প্রতিবাদও করেননি।

একই ব্যাপারে একই পণ্ডিতের উল্টো ব্যাখ্যাও দেখি আমরা। ডঃ জামাল বাদাওয়ী বিশ্ব-বিখ্যাত শারিয়া-সমর্থক পণ্ডিত, বিশ্ব-বক্তা ও বহু আন্তর্জাতিক শারিয়া সংগঠনের নেতা। তাঁর সর্বাধিক প্রচারিত নিবন্ধ ইসলামে নারীর অধিকারে তিনি এক ঝাঁক যুক্তি দিয়ে দৃঢ়ভাবে দেখিয়েছিলেন কেন ইসলামে নারী নেত্রীত্ব নিষিদ্ধ। তাঁর বহু ভক্তেরাও নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করেছিল – আমিও পাঠিয়েছিলাম আমার "নেতৃত্ব ও নেত্রীত্ব" নিবন্ধের দলিলগুলো। কিছুদিন পরে তাঁর ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখি তিনি আগের যুক্তিগুলো বাতিল করে অন্য এক ঝাঁক যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন কেন ইসলামে নারী নেত্রীত্ব গ্রহণযোগ্য।

মওদুদির স্ববিরোধী ব্যাখ্যাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন "যে-সকল বিষয়ে স্রষ্টা এবং তাঁহার রসুলের সুনির্দিষ্ট বিধান রহিয়াছে, সে-সকল বিষয়ে কোন মুসলিম নেতা, আইনবিদ বা ইসলামি বিশেষজ্ঞ, এমনকি দুনিয়ার সব মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হইলেও বিন্দুমাত্র রদবদল করিতে পারিবে না" (ইসলামিক ল' অ্যাণ্ড কন্সটিটিউশন" – পৃঃ ১৪০)। মদিনা চুক্তিটার ১৪ নম্বর ধারায় আছে "কোন অবিশ্বাসীকে খুন করার বদলে কোন মুসলমান অন্য মুসলমানকে খুন (ইয়াক্তালু) করিবে না।" অর্থাৎ তিনি ওই আইন মানবেন, কোন মুসলিম কোন অমুসলিমকে খুন করলে খুনীর মৃত্যুদণ্ড দেবেন না। অথচ সেই তিনিই আবার উল্টো ব্যাখ্যায় বলেছেন, "ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের জান-মাল ও সম্মানকে হুবহু মুসলিম নাগরিকদের মতই হইতে হইবে। দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইনে মুসলিম-অমুসলিমের কোনই পার্থক্য নাই।" – হিউম্যান রাইট্স্ ইন্ ইসলাম" পৃষ্ঠা ১২। এভাবে তাঁর অনুসারীরা যে কত জায়গায় কতভাবে মারাত্মক স্ববিরোধিতার শিকার হচ্ছে এবং জাতিকে তার দাম দিতে হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই।

মতলবি ব্যাখ্যার আরেকটা উদাহরণ দেখুন। সুরা হাদীদ আয়াত ২৫ ঃ "আর আমি নাজিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচণ্ড শক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার।" অবশ্যই লোহাতে আছে প্রচণ্ড শক্তি এবং মানুষের অনেক উপকার, যেমন লাঙ্গল, গাড়ি, ইত্যাদি। আসলে লোহা ছাড়া জীবনই চলবে না। কিন্তু এটাকে শারিয়াপন্থীরা রাজনৈতিক রং চড়িয়ে অনুবাদ করেছেন "যাতে আছে প্রচণ্ড রণশক্তি"। এটা প্রথমে করেছেন ইবনে কাথীর, কারণ তাঁর সময়ে মুসলিম-অমুসলিমের প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছিল। অর্থাৎ ব্যাখ্যাটায় যুদ্ধের কথা ঢুকিয়ে দিয়ে বিশ্ব-মুসলিমকে চিরকালের জন্য দুনিয়ার সব অমুসলিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দিকে উসকিয়ে দেয়া হয়েছে। এখন যুদ্ধ করে দুনিয়ার সমস্ত অমুসলিমকে পরাজিত করার স্বপ্নটা ভেঙে গেছে কিন্তু 'ইসলামি রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্নটা রয়ে গেছে। তাই ব্যাখ্যাটাও বদলানো হয়েছে। এখন ওটা আর 'রণশক্তি' নয়, এখন ওটা হয়ে গেছে 'রাষ্ট্রশক্তি' – বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ৩য় খণ্ড পৃঃ ২৪৫।

ইসলাম নিয়ে কোন সে ষড়যন্ত্রে লোহার শক্তিকে পেঁচিয়ে রাষ্ট্রশক্তি বলা হয় জাতি তা ঠিকই বোঝে ॥

পৃথিবীর প্রথম গঠনতন্ত্র

গঠনতন্ত্র কি ? গঠনতন্ত্র হল যে-কোন সংগঠনের কর্মকাণ্ডের মূল দলিল যাতে সেই সংগঠনের উদ্দেশ্য বলা থাকে, এবং যা দিয়ে তার কাঠামো ও কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। সব সংগঠনেরই গঠনতন্ত্র থাকতে হয়, তা সে সামাজিক হোক, সাংস্কৃতিক হোক, রাজনৈতিক হোক বা রাষ্ট্রীয় হোক, - কারণ রাষ্ট্রও একটা সংগঠন। নবীজী ৬২২ সালে মদিনায় হিজরত করার পরের বছরই একটা দলিল তৈরি করে মদিনার অমুসলিমদের কাছে প্রস্তাব করেন। শারিয়াপন্থীরা দাবি করেন এটা বিশ্বের প্রথম লিখিত গঠনতন্ত্র। অনুবাদে কখনো কখনো শব্দের আসল অর্থ ফোটে না বলে বিশ্বের গঠনতন্ত্রের ইতিহাস এবং মদিনা-সনদের ধারাগুলো নীচে মূল ইংরেজিতেই দিলাম যাতে সবাই পড়ে দেখতে পারেন। দলিলটা বিস্তারিত ধরা আছে নবীজীর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য জীবনী "সিরাত"-এ (ইবনে হিশাম ইবনে ইশাক) পৃষ্ঠা ২৩১-২৩৪। এর নাম 'দ্য কভেন্যান্ট বিটুঈন দ্য মুসলিম্স্ অ্যাণ্ড দ্য মেডিনিয়ান্স অ্যাণ্ড দ্য জিউস' অর্থাৎ 'মুসলিম ও মদিনাবাসী, এবং ইহুদিদের মধ্যে কভেন্যান্ট।' মূল আরবিতে এ-দলিলের নাম দেয়া আছে 'সহিফা'। কভেন্যান্ট শব্দের অর্থ গঠনতন্ত্র মোটেই নয়, অর্থ হল agreement, contract, treaty, promise, and pledge অর্থাৎ চুক্তি, কথা দেয়া, প্রতিজ্ঞা, ইত্যাদি। আর 'সহিফা' শব্দের অর্থও গঠনতন্ত্র নয়, এর সাধারণ অর্থ হল প্রোগ্রেসিভ ডকুমেণ্ট, অর্থাৎ যে কোন ক্রমাগত বিবর্তনশীল দলিল। 'সিরাত' থেকে ভাবানুবাদ-উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ "মুজাহির ও আনসারদের বিষয়ে রসুল একটি কভেন্যান্ট লেখেন যাহাতে তিনি ইহুদিদের সাথে 'বন্ধুত্বসুলভ চুক্তি' (friendly agreement) করেন এইভাবে ঃ "ইহা রসুল মুহম্মদের পক্ষ হইতে মুমিনগণ, কুরাইশ মুসলিমগণ এবং মদিনার যাহারা তাহাদের পরে আসিয়া যোগ দিয়াছে ও পরিশ্রম করিয়াছে তাহাদের ভিতরে সম্পর্ক স্থির করিতে। তাহারা সকলে এক উম্মা।" এখানে বিশ্বাসী বলতে ইহুদি-খ্রীষ্টানকে বুঝায় কারণ তারা আল্লাহ-তে বিশ্বাস করে এবং 'মদিনায় যাহারা তাহাদের পরে আসিয়া যোগ দিয়াছে' বলতে মুজাহিরদেরকে বুঝায়। ডঃ হামিদুল্লাহ'র বই 'দ্য ফার্স্ট রিটন্ কন্সটিটিউশন ইন্ দ্য ওয়ার্লড' অর্থাৎ 'বিশ্বের প্রথম লিখিত গঠনতন্ত্র' এতে মোট ৫২টি ধারার কথা বলা হলেও ৪৭টি ধারার উদ্ধৃতি আছে। তিনি বলেছেন ঃ রসুল একটি দলিল লিখেন যাহাতে শাসক/শাসিতের দায়িত্ব ও অধিকারের এবং অন্যান্য বিষয়ের বিবরণ ছিল...তিনি লিখেন একটি দলিল (Deed) যে দলিল নিজেই নিজেকে 'কিতাব' বা 'সহিফা' বলিয়াছে – পৃষ্ঠা ৪ ও ১২।

কোন দলিল আসলে কি সেটা আর কারো মুখ থেকে না শুনে ঐ দলিল থেকে দেখাই বুদ্ধিমানের কাজ। সেজন্য দলিলের ধারাগুলো (মোট ৪৭টি, নম্বরের পার্থক্যতে কখনো ৫২ বলা হয়েছে) নীচে দিলাম। একটু খুঁটিয়ে পড়লে দেখা যাবে ওটার মূল কথাটাই হল যুদ্ধ, শান্তি, শান্তিচুক্তি ও মুসলিম-অমুসলিমের পারস্পরিক সম্পর্ক। এর বহু প্রমাণ আছে শারিয়াপন্থীদের বইতেই। একটা দেখুন ঃ "রসুলুল্লাহ (সাঃ) মদীনা পৌঁছে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার কারণে সর্বপ্রথম মদীনায় ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসরত **ইহুদী গোত্রসমূহের মধ্যে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন**। চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, ইহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে না এবং কোন আক্রমণকারীকে সাহায্য করবে না। তারা আক্রান্ত হলে মুসলমানগণ তাদেরকে সাহায্য করবে। **শান্তিচুক্তিতে** আরও অনেক ধারা ছিল...ওহুদ যুদ্ধ পর্যন্ত তাদেরকে বাহ্যত **এই শান্তিচুক্তির অনুসারী** দেখা যায়... রসুলুল্লাহ (সাঃ) মদীনায় আগমনের পর পার্শ্ববর্তী ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের সাথে এই মর্মে **একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন** যে, তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না...মুসলমানদের সাথে সম্পাদিত **চুক্তিভঙ্গের** অপরাধে বনী-কুরায়যা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ও বন্দি হয়েছে..."– মওলানা মুহিউদ্দিনের অনুদিত বাংলা-কোরাণ, পৃষ্ঠা ১৩৪৯, ৩৩৫ ও ৪৮। কট্টর শারিয়াপন্থী তিনিও ওটাকে কখনোই গঠনতন্ত্র বলেননি, 'শান্তিচুক্তি'-ই বলেছেন, এবং বারবার বলেছেন। এমনকি শারিয়ার কেতাবও ওটাকে 'গঠনতন্ত্র' বলেনি, বলেছে '**মদিনা চুক্তি**' এবং '**মদিনা সনদ**'– বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬০। কথাটা আসলে সবাই জানেও, যেমন দেখুন– "কাফিরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে প্রিয় নবী (সাঃ) আল্লাহতাআলার নির্দেশক্রমে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন। মদীনায় স্থায়ীভাবে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং যুলুম ও সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে মদীনায় বসবাসকারী অন্যান্য ধর্মালবম্বী বিশেষত ইয়াহুদীদের সাথে তিনি এক শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন যা ইতিহাসে "মদিনা সনদ" নামে খ্যাত– ইসলামী জীবন- সন্ত্রাস নির্মুলে মহানবী সাঃ-এর শ্বাশ্বত কর্মসূচী-মুহাম্মদ মুহিব্বুল্লাহ ভুএগ্রা-দৈনিক ইনকিলাব ১৪ই সেপ্টেম্বর ২০০৮।

তাহলে ?

আম জিনিসটা আমই, কাঁঠালও নয় তরমুজও নয়। সামাজিক নেতৃত্বটা নবীজীরই ছিল, কিন্তু সেটা ছিল তাঁর বানানো শান্তিচুক্তি-ভিত্তিক, রাষ্ট্রীয় গঠনতান্ত্রিক নয়। তাছাড়া সহিফাটা নিয়ে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রেরও প্রমাণ আছে। খুন করলে খুনীর

মৃত্যুদণ্ড হয়, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু শারিয়া আইনে আছে ঃ "ইসলামি রাষ্ট্রে কোন অমুসলিমকে হত্যার অপরাধে কোন মুসলমানের মৃত্যুদণ্ড হইবে না"– দ্য পেনাল ল' অব্ ইসলাম পৃঃ ১৪৯ ও শারিয়ার মূল কেতাব 'রিসালা'র ১৪২ পৃষ্ঠা (আবু দাউদ ৩য় খণ্ড পৃঃ ১১৩, শা'কায়ানি'র না'য়েল আল-আওতার পৃঃ ৪৩ এবং শাফি'র কিতাব আল-উলুম ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ২৬, ২৭ ও ৪০)। এ-আইনের শেকড় সহি বোখারী ১ম খণ্ড হাদিস ১১১ এবং খণ্ড ৪-এর হাদিস ২৮৩ – মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ মুহসিন খানের অনুবাদ – "আবু যুহায়রা বলেন – আমি আলী (রাঃ)-কে প্রশ্ন করিলাম, কোরাণের বাহিরে আপনার কোন জ্ঞান আছে কি ? আলী বলিলেন, না। তবে ... কোন অবিশ্বাসীকে খুন করিবার জন্য কোন মুসলমানের মৃত্যুদণ্ড হইবে না।" এ-হাদিস থাকার কথা ইণ্টারনেটের সহি হাদিস সুনান আবু দাউদ-এর ১৪-২৭৪৫ অংশেও। যে কোন লোক বুঝবে যে এ-আইন অন্যায়। হজরত আলীর নামে আইনটা খুব একটা শক্ত হচ্ছে না বলে এর শেকড় একেবারে রসুলে গিয়ে ঠেকানো হয়েছে। শান্তিচুক্তির ২১ আর ১৪ নম্বর ধারায় আছে – "কেহ যদি কোন মুসলিমকে ইচ্ছাকৃতভাবে খুন করে ও তাহা প্রমাণিত হয়, তবে নিশ্চয়ই খুনীর মৃত্যুদণ্ড হইবে" (ধারা ২১)। কিন্তু "কোন অবিশ্বাসীকে খুন করার বদলে কোন মুসলমান অন্য মুসলমানকে খুন (ইয়াক্তালু) করিবে না" (ধারা ১৪) – দ্য ফার্স্ট রিটন্ কন্সটিটিউশন ইন্ দ্য ওয়ার্ল্ড, পৃষ্ঠা ৪৫ ও ৪৭ – মুহম্মদ হামিদুল্লাহ ১৯৪১।

এটা সুস্পষ্ট অন্যায় ও ইসলামের ন্যায়বিচারের সুস্পষ্ট বিরোধী। নবীজীর নাম ব্যবহার করে অন্যায় আইন বানানোর এ-রকম বহু উদাহরণ আছে। এ-আইনের উদ্দেশ্য পরিষ্কার। অমুসলিমকে শক্ত কব্জার মধ্যে রাখতে হবে, এবং রাখতে হবে ওই নবীজীর নামেই। ইউরোপ-আমেরিকায় যখন আমরা 'ইসলাম ন্যায়ের ধর্ম বলি তখন এ-সব প্রশ্নের জবাব দেয়া আমাদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। অমুসলিম হত্যার এই আইনের ব্যাপারে মওদুদির স্ববিরোধীতা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন "যে-সকল বিষয়ে স্রষ্টা এবং তাঁহার রসুলের সুনির্দিষ্ট বিধান রহিয়াছে, সে-সকল বিষয়ে কোন মুসলিম নেতা, আইনবিদ বা ইসলামি বিশেষজ্ঞ, এমনকি দুনিয়ার সব মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হইলেও বিন্দুমাত্র রদবদল করিতে পারিবে না" (ইসলামিক ল' অ্যাণ্ড কন্সটিটিউশন পৃঃ ১৪০)। অর্থাৎ তিনি ওই আইন মানবেন, কোন মুসলিম কোন অমুসলিমকে খুন করলে খুনীর মৃত্যুদণ্ড দেবেন না। অথচ সেই তিনিই আবার বলছেন, "ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের জান-মাল ও সম্মানকে হুবহু মুসলিম নাগরিকদের মতই হইতে হইবে। দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইনে মুসলিম-অমুসলিমের কোনই পার্থক্য নাই"– হিউম্যান রাইট্স্ ইন্ ইসলাম, পৃঃ ১২। এভাবে তাঁর অনুসারীরা যে কত জায়গায় কতভাবে মারাত্মক স্ববিরোধীতার শিকার হচ্ছে এবং জাতিকে তার দাম দিতে হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই।

এ-আইনটা যে ষড়যন্ত্র ক'রে নবীজীর নামে তাঁর অনেক পরে যোগ করা হয়েছে তা সুস্পষ্ট বোঝা যায় দু'টো কারণে। প্রথমত, এমন পক্ষপাতদুষ্ট অন্যায় চুক্তি প্রস্তাব করা রহমতুল্লিল আল-আমিনের পক্ষে তো দূরের কথা, কোন বিবেকমান মানুষের পক্ষেও সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, মদীনায় তখন মোটামুটি দশ হাজার লোকের বাস (হামিদুল্লাহ ১৯৪১ পৃঃ ১৩), আর মুজাহির-আনসার মিলিয়ে মুসলমানের সংখ্যা মাত্র দু'শো – তার মধ্যে আবার একটা অংশ হলো মক্কা থেকে আসা মুহাজিররা – দ্য প্রসেস অব্ ইসলামিক রেভল্যুশন – মওদুদি, পৃঃ ৪২। অর্থাৎ অমুসলিমরা শতকরা আটানব্বই আর মুসলিমরা মাত্র দুই। ওটা ঐ অমুসলিমদেরই ভিটেমাটি পৈতৃক জায়গা, ওরা আগে থেকে সুপ্রতিষ্ঠিত। এই অন্যায় অপমানকর চুক্তিতে সেই দশ হাজার লোক ও তাদের শক্তিশালী নেতারা নিজেদেরই দেশে বসে নিজেদেরই বিরুদ্ধে কেন রাজী হবে মাত্র দু'শো জনের সাথে যার বেশির ভাগ বিদেশী ? আপনি হবেন ? প্রশ্নই ওঠে না। ওরা নবীজীকে আল্লাহ'র রসুল বলেই মানেনি, তাঁর নেতৃত্ব মানবে কেন ? ওদের নেতারা হঠাৎ করে এক বিদেশীর কাছে তাদের পুরনো নেতৃত্ব ছাড়বে কেন ? নেতা কখনো নেতাগিরি ছাড়তে চায় ? তাছাড়া, কারো পক্ষেই নূতন দেশে গিয়ে প্রথমেই হঠাৎ করে পুরো একটা জাতির নেতৃত্ব ও শাসন শুরু করাটা মুরগীর দাঁতের মতই অসম্ভব। এ সামাজিক শাসন নবীজী অবশ্যই করেছিলেন তবে শুরুতেই নয় বরং কয়েক বছর সংগ্রামের পরে মদিনার এবং অন্যান্য অমুসলিম গোত্রগুলোকে তাঁর আওতায় এনে।

ঐ শান্তিচুক্তি রাষ্ট্রীয় গঠনতন্ত্র হতে পারে না অনেক কারণে। প্রথমত, গঠনতন্ত্র তৈরিই হয় দুই বা বেশি পক্ষের আলোচনা-বিতর্ক করে। নবীজী কি কোন পক্ষের সাথে, এমনকি কোন মুসলমানের সাথেও, আলোচনা করে এটা তৈরি করেছেন ? না, তিনি আল্লাহ প্রদত্ত অধিকারবলে নিজে থেকে এককভাবে এটা তৈরি করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, আলাপ-আলোচনা-বিতর্কের মাধ্যমে পরিবর্তনের সুযোগ না থাকলে সেটা গঠনতন্ত্রই নয়। এ-দলিলের ওপরে কি আলোচনা বা পরিবর্তনের সুয়োগ ছিল ? না, ছিল না এবং দলিলটায় কোন পরিবর্তন হয়ওনি। তৃতীয়ত, গঠনতন্ত্র ক্রমাগত প্রয়োগ, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করতে হয়। নবীজী এ-দলিল কি ক্রমাগত প্রয়োগ করেছিলেন ? না, করেননি। মক্কা বিজয়ের পর করেছিলেন ? না, করেননি। চতুর্থত, চার খলীফারা কি সনদের ধারাগুলো প্রয়োগ করেছিলেন ? না, করেননি। পঞ্চমত, চোদ্দশ' বছরের মুসলিম খেলাফতে কি ওই ধারাগুলো রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রয়োগ হয়েছে ? না, হয়নি। ষষ্ঠত, একতরফা ঘোষণায় চুক্তি বাতিল করা যায় কিন্তু আলোচনা ছাড়া গঠনতন্ত্র বাতিল করা যায় না। অমুসলিমরা এ-চুক্তি ভঙ্গ করলে "ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) প্রমুখ সাহাবী প্রকাশ্যভাবে তাদের সাথে

চুক্তি বিলোপ ও অসহযোগের কথা ঘোষণা করেন" – মওলানা মুহিউদ্দিনের বাংলা-কোরাণ পৃঃ ৩৩৬ ।

তাহলে ?

গঠনতন্ত্র এবং রাষ্ট্র দু'টো শব্দই সাম্প্রতিক । দুনিয়ায় ম্যালেরিয়ার আবির্ভাব হবার আগে কি আপনি কুইনিন আবিষ্কার করতে পারেন ? আগুন আবিষ্কারের আগে কি রান্না করা সম্ভব ? দাঁত ওঠার আগে কি চিবানো সম্ভব ? কোন শব্দের জন্মের হাজার বছর আগে এভাবে শব্দটা প্রয়োগ করাটা কি উচিত ? রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্রে হাজারো নিয়মকানুন থাকতে হয়, ওই সনদে কয়টা আছে ? ধারাগুলো পড়লে স্পষ্টই দেখা যায় কিছু ধারায় সামান্য কিছু অন্য উপাদান আছে কিন্তু মূলত দলিলটা একটা শান্তি চুক্তি মাত্র ।

অর্থাৎ একটা "শান্তিচুক্তি"-কে ষড়যন্ত্র ক'রে "রাষ্ট্রীয় গঠনতন্ত্র" হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে । কেন হয়েছে ? কারণ ইসলামে রাজনীতি ঢোকানোর দরকার । তাই কোরাণ-রসুলের যেখানেই সম্ভব রাজনৈতিক রং চড়ানো হয়েছে । এর আরো বহু উদাহরণ আছে, মদিনা-চুক্তি তার একটা উদাহরণ মাত্র । মুশকিল হচ্ছে ধর্ম হিসেবে কোনকিছু একবার মাথায় বসে গেলে সেটা থেকে বেরুনো অত্যন্ত কঠিন । কিন্তু বিশ্ব-মুসলিমের কল্যাণের জন্যই এ-কাজটা আমাদের করতে হবে, তাই না ? অতীত মুসলমানদের সামাজিক, সামরিক, অর্থনৈতিক, ব্যবসায়িক, পেশা-সম্পর্কিত, চিকিৎসা-সম্পর্কিত, সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনকে ইসলামি ধর্মবিশ্বাসের সাথে গুলিয়ে ফেলার মত ভ্রান্তি আর কি হতে পারে ? কোরাণের আয়াত বা নবীজীর নির্দেশ আসলে যা নয় তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেয়ে আত্মঘাতী আত্মপ্রবঞ্চনা আর কি হতে পারে ?

মদিনা-সনদ

http://www.constitution.org/cons/medina/kassim2.htm

APPENDIX

THE MEDINA CHARTER (FN11)

In the name of God the Compassionate, the Merciful.
(1) This is a document from Muhammad the prophet (governing the relations) between the believers and Muslims of Quraysh and Yathrib, and those who followed them and joined them and labored with them.
(2) They are one community (umma) to the exclusion of all men.
(3) The Quraysh emigrants according to their present custom shall pay the bloodwit within their number and shall redeem their prisoners with the kindness and justice common among believers.
(4-8) The B. 'Auf according to their present custom shall pay the bloodwit they paid in heatheism; every section shall redeem its prisoners with the kindness and justice common among believers. The B. Sa ida, the B. "I-Harith, and the B. Jusham, and the B. al-Najjar likewise.
(9-11) The B. 'Amr b. 'Auf, the B. al-Nabit and the B. al-'Aus likewise.
(12) (a) Believers shall not leave anyone destitute among them by not paying his redemption money or bloodwit in kindness.
(12) (b) A believer shall not take as an ally the freedman of another Muslim against him.
(13) The God-fearing believers shall be against the rebellious or him who seeks to spread injustice, or sin or animosity, or corruption between believers; the hand of every man shall be against him even if he be a son of one of them.
(14) A believer shall not slay a believer for the sake of an unbeliever, nor shall he aid an unbeliever against a believer.
(15) God's protection is one, the least of them may give protection to a stranger on their behalf. Believers are friends one to the other to the exclusion of outsiders.
(16) To the Jew who follows us belong help and equality. He shall not be wronged nor shall his enemies be aided.
(17) The peace of the believers is indivisible. No separate peace shall be made when believers are fighting in the way of God. Conditions must be fair and equitable to all.
(18) In every foray a rider must take another behind him.
(19) The believers must avenge the blood of one another shed in the way of God.
(20)(a) The God-fearing believers enjoy the best and most upright guidance.

(20)(b) No polytheist shall take the property of person of Quraysh under his protection nor shall he intervene against a believer.
(21) Whoever is convicted of killing a believer without good reason shall be subject to retaliation unless the next of kin is satisfied (with blood-money), and the believers shall be against him as one man, and they are bound to take action against him.
(22) It shall not be lawful to a believer who holds by what is in this document and believes in God and the last day to help an evil-doer or to shelter him. The curse of God and His anger on the day of resurrection will be upon him if he does, and neither repentance nor ransom will be received from him.
(23) Whenever you differ about a matter it must be referred to God and to Muhammad.
(24) The Jews shall contribute to the cost of war so long as they are fighting alongside the believers.
(25) The Jews of the B. 'Auf are one community with the believers (the Jews have their religion and the Muslims have theirs), their freedmen and their persons except those who behave unjustly and sinfully, for they hurt but themselves and their families.
(26-35) The same applies to the Jews of the B. al-Harith, B. Sai ida, B. Jusham, B. al-Aus, B. Tha'laba, and the Jafna, a clan of the Tha'laba and the B. al-Shutayba. Loyalty is a protection against treachery. The freedmen of Tha 'laba are as themselves. The close friends of the Jews are as themselves.
(36) None of them shall go out to war save the permission of Muhammad, but he shall not be prevented from taking revenge for a wound. He who slays a man without warning slays himself and his household, unless it be one who has wronged him, for God will accept that.
(37) The Jews must bear their expenses and the Muslims their expenses. Each must help the other against anyone who attacks the people of this document. They must seek mutual advice and consultation, and loyalty is a protection against treachery. A man is not liable for his ally's misdeeds. The wronged must be helped.
(38) The Jews must pay with the believers so long as war lasts.
(39) Yathrib shall be a sanctuary for the people of this document.
(40) A stranger under protection shall be as his host doing no harm and committing no crime.
(41) A woman shall only be given protection with the consent of her family.
(42) If any dispute or controversy likely to cause trouble should arise it must be referred to God and to Muhammad the apostle of God. God accepts what is nearest to piety and goodness in this document.
(43) Quraysh and their helpers shall not be given protection.
(44) The contracting parties are bound to help one another against any attack on Yathrib.
(45) (a) If they are called to make peace and maintain it they must do so; and if they make a similar demand on the Muslims it must be carried out except in the case of a holy war.
(45) (b) Every one shall have his portion from the side to which he belongs.
(46) The Jews of Al-Aus, their freedmen and themselves have the same standing with the people of this document in purely loyalty from the people of this document. Loyalty is a protection against treachery. He who acquires ought acquires it for himself. God approves of this document.
(47) This deed will not protect the unjust and the sinner. The man who goes forth to fight and the man who stays at home in the city is safe unless he has been unjust and sinned. God is the protector of the good and God-fearing man and Muhammad is the apostle of God.

****

বিশ্বকোষ থেকে বিশ্বের গঠনতন্ত্রের ইতিহাস

http://en.wikipedia.org/wiki/Constitution

Excavations in modern-day Iraq by Earnest de Sarzec in 1877 found evidence of the earliest known code of justice, issued by the Sumerian king Urukagina of Lagash *ca* 2300 BC. Perhaps the earliest prototype for a law of government, this document itself has not yet been discovered; however it is known that it allowed some rights to his citizens. For example, it is known that it relieved tax for widows and orphans, and protected the poor from the usury of the rich.

Detail from Hammurabi's stele shows him receiving the laws of Babylon from the seated sun deity. After that, many governments ruled by special codes of written laws. The oldest such document still known to exist seems to be the Code of Ur-Nammu of Ur (*ca* 2050 BC). Some of the better-known ancient law codes include the code of Lipit-Ishtar of Isin, the code of Hammurabi of Babylonia, the Hittite code, the Assyrian code, Mosaic law, and the Cyrus cylinder by Cyrus the Great of Persia.

In 621 BC, a scribe named Draco wrote the laws of the city-state of Athens; and being quite cruel, this code prescribed the death penalty for any offence. In 594 BC, Solon, the ruler of Athens, created the new Solonian Constitution. It eased the burden of the workers, however it made the ruling class to be determined by wealth, rather than by birth. Cleisthenes again reformed the Athenian constitution and set it on a democratic footing in 508 BC.

Aristotle (*ca* 350 BC) was one of the first in recorded history to make a formal distinction between ordinary law and constitutional law, establishing ideas of constitution and constitutionalism, and attempting to classify different forms of constitutional government. The most basic definition he used to describe a constitution in general terms was "the arrangement of the offices in a state." In his works *Constitution of Athens, Politics,* and *Nicomachean Ethics* he explores different constitutions of his day, including those of Athens, Sparta, and Carthage. He classified both what he regarded as good and bad constitutions, and came to the conclusion that the best constitution was a mixed system, including monarchic, aristocratic, and democratic elements. He also distinguished between citizens, who had the exclusive opportunity to participate in the state, and non-citizens and slaves who did not.

The Romans first codified their constitution in 449 BC as the Twelve Tables. They operated under a series of laws that where added from time to time, but Roman law was never reorganised into a single code until the *Codex Theodosianus* (AD 438); later, in the Eastern Empire the *Codex repetitœ prœlectionis* (A.D. 534) was highly influential throughout Europe. This was followed in the east by the *Ecloga* of Leo III the Isaurian (740) and the *Basilica* of Basil I (878).

The Edicts of Ashoka established constitutional principles for that 3rd century BCE Maurya King's rule in Ancient India.

Many of the Germanic people that filled the power vacuum left by the Western Roman Empire in the Early Middle Ages codified their laws. One of the first of these Germanic law codes to be written was the Visigothic *Code of Euric* (471). This was followed by the *Lex Burgundionum*, applying separate codes for Germans and for Romans; the *Pactus Alamannorum*; and the Salic Law of the Franks, all written soon after 500. In 506, the *Breviarum* or *"Lex Romana"* of Alaric II, King of the Visigoths, adopted and consolidated the *Codex Theodosianus* together with assorted earlier Roman laws. Systems that appeared somewhat later include the *Edictum Rothari* of the Lombards (643), the *Lex Visigothorum* (654), the *Lex Alamannorum* (730) and the *Lex Frisionum* (*ca* 785).

Japan's *Seventeen-article constitution* written in 604, reportedly by Prince Shotoku, is an early example of a constitution in Asian political history. Influenced by Buddhist teachings, the document focuses more on social morality than institutions of government *per se* and remains a notable early attempt at a government

constitution. Another is the *Constitution of Medina*, drafted by the prophet of Islam, Muhammad, in 622. It is said to be one of the earliest constitutions which guarantees basic rights to religions and adherents as well as reinforcing a judiciary process regarding the rules of warfare, tax and civil disputes.

পাকিস্তানের শারিয়া – বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ?

কোনকিছুকে স্পষ্ট করতে হাজার কথার চেয়ে একটা উদাহরণই যথেষ্ট। শারিয়ার উদাহরণ হিসেবে পাকিস্তানের দিকে তাকানো যাক কারণ দু'দেশের শারিয়াপন্থী দলগুলোর ধ্যান-জ্ঞান, গঠন-চেহারা, চলন-বলন, আচার-ব্যবহার, ব্যক্তিত্ব-চরিত্র, কেতাব-উদ্দেশ্য ও বক্তৃতা-বিবৃতি হুবহু এক। বাংলাদেশে জামাতে ইসলামির প্রকাশিত প্রায় প্রতিটি শারিয়াপন্থী বই-ই আসলে উর্দু বইগুলোরই অনুবাদ। তাই বাংলাদেশে শারিয়া কায়েম হলে ফলাফলও পাকিস্তানের মতই হবার কথা। পাকিস্তানে বৈধ সরকার উচ্ছেদ করে জেনারেল জিয়াউল হক ক্ষমতা দখল করে শারিয়াপন্থীদের সমর্থন লাভের জন্য শারিয়া প্রবর্তন করেন ১৯৭৯ সালে। শুরুর দিকে শারিয়া পেয়েছিল অভূতপূর্ব জন-সমর্থন, শারিয়ার তেমন কোন বিরুদ্ধপক্ষ ছিল না। তাই সম্পূর্ণ সুযোগ ছিল এ-কথা প্রমাণ করার যে, শারিয়া আইন দিয়ে দেশে উন্নতি সম্ভব। সেটা তো হয়ই নি, বরং অন্ধবিশ্বাসীদের দাপটে পাকিস্তানের অবস্থা আজ বড়ই করুণ। তার কিছু চিত্র দেয়া হলো।

(ক) হুদুদ আইন নং ৭ (১৯৭৯), নং ২০ (১৯৮০) দ্বারা সংশোধিত, ৮-এর খ ঃ "পরকীয়া এবং ধর্ষণের (অর্থাৎ দু'টোতেই – *লেখক*) মামলায় শারিয়া-আদালতে সাক্ষী লাগবে চারজন বয়স্ক পুরুষ মুসলমানের চাক্ষুষ সাক্ষ্য, নারী-সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।" পুলিশের কাছে ধর্ষণের অভিযোগ করতে গিয়ে ধর্ষিতারা চারজন বয়স্ক পুরুষ মুসলিম সাক্ষী আনতে পারে না। কাজেই তারা এ-আইনে অবৈধ দৈহিক সংসর্গের, অর্থাৎ জ্বেনার, অভিযোগে দোষী হয়ে পড়ে। এ কোন গল্প-কল্পনা নয়। এ হল ইসলামের নামে অসংখ্য মা-বোনের জীবন ধ্বংস করার মারাত্মক বাস্তব। এ-আইনে বন্দিনী ছিল সাড়ে তিন হাজার ধর্ষিতা নারী ও বালিকা। এতে সারা দুনিয়ায় ইসলামের অত্যন্ত বদনাম হয়েছে আর পাকিস্তানের নামে ঢিঢি দুর্নাম পড়ে গেছে।

(খ) ডঃ ফারজানা বারী, অ্যাক্টিং ডিরেক্টর, সেন্টার ফর উইমেন স্টাডিজ, কায়েদে আজম বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামাবাদ, বলেছেন ঃ "এই আইন পরকীয়া ও ধর্ষণকে একই চোখে দেখে এবং ইহাতে ওই দুই ক্ষেত্রেই চারজন মুসলমানের চাক্ষুষ সাক্ষ্য প্রয়োজন...অর্থাৎ এই আইন ধর্ষককে রক্ষা করে। এই আইন হুদুদ মামলায় নারী ও অমুসলিমদের সাক্ষ্য অস্বীকার করে" (দ্য নিউজ, করাচি ১৪ই মে, ২০০২)। শুধু পাকিস্তানেই নয়, বহু দেশে এই একই আইনের যাঁতাকলে নারীর জীবন পিষ্ট হয়।

(গ) ডঃ আসমা জাহাঙ্গীর, পাকিস্তান মানবাধিকার সংস্থার প্রাক্তন পরিচালিকা বলেছেন ঃ " 'অনার কিলিং' প্রথায় খানদানের সম্মান বাঁচাতে পরিবারের মেয়েকে প্রেম বা পরকীয়ার সন্দেহে খুন করা হয়। পাকিস্তানে এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি কন্যা-বোন তাদের বাবা-ভাইয়ের হাতে খুন হচ্ছে কারণ শারিয়ার কিসাস আইনে নিহতের পরিবার খুনিকে মাফ করলে খুনির মৃত্যুদণ্ড হয় না। যে পরিবারে এমনিতেই একজন মেয়ে খুন হয়েছে, সে আবার আরেকজনকে হারাতে চায় না, সে খুনি হোক না মেয়ের বাবা বা ভাই। তাই তারা খুনিকে 'মাফ' করে। এদিকে দেশ জুড়ে বাবা-ভাইরা জেনে গেছে যে কন্যা-বোনকে খুন করলে অন্তত মৃত্যুদণ্ডটা হবে না। তাই শারিয়া আসার পর এই খুন বেড়ে গিয়ে সর্বগ্রাসী মহামারীর আকার ধারণ করেছে" (সাক্ষাৎকার টরন্টো টেলিভিশন, ২০০৬)।

(ঘ) ২০০৩ সালে মুত্তাহিদা মজলিস-এ আমল নামে শারিয়াপন্থী দল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়, এখন সে-দল বেলুচিস্তানের কোয়ালিশন সরকারেও আছে। সংসদে বসে এরা প্রথমেই বন্ধ করে জুয়া, মদ, বাস-ট্রেনে সঙ্গীত, বিজ্ঞাপন-পোস্টারে নারীর ছবি, বিচিত্রানুষ্ঠানে-রেডিও-টিভিতে মেয়েদের গান ও নাটক। সঙ্গীত-শিল্পীদের মারপিট করা শুরু হয় এবং সিনেমা হলগুলোতে সিনেমা বন্ধ করা হয়। আর তার পরেই সংসদ ঘোষণা করে, "ইসলামি মূল্যবোধ রক্ষার জন্য" আল্ট্রাসাউণ্ড ও ই-সি-জি পরীক্ষায় রোগিণীরা পুরুষ টেকনিশিয়ানের কাছে যেতে পারবে না। খবরে প্রকাশ, সারা প্রদেশে ই-সি-জি'র নারী-টেকনিশিয়ান আছে মাত্র একজন, আল্ট্রাসাউণ্ডের একজনও নেই ! যেখানে নারী-শিক্ষার হার মাত্র ৫% সেখানে এর চেয়ে বেশি টেকনিশিয়ান গড়ে ওঠা সম্ভবও নয়। সেখানে মা-বোনদের কি অবস্থা তা অনুমান করে নিন।

(ঙ) পাকিস্তানে ২০০০ সালে সরকারকে এ-সব ব্যাপারে পরামর্শ দেবার জন্য গঠিত সুপ্রীম কোর্টের জাস্টিস মজিদা রিজভী'র নারী-অধিকার কমিটি (NCSW) রিপোর্ট ঃ "বিশজন সদস্যের মধ্যে আঠারো জনই হুদুদ আইন বাতিল করতে বলেছেন। হুদুদ আইনের মধ্যে এত বেশি সমস্যা আছে যে এটাকে সংশোধন করা সম্ভব নয় ... ।" ধর্ষকের শাস্তি হয় না বলে স্বভাবতই পাকিস্তানে ধর্ষণ বেড়ে গেছে, এমনকি ধর্ষিতা থানায় অভিযোগ করতে এসে পুলিশ দ্বারা আবারও ধর্ষিতা বা গণধর্ষিতা হবার ঘটনাও বেড়ে গেছে অবিশ্বাস্যভাবে। বিচারক মজিদা রিজভী এ-ও বলেছেন এ-আইন যতদিন থাকবে ততদিন হুমকি ও ব্ল্যাকমেল হতে থাকবে। অনেক আগে ১৯94 সালে নাসির

আসলাম জাহিদ-এর নেতৃত্বে যে 'নারী বিষয়ক কমিশন' গঠিত হয়েছিল, সেটাও রায় দিয়েছিল হুদুদ আইন বাতিল করার জন্য। করাচির আইনজীবী পারভীন পারভেজও বলেছেন, এ-সব আইন প্রধানত প্রতিশোধ নেয়ার ষড়যন্ত্রেই খাটানো হয়। এতসবের পরেও পাকিস্তানে এ-সব হুদুদ আইনের কোনরকম পরিবর্তন করা যায়নি। আমাদের বুঝতে হবে, কোন অন্যায় আইনও যদি একবার শারিয়া আইন হিসেবে বৈধ হয় তবে শারিয়াপন্থীদের চাপে তাকে উচ্ছেদ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কারণ ওরা এ চেষ্টাকে 'ইসলাম-বিরোধী ষড়যন্ত্র' বলে প্রচার করে।

(চ) পাকিস্তানের আরেক মারাত্মক আইন হল ব্ল্যাসফেমি আইন। আইনটা হল কেউ চারজন বয়স্ক পুরুষ মুসলমানের সামনে ইসলাম, কোরাণ, নবীজী বা সাহাবিদেরকে অপমান করলে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। আইনটা শুনতে খুবই ভাল, কিন্তু মুশকিলটা হল 'অপমান' বলতে আসলে কি বুঝায় এবং কে কার কোন্ কথায় 'অপমান' বোধ করবেন তা ঠিক করা অসম্ভব। তাছাড়া, যারা থানায় বা আদালতে বলবে তারা অমুককে ইসলামের 'অপমান' করতে শুনেছে-দেখেছে সেই চারজন 'সাক্ষী' জোটানো কঠিন নয়। কিছু বন্ধু থাকলেই হল, কিংবা হুমকি বা টাকা দিয়েও এ-সাক্ষী জোটানো যায়। আর, এ-আইন অনুযায়ী সাক্ষী থাকলেই পুলিশ 'অপরাধী'-কে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য, আদালত তাকে শাস্তি দিতে বাধ্য। গত বছর ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টে যখন প্রস্তাব হয়েছিল ব্ল্যাসফেমি আইন বানানো হোক তখন শারিয়াপন্থীরা দৌড়ে গিয়েছিলেন প্রধান মন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের কাছে এই অনুরোধ নিয়ে, এ-আইন থেকে হাদিসকে রেহাই দেয়া হোক। কারণ তাঁরা ভালো করে জানেন সহি হাদিসগুলোতে সাহাবিদের চুরি, ডাকাতি, পরকীয়া, খুনোখুনি, অন্য ধর্মের প্রতি অপমান-ঘৃণা-হিংস্রতা ইত্যাদির শত শত ঘটনা আছে। যাহোক, পাকিস্তানে কেউ ওগুলোর উদ্ধৃতি সহি হাদিস থেকে দিলেও ব্ল্যাসফেমি আইনের পাল্লায় পড়ে যাবে। এ-ভাবে ইসলামের গঠনমূলক সমালোচনাকে 'ইসলামের অপমান' হুমকি দিয়ে শারিয়ার অন্যায় আইনগুলোকে রক্ষা করা হয়েছে। অতীত-বর্তমানে বহু ইসলামি চিন্তাবিদ এ-আইনেই 'মুরতাদ' ঘোষিত হয়ে খুন হয়েছেন বা হেনস্থা-দেশছাড়া হয়েছেন, তাঁদের বিশাল লাইব্রেরী পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ইসলামের ইমামরা তো এর ভুক্তভোগী হয়েছেনই, আমরা যাঁদের নিয়ে গর্ব করি সেই ইবনে রুশদ্, ইবনে খালদুন, ইবনে সিনা প্রমুখ বৈজ্ঞানিক-দার্শনিকের ওপরে শারিয়া-রাষ্ট্র এই আইনেই অতীতে কি অসহ অত্যাচার করেছে তা দেখলে শিউরে উঠতে হয়। মুসলিম-বিশ্বের অনেক অধঃপতনের জন্য দায়ী এই মহা শক্তিশালী আইন। পাকিস্তানে অসংখ্য বদমাশেরা এ-আইনকে খাটায় প্রেম-জমিজমা-ব্যবসার প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে বা প্রতিশোধ নিতে, আর ধর্মীয় লেবাস পরা অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত-অজ্ঞ মোল্লারা খাটায় বিশেষজ্ঞদের টুঁটি চেপে ধরতে। এ-রকম অনেক ভুক্তভোগীর দলিল আমাদের কাছে আছে।

২০০৫ সালে পাকিস্তানের জিও টিভি'র সাক্ষাৎকারে কেন্দ্রীয় শারিয়া কোর্টের উপদেষ্টা, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় ধর্মমন্ত্রী, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রধান খতিব, প্রাক্তন আইন-সেক্রেটারী, তাহরিক-এ আমারাত শারিয়াত-এর আমীর, ডেপুটি ডিরেক্টর ইকবাল অ্যাকাডেমি, প্রাক্তন ডিরেক্টর-জেনারেল দাওয়াহ অ্যাকাডেমি, শারিয়া বিভাগের ডীন ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, এবং আরও অনেক বিখ্যাত ইসলামি নেতৃবৃন্দ বলেছেন, জ্বেনা ও ধর্ষণের আইনটা ইসলাম-বিরোধী। কিন্তু শারিয়াপন্থী রাজনৈতিক দল এ-আইন উচ্ছেদ তো দূরের কথা, ছুঁতেও দেবে না।

১৫ই নভেম্বর ২০০৬ (৩৬ মুক্তিসন) যখন এ নিবন্ধ আমি লিখেছি তখন বি-বি-সি'তে খবর দেখেছিলাম পাকিস্তানের জাতীয় সংসদে 'নারী-রক্ষা বিল' প্রস্তাব পাশ হয়ে গেছে, এখন এটা প্রেসিডেন্টের কাছে গেছে, তাঁর শুধু সই করাই বাকি। এতে শারিয়াপন্থী রাজনৈতিক দল ক্ষিপ্ত হয়ে দেশব্যাপী আন্দোলনের ও সংসদ থেকে পদত্যাগের হুমকি দিয়ে বলেছে "শারিয়া মোতাবেক এই আইনই সঠিক, এর কোন রকম পরিবর্তন কোরাণ ও শারিয়ার খেলাফ। এ-পরিবর্তন দেশকে অবাধ যৌনতার স্বর্গ বানাবে।" ওদের ওই কথা ঠিক কি না আপনারাই বলুন আরেকবার আইনটার দিকে তাকিয়ে। "পরকীয়া ও ধর্ষণের প্রমাণ হবে চারজন বয়স্ক পুরুষ মুসলমানের চাক্ষুষ সাক্ষ্য বা অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি" – নারী সাক্ষ্য চলবে না, হুদুদ আইন নং ৭ (১৯৭৯), নং ২০, ৮-এর খ (১৯৮০) দ্বারা সংশোধিত। এই হল পাকিস্তানের শারিয়াপন্থীদের মানসিকতা।

সব মিলিয়ে পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থা বড়ই করুণ। একই দুর্ভাগ্য হয়েছে নাসেরের মিশরের, ডঃ মোসাদ্দেকের ইরাণের, এবং সুকর্নোর ইন্দোনেশিয়ার। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এইসব গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর প্রতিটি নেতাই ছিলেন শারিয়া-রাষ্ট্রের বিরোধী ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রবক্তা। অথচ আজ এসব দেশ শারিয়া-ভিত্তিক ইসলামি রাষ্ট্রের মরীচিকার পেছনে এতিমের মত ঘুরছে। মুহম্মদ আলী জিন্নাহ স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং সংসদে প্রথম বক্তৃতায় সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক গণতন্ত্রের, সেই পাকিস্তান এখন ধর্মীয় স্বৈরতন্ত্রের সুকঠিন বেড়াজালে বন্দি। অথচ ১৯৪১ সালে কংগ্রেস নেতা কে.এম.মুন্সী যখন বলেছিলেন পাকিস্তান হবে শারিয়া-ভিত্তিক ইসলামি রাষ্ট্র তখন অনতিবিলম্বে জিন্নাহ গর্জে উঠে বলেছিলেন ওটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা, পাকিস্তান হবে ইংল্যাণ্ড ক্যানাডার মত আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র – (পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি, প্রক্তিন রাষ্ট্রদূত কামরুদ্দীন আহমদ, পৃষ্ঠা ৫২)। ১৯৪৭ সালে মুসলিম লীগ নেতা মাহমুদাবাদের নবাব যখন বলেছিলেন পাকিস্তান হবে ইসলামি রাষ্ট্র, জিন্নাহ অনতিবিলম্বে ওই একই ঘোষণা দিয়েছিলেন – পিতৃভূমি ও স্বরূপ অন্বেষণ – কামরুল হাসান। সেই জিন্নাহ

এখন পাকিস্তানে ফিরে এলে কি নিজের দেশ চিনতে পারবেন ? তিনি কি বিশ্বাস করতে পারবেন তাঁর দেশের শক্তিশালী শারিয়াবাজ ফয়জুল্লাহ উন্মুক্ত ঘোষণা দিচ্ছে পোলিয়ো'র টিকা নেয়া চলবে না, ও টিকা শারিয়ায় হারাম এবং ঐ রোগে মারা গেলে মানুষ শহীদ হবে ! – (http://ace.mu.nu/archives/216745.php)।

নাইজিরিয়ার শারিয়াবাজেরা তো জাতিসঙ্ঘের পোলিয়ো'র টিকা-দলকে দেশে ঢুকতেই দেয়নি – ও টিকা নাকি মেয়েদের বন্ধ্যা করার পশ্চিমা ষড়যন্ত্র। জিন্নাহ কি চিন্তাও করতে পারবেন তাঁরই সৃষ্ট দেশের সরকার কিভাবে শারিয়াপন্থীদের সামনে এত অসহায় হয়ে পড়ল ! উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে শারিয়া-সরকার গঠনের পর সেখানে কি হয়েছে তা আগে বলা হয়েছে। পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার চেয়ারম্যান আবদুল ওয়াহিদ জাকোতি বলেন সেখানকার আইন-শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েছে – (পাকিস্তান নিউজ ৮ই মে, ২০০৭)। জিন্না'র কেমন লাগবে যখন তিনি দেখবেন ওরা নিজেদের গৌরবময় সভ্যতার ঐতিহ্যকেও অস্বীকার করছে ? ২০০৭ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীতে সংসদে তারা মারমুখী হয়ে দাবি করেছে স্কুলের বই থেকে সিন্ধু অববাহিকার বিশ্ববিখ্যাত গান্ধারা সভ্যতা, মহেঞ্জোদাড়ো-হরপ্পা এবং হিন্দু ও বৌদ্ধ পর্ব, সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের ইতিহাস ইত্যাদি সবকিছু বাদ দিতে হবে, বাচ্চাদের ওগুলো জানা চলবে না। শিক্ষামন্ত্রী এর প্রতিবাদ করলে তারা চিৎকার করতে করতে সংসদ থেকে বেরিয়ে গেছে – "ওগুলো আপনাদের ইতিহাস হতে পারে কিন্তু আমাদের ইতিহাস শুরু হয়েছে মক্কা-মদীনা থেকে"– (দ্য ডন, ২২শে ফেব্রুয়ারী ২০০৭) – http://www.dawn.com/2007/02/22/top2.htm

জিন্নাহ হয়ত আত্মহত্যা করবেন যখন দেখবেন সংসদের স্পীকার শারিয়াপন্থীদের এ-প্রস্তাব বাতিল করার সাহস পাননি – কি এক অখ্যাত কমিটির কাছে পাঠিয়েছেন "সিদ্ধান্তের" জন্য।

সরকারের এই নতজানু নীতির ফলে ওদের সাহস ও দাবি অবধারিত বাড়তে থাকে। বাংলাদেশেও ঘটেছে এটা। যে বাংলাদেশে একটা বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় নেই সেখানে তারা আরবি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার জন্য হুঙ্কার দেয়। নিজেরই শিল্প-সংস্কৃতি ওদের কাছে শির্‌ক হয়ে দাঁড়ায়। ওদের কাছে আমাদের শহীদ মিনারে ফুল দেয়া শির্‌ক, মুক্তিযুদ্ধের শিখা চিরন্তনী শির্‌ক, নববর্ষের উৎসব শির্‌ক, মায়াময় বাঙালিনীর নাচ-গান-টিপ-শাড়ির মায়াময় সংস্কৃতি সবই আপত্তিকর। পাকিস্তানেও বাসন্তী উৎসব বাতিলের দাবি উঠেছে। মধ্যপ্রাচ্যের বাদশারা শারিয়াপন্থীদের এভাবেই গড়ে তোলে যাতে মুসলিম-বিশ্ব তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ভুলে আরবের সাংস্কৃতিক উপনিবেশ হয়ে আরব-সংস্কৃতি পালনের মধ্যে সওয়াব খুঁজে ওদের পদলেহী হয়ে থাকে।

পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থা সত্যি করুণ। নীচের সংবাদগুলো নেয়া হয়েছে প্রধানত পাকিস্তানের পত্রিকা ডন, ইন্টারন্যাশনাল নিউজ, ডেলী টাইম্‌স্ ইত্যাদি থেকে। ফেব্রুয়ারী ২০০৭ থেকে ইসলামাবাদের লাল মসজিদের খতিব ইমাম মওলানা আবদুল আজিজ শারিয়া-আন্দোলনে নেমেছে এবং হাজার হাজার অন্ধবিশ্বাসীকে 'শারিয়া বা শহীদ' শ্লোগানে উত্তেজিত করতে পেরেছে। তারা মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে অস্ত্র হাতে তুলে নেবার নির্দেশ দিয়েছে ও প্রেসিডেন্ট হাউসে আত্মঘাতী বোমা মারার হুমকি দিয়েছে। হাজার হাজার ছাত্ররাও আত্মঘাতী হতে তৈরি হয়ে আছে। সরকার পুরোপুরি শারিয়া প্রয়োগ করেনি এই অজুহাতে তারা দশজন ইমামকে সাথে নিয়ে বলেছে সরকারের কোন দরকার নেই, তারা নিজেরাই শারিয়া প্রয়োগ করতে পারে। তারা মসজিদ-ভিত্তিক শারিয়া কোর্ট বানিয়ে ফেলেছে এবং তাদের শারিয়া-বাহিনী পুরো ইসলামাবাদকে এক হিসেবে দখল করে রাস্তায় রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। আপনাদের মনে আছে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটে ২৩শে ফেব্রুয়ারী ২০০৬ সালে আমাদের শারিয়াপন্থীরা ঘোষণা দিয়েছিলেন তাঁদের গ্রাম থেকে জেলা হয়ে বায়তুল মোকাররম পর্যন্ত এক মহা শারিয়া-আদালত গড়ে তুলবেন ? একই দেশে এটা এক সমান্তরাল বিচারব্যবস্থা যা পরিষ্কার রাষ্ট্রদ্রোহিতা। তাই তাঁরা এটাকে বলবেন 'ইসলামি পরামর্শ ব্যবস্থা' – যাতে আইনের পাল্লায় না পড়তে হয়। খেল্‌টা সরকার বা জনগণ বুঝতে পারলেও কিছুই করতে পারবে না। তারপরে তাদের বেসরকারি 'শারিয়া-পুলিশ' এসে এমন ভয়ঙ্কর সামাজিক চাপ ও ধর্মীয় আবেগ সৃষ্টি করবে যে কেউ সরকারি আদালতে যেতে পারবে না। এ এক ভয়াবহ পরিকল্পনা যা ইউরোপে অত্যন্ত সফল এবং যা ঠেকাবার কোনই আইনগত উপায় নেই। পাকিস্তান সরকারের নাকের ডগায় এ বাহিনী অনেক গানের সিডি-ডিভিডি-ভিডিওর দোকান পুড়িয়ে দিয়েছে ও বাকি দোকানগুলোকে বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে। লস্কর-এ তৈয়েবা জাতীয় অসংখ্য জঙ্গী দল এতে সমর্থন দিয়েছে। সারা দেশে এ-নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে – করাচির সুশীল সমাজ প্রচণ্ড প্রতিবাদ করেছে। কিন্তুমাত্র একটি রাজনৈতিক দল প্রতিবাদ করেছে, মুত্তাহিদা কওমি মুভমেন্ট। বাকি সবাই ভীত-সন্ত্রস্ত। এর আগে পাকিস্তানের খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ পাদ্রী তাঁর পাসপোর্ট ফিরিয়ে দিয়েছেন এই দুঃখে, নিজের দেশেই তাঁদের কোনই সম্মান ও অধিকার নেই। কেন্দ্রীয় ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সংসদ দু'টো উত্তেজনা ও বাক্‌যুদ্ধে সদা থরহরি কম্পমান।

তারপরে মন্ত্রী সাহেব লাল মসজিদে গিয়ে শারিয়া-মওলানার সাথে সংলাপ শেষে সাংবাদিকদেরকে সুখবর দিলেন – "শারিয়াপন্থীদের সব দাবি মেনে নেয়া হয়েছে...কারণ দেশে শারিয়া-বিরোধী কেউ নেই।"

ব্যাস, কেচ্ছা খতম।

গত ১২ই মে, ২০০৭ তারিখে পাকিস্তান কেঁপে উঠেছে তার ইতিহাসে ভয়াবহতম

রাজনৈতিক দাঙ্গায়। করাচীতে খুন হয়েছে অন্ততঃ ৪০ জন, দু'জন পুলিশ সহ। সঙ্ঘর্ষ আরও ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপক প্রাণহানী হবে এটা সবাই বলছেন। দাঙ্গাটা বরখাস্ত প্রধান বিচারপতি ইফতেখার চৌধুরীকে কেন্দ্র করে হলেও অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে আছে শারিয়া। তার পক্ষে-বিপক্ষে দু'দলই অস্ত্রে সজ্জিত, দু'দলের গর্জন-হুঙ্কারে পাকিস্তানের আকাশ-বাতাস কম্পমান এবং সরকার হয়ে পড়েছে কোণঠাসা। এদিকে ইফতেখার চৌধুরীর পরে সাংবিধানিকভাবে অ্যাক্টিং প্রধান বিচারপতি হয়েছেন সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ বিচারপতি ভগবান দাস। তাতে শারিয়াপন্থীদের প্রচণ্ড গাত্রদাহ শুরু হয়েছে, তাঁরা ঘোষণা দিয়েছেন সাংবিধানিক হোক বা না হোক কোন অমুসলিম পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি হতে পারবে না। আইনগত অধিকার থাকলেও বেচারা ভগবান দাস এখনও অ্যাক্টিং থেকে পূর্ণ প্রধান বিচারপতি হতে পারেননি, পারবেন বলে মনেও হয় না। অথচ পাকিস্তানের শুরুর দিকে প্রধান বিচারপতি মোঃ মুনিরের অবসর গ্রহণের পর ১৯৬০ সালের মে থেকে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮ পর্যন্ত দীর্ঘ আট বছর প্রধান বিচারপতি ছিলেন ক্যাথলিক খ্রীষ্টান বিচারপতি অ্যালভিন রবার্ট কর্নেলিয়াস। আইনের জয় হয়েছে ও কারো কোন প্রতিবাদ ওঠেনি কারণ তখনো পাকিস্তান শারিয়া-মানসিকতায় আক্রান্ত হয়নি।

এখানে একটা কথা না বললেই নয়। লর্ড কর্ণওয়ালিস ভারতের অন্য কোন জায়গায় না করে শুধুমাত্র বাংলায় আইন করেছিলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের, যাতে জমিদাররা বৃটিশ সরকারকে টাকা দিয়ে জমিদারি কিনত এবং অত্যাচার করে খাজনা আদায় করে বড়লোক হয়ে যেত। এতে করে সব পুঁজি লগ্নী হল উৎপাদনহীন জমিদারি ব্যবসায়ে, অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলায় শিল্প-কারখানার কবর হয়ে গেল। আগে থেকেই ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টির দাবি ছিল বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদের, সে দাবি পরে মুসলিম লীগ নিজের করে নিয়ে ষাট দশকের প্রথম দিকে জমিদারি উচ্ছেদের আইন পাশ করে, যদিও ক্ষতিপূরণ সহ। আমরা জমিদারি মুক্ত হই কিন্তু আইনের ফাঁকে পাকিস্তানে ওরা ওদের জমিদারি ঠিকই বাঁচিয়ে রেখেছিল, আজও যা বহাল তবিয়তে আছে। পাকিস্তানের রাজনীতি তাই ভূস্বামী-জমিদারেরাই নিয়ন্ত্রণ করছে। কাজেই জমিদার-মুক্ত বাংলা এবং জমিদার-ভুক্ত পাকিস্তানের রাজনীতির ধারাটাই সম্পূর্ণ আলাদা চরিত্রের হয়ে গেছে। কিন্তু বাংলাদেশ পাকিস্তান নয়। আমাদের রাজনীতিতে দুর্নীতি ভয়াবহ কিন্তু সেটা মেরামতের যোগ্য। পাকিস্তানের মত আমাদের রাজনীতি সামন্তশ্রেণীর কুক্ষিগত নয়। আমাদের জাগ্রত নারী-সমাজ আছে – বুদ্ধিমান সুশীল সমাজ আছে, অগ্রসর জাতি আছে।

ওগুলো আছে আমরা পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ বানিয়েছি বলেই। নাহলে কেন্দ্রের সামরিক প্রেসিডেন্টের কলমের খোঁচায় আমরাও শারিয়া-দেশ হয়ে ওই অনৈসলামিক মোল্লাদের খপ্পরে পড়ে যেতাম। প্রতিবাদ প্রতিরোধ পার হয়ে বাঙালি একদিন নিশ্চয়ই পৌঁছে যেত দুর্বার প্রতিশোধে, কিন্তু তাতে অজস্র রক্তক্ষয় হত, যেমন হয়েছে একাত্তরে। কিন্তু শারিয়া আইনগুলোর যেহেতু দেশ চালাবার সামর্থ্য ও শক্তি নেই তাই অনেক ভোগান্তি ভুগে অনেক রক্তক্ষয় করে পাকিস্তানকে ফিরে আসতেই হবে ধর্মনিরপেক্ষ সরকারে। ইরাণের ভাগ্যেও এই একই রক্তাক্ত নিয়তি অপেক্ষা করছে। শারিয়া আইনগুলো না বদলালে এ দুই দেশে শারিয়ার পতন হবেই একদিন, – তাতে বিশ্ব-মুসলিমের বড় রকমের একটা বিবর্তন হবে। কিন্তু এ-মুহূর্তে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে পাকিস্তানের ভোগান্তি থেকে। দেখে না শিখলে আমাদেরকে ঠেকে শিখতে হবে ভয়াবহ মূল্য দিয়ে ।

পাকিস্তানের মতই আমাদের বাংলাদেশেও নারী-অধিকারের চেষ্টা প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হচ্ছে আমাদের শারিয়াপন্থী দল দ্বারা। সংসদে এ-বিল প্রস্তাবের পর কি মারাত্মক ষড়যন্ত্রময় খবর উঠেছে দেখুন, সারাংশ ঃ

"সরকার দ্বারা গৃহীত 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি –৯৭'-এর বেশ কয়েকটি ধারা বদলে ফেলা হয়েছে। গৃহীত নীতির ৭.১ ধারায় বর্ণিত 'সমান অধিকার' শব্দ দু'টিকে বাদ দিয়ে করা হয়েছে 'সংবিধান-সম্মত অধিকার।' ৭.২ ধারার বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত 'সম্পদ, বাসস্থান, অংশীদারিত্ব, উত্তরাধিকার, সম্পদ, ভূমির ওপর নারীর অধিকার' লাইন ও শব্দগুলো বাদ দেয়া হয়েছে। ৭.৩ ধারায় 'নারীর সর্বাত্মক কর্মসংস্থান'-কে বাদ দিয়ে করা হয়েছে 'যথোপযুক্ত।' ধারা ৮ থেকে রাজনীতিতে, মন্ত্রীপরিষদে, সংসদে ও বিদেশে দূতাবাসে নারীর ক্ষমতায়নের কিছু জায়গায় অংশ ও কিছু জায়গায় পুরোটাই বাদ দেয়া হয়েছে" (খবর বি.বি.সি'র)। আমাদের শারিয়াপন্থীরাও এখনও নারীর রাজনীতি করার ঘোর বিরোধী - দৈনিক ইনকিলাব, ২৬ মে ২০০৭। তাঁরা বুঝতে পারছেন না আমাদের নারীরা মূর্খ নন, তাঁদের ধূর্তামি বুঝবার মতো যথেষ্ট জ্ঞানবুদ্ধি আমাদের নারীদের আছে। সময়মতো তাঁরা ঠিকই শাড়িটা কোমরে পেঁচিয়ে হাতে ঝাঁটা তুলে নেবেন।

আমি বুঝতে পারি না নারীরা এমন কি অপরাধ করেছেন, দেশে দেশে নারীর বিরুদ্ধে এমন ষড়যন্ত্র, এমন যুদ্ধঘোষণা কেন করা হয়েছে, তা-ও আবার ইসলামের নামে ! বাংলাদেশের গ্রাম-গঞ্জের ফতোয়ার আদালতেও শারিয়া আইনে ধর্ষিতা নারী বা বালিকাকে চাবুক মেরে শাস্তি দেবার বহু দলিল আমাদের কাছে আছে। পড়ে যাঁদের মনে কষ্ট লাগে তাঁরা নিজেকে এই বুঝ দেন যে, ওগুলো অজ্ঞ মোল্লার অপপ্রয়োগ। কিন্তু যত অবিশ্বাস্যই হোক আসলে ওগুলোই শারিয়া আইন। উদাহরণ দিচ্ছি – বাকি শত শত উদাহরণ পাবেন শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক চর্চা কেন্দ্রের প্রকাশিত 'ফতোয়া ১৯৯১-১৯৯৫' বইতে।

১। মানিকগঞ্জ জেলার গাড়পাড়া ইউনিয়নের তেঘুরি গ্রামে এত ১৩ বছর বয়সের বালিকা তার সৎ-পিতার দ্বারা ধর্ষিতা হইলে ফতোয়ার আদালতে স্থানীয় বর্ষীয়ান ব্যক্তিগণ ধর্ষক এবং ধর্ষিতা দুইজনকেই জুতা দ্বারা প্রহার করিতে করিতে গ্রাম হইতে বাহির করিয়া দেয় – দৈনিক প্রথম আলো ৩০শে আগস্ট, ২০০২।

২। চান্দাইকোনা ইউনিয়নের ঐখোলা গ্রামের দুই কিশোরী কন্যা (১০ ও ১২ বছর) এক তাঁত ব্যবসায়ীর বাড়িতে ধর্ষিতা হলে মাতব্বর আবদুর রহমান খান, আছাব ও মওলানা আবু বকর ফতোয়া দিয়ে তাদেরকে ১০১ ঘা দোর্‌রা মারার নির্দেশ দেন। প্রায় ৫০ দোর্‌রা মারার পর ঐ কিশোরী অজ্ঞান হয়ে যায়। পরে তাকে সুস্থ করে বাকি ৫১ দোর্‌রা কার্যকর করা হয়। ঐ কিশোরী আবার জ্ঞান হারিয়ে পড়ে থাকে মাটিতে। বড় বোনের শাস্তি দেবার পর ছোট বোনের শাস্তি নির্ধারণের জন্য আবার বৈঠক শুরু হয় – সাপ্তাহিক দেশে-বিদেশে ১৫ই মার্চ ২০০২।

৩। ভৈরবে স্থানীয় মাতব্বররা এক ধর্ষিতা কিশোরীর ইজ্জতের মূল্য ৫ হাজার টাকা ধার্য করলে ধর্ষক ৫ হাজার টাকা দিয়ে তার অপকর্মের শাস্তি থেকে রেহাই পায় (ভোরের কাগজ ১৫ই জুলাই, ২০০৫)। এ-শাস্তি শাফি' আইনে বৈধ – উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ "যদি কোন ব্যক্তি শক্তি প্রয়োগ করিয়া কোন নারীকে যৌনকর্মে বাধ্য করে তবে সে ঐ-নারীর উপযুক্ত দেন-মোহরের পরিমাণ অর্থ দিতে বাধ্য থাকিবে"– আইন নং m.8.10। দেখতেই পাচ্ছেন এখানে অন্য শাস্তির কথা নেই, তাই শারিয়া কোর্টে টাকা জরিমানা দিয়ে ধর্ষকের মুক্ত হবার সম্ভাবনা থেকেই যায়। তাছাড়া ধর্ষক গরিব হলে, জরিমানা দিতে না পারলে কি হবে সেটা উল্লেখ থাকা দরকার ছিল।

৪। সিরাজগঞ্জে থানায় আমজাদ এক বিধবাকে ধর্ষণকালে হাতেনাতে ধরা পড়ে। ফতোয়ার শারিয়া-আদালতের রায়ে ধর্ষিতা ও ধর্ষক উভয়কে ১০১ ঘা দোর্‌রা ও ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা ধার্য করা হয় (ভোরের কাগজ ১৪ই এপ্রিল, ২০০৫)।

৫। সালাঙ্গা থানার চক গোবিন্দপুর গ্রামে হাফিজুর চার-পাঁচজন সঙ্গী সহ বিশ বছর বয়স্কা স্বামী-পরিত্যক্তা জয়গুনকে জোরপূর্বক উঠিয়ে নিয়ে ১২-দিন ধরে ক্রমাগত ধর্ষণ করে। সালিশি সভায় মওলানা আবদুল মান্নান এবং গ্রামের বয়স্ক ব্যক্তিবর্গ ফতোয়া দ্বারা ধর্ষিতা জয়গুন বিবিকে আশিটি বেত্রাঘাত, এবং ধর্ষণকারী হাফিজুর রহমানকে আশিটি বেত্রাঘাত ও দশ হাজার টাকা জরিমানা করে (ভোরের কাগজ ১লা জুলাই, ২০০২)।

৬। তোফাজ্জল মাতব্বর তিন সন্তানের মা'কে ধর্ষণ করে। ধর্ষক ধরা পড়ে ও অপরাধ স্বীকার করে। চরমোনাই পীরের মুরীদ আলী খাঁ'র সভাপতিত্বে ধর্ষিতা ও ধর্ষককে ৪০ জুতোপেটা, আর ধর্ষকের আরো পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় (ভোরের কাগজ ১০ই জুলাই, ২০০৩)।

যে কোন বিবেকবান মানুষের বুক এ-সব ঘটনায় কেঁপে ওঠার কথা। বাংলাদেশ যদি কোন একটা দিকে অকার্যকর রাষ্ট্র হয়ে থাকে তবে এটাই সেটা।

মুসলিম-বিশ্বের চোখের সামনে প্রতিদিন এ-রকম হাজারো ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। আমি বুঝতে পারি না আমাদের ইসলামি দলগুলো কেন ইসলামের ওপরে এই কলঙ্ক ও মা-বোনের ওপর এ নিষ্ঠুরতার কার্যকর প্রতিবাদ করেন না। মুশকিল হচ্ছে, কোন দেশে শারিয়া আইনে মানুষের কষ্ট হলে অন্য দেশের শারিয়াপন্থীরা বলেন ওটা শারিয়ার অপপ্রয়োগ, ওরা শারিয়া বোঝেন না, আমরা ক্ষমতা পেলে সব ঠিক করে ফেলব। যেমন একদিকে মধ্যপ্রাচ্যের ক্ষমতাশালী প্যালেস-ইমামের দল, অন্যদিকে ইন্টারনেটের সুবিশাল শারিয়া-সংগঠন ইসলাম-অন্-লাইন। এখানে হাজারো প্রশ্নের জবাবে যে ফতোয়া দেয়া হয় তা পালন করেন অসংখ্য মুসলিম। এর কন্সালট্যান্ট প্রফেসর শাহুল হামিদকে মধ্যপ্রাচ্যে শারিয়া আইনে মানুষের ওপরে অত্যাচারের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাব দেন ঃ "(মধ্যপ্রাচ্যের) যেসব শাসক ইসলামি আইন প্রয়োগ করেন তাঁহারা শারিয়ার মর্মবাণী হয় জানেন না বা তার প্রতি অসৎ ... জনগণকে ভয় দেখাইয়া বা ঠকাইয়া তাঁহারা তাঁহাদের গদি রক্ষা করেন ... কোরাণ-রসুলের দেয়া ন্যায়বিচারের মানদণ্ড মানিয়া চলিতে ব্যর্থ হয়" – http://www.islamonline.net/livedialogue/english/Browse.asp?hGuestID=wF8p2Z

এই হল অবস্থা।

নীচে দেখুন, বিশাল শারিয়া-প্রতিষ্ঠানের মুফতি কিভাবে অসংখ্য নারীর জীবন ধ্বংস করে চলেছেন ইসলামের নামে।

ফতোয়া নং ১৩৩৮৩ দক্ষিণ আফ্রিকা। ২৬ আগস্ট, ২০০৫, শুক্রবার। বিভাগ – আইন ও রায়, মওলানা আমরান ভাওদা, ফতোয়া বিভাগ

প্রশ্ন ঃ যদি কোনো শ্বশুর তার পুত্রবধূকে স্ত্রী মনে করিয়া যৌন-লালসায় স্পর্শ করে তবে এ-ব্যাপারে শারিয়ার রায় কি ?

উত্তর ঃ এ-রকম হইলে সেই পুত্রবধূর বিবাহ চূড়ান্তভাবে বাতিল হইয়া যাইবে।

মুফতি ইব্রাহীম দেশাই কর্তৃক পরীক্ষিত ও অনুমোদিত শারিয়া রায় (সারাংশ) ঃ "কেহ যদি তাহার পুত্রবধূকে লালসার সহিত স্পর্শ করে তবে তাহার পুত্র ও পুত্রবধূ পরস্পরের প্রতি হারাম হইয়া যাইবে। তাহারা আর স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বাস করিতে পারিবে না। এতদ্বারা মুসলমানদিগকে জানানো যাইতেছে যে, দারুল ইফ্‌তা'র কাছে লোকে প্রায়ই এই পরিস্থিতি লইয়া আসে। ইহার ফলে চিরতরে বিবাহ-বিচ্ছেদ হইয়া যায় ও হৃদয়বিদারক অবস্থার সৃষ্টি হয়।"

বলাই বাহুল্য, মুফতি নিজেই এই নৃশংস 'হৃদয়বিদারক অবস্থা'র সৃষ্টি করে তারপর কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করেছেন। আমরা জানি, কোন হারাম দ্বারা কোন হালালকে বাতিল করা যায় না (বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন ৩য় খণ্ড পৃঃ ৫৩৭)। তাই কারো পাপ দ্বারা অন্য কারো বিয়ে বাতিল হতে পারে না। বিয়ে বাতিল হলে বেচারা স্ত্রীর ওপরে কি বজ্র নেমে আসে তা এই মুফতিদের উপলব্ধির বাইরে। নিরপরাধ এই মুসলিম নারী ঘর হারিয়ে নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে, সন্তান হারায়, স্বামী হারায় এবং তার সামনে থাকে অন্ধকার, উপবাস অথবা গণিকাবৃত্তি। এই সব মুফতিদের জন্যই নজরুল বলে গেছেন ঃ "ও হাত হইতে কোরাণ-হাদিস নাও

জোর করে কেড়ে।" আমরা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে মুসলিম ক্যানাডিয়ান কংগ্রেস-এর অফিসিয়াল প্যাড-এ এই প্রতিবাদ পাঠাই [সারাংশ] ঃ

"প্রিয় মুফতি ইব্রাহীম দেশাই,

পুত্রবধূকে শ্বশুরের লালসা-স্পর্শের ব্যাপারে আপনার রায় ভারতে সাম্প্রতিক ইমরানা ঘটনার মতো, বিবাহ বাতিল। এই কাজ করিয়া আপনি ইসলামের ওপরে প্রচণ্ড আঘাত হানিয়াছেন। আপনি কোরাণের সুরা নজ্‌ম ৩৮, ফা'তির ১৮ ও বাকারা ১৩৪ ও ১৪১-কে সরাসরি লঙ্ঘন করিয়াছেন যাহাতে আল্লাহ বলিয়াছেন কেহ অন্য কাহারো (অপ)কর্মের ফল বহন করিবে না। শতাব্দী ধরিয়া ইসলামের নামে এইসব ক্রাইম ঘটিতেছে। বর্তমানে বিশ্ব-মুসলিমের করুণ অবস্থার জন্য আপনার মতো ইসলামি নেতারা অনেকাংশে দায়ী। দয়া করিয়া মুসলিমদেরকে রেহাই দিন, আপনার 'জ্ঞান'-এর শিকার এই সব নিরপরাধিনী ভুক্তভোগীর সামনে আল্লাহ-রসুল-কোরাণ ও ইসলামকে আর বিব্রত করিবেন না। আল্লাহ জানেন আপনার ফতোয়া কত শত নারীর জীবন ধ্বংস করিয়াছে।"

মুফতি কোন জবাব দেননি।

গাড়িটা কেমন সেইসাথে দেখতে হবে ড্রাইভারটা কেমন। এ-দু'টোর যে কোন একটা বিকল হলে দুর্ঘটনা অবশ্যম্ভাবী। সেজন্য শারিয়া আইনগুলো এবং শারিয়াপন্থীদের মানসিকতা, এ দু'টোই খুব খেয়াল করে দেখতে হবে।

২০০৬ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর টাইম পত্রিকায় এক মারাত্মক খবর উঠেছে, সূত্র ঃ http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1537516,1600.html
গোপন ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে সাংবাদিকরা বিখ্যাত মুফতিদের কাণ্ডকারখানা রেকর্ড ক'রে দেখান যে অনেক মুফতি টাকা খেয়ে ঘুষদাতার মতলব-মাফিক ফতোয়া জারি করছে। গ্রাম-গঞ্জের অখ্যাত ফতোয়াবাজ হলেও কথা ছিল, কিন্তু এর মধ্যে ভারতের সর্বোচ্চ এবং বিশ্ব-বিখ্যাত দেওবন্দি ইসলামি সংগঠন দারুল উলুম-এর মুফতিও আছে। এ ভিডিও টেলিভিশনে প্রচারিত হবার পর চারদিকে হৈ হৈ ও ধিক্কার পড়ে যায়। দারুল উলুম অন্ততঃ দু'জন মুফতিকে বরখাস্ত করেছেন। ইসলাম নিয়ে সৌদি আরবেও এ কালখেলার খবর ইন্টারনেটে উঠেছিল। গত সৌদি বাদশাহ মারা গেলে প্রাসাদ-মুফতি ঘোষণা করেছিল কেউ যদি নতুন বাদশাহকে মেনে না নেয় তবে সে মুরতাদ ॥

শারিয়া – অতীতের দলিল

অনেকে বলেন শারিয়া অতীতে ন্যায়ভিত্তিক বিচার-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল। কথাটা ঠিক নয়, ও-আইনে ন্যায় বিচার হওয়া সম্ভব নয়। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের প্রধান কাজই হল অন্য ধর্মের লোকদের চেয়ে নিজ ধর্মের অনুসারীদেরকে বেশি অধিকার ও সুবিধে দেয়া। না হলে সেটা ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রই হয় না। ফিলিস্তিনীরা কি ইসরাইলে সমান অধিকার পেতে পারে ? পারে না। ভারত হিন্দুরাষ্ট্র হলে হিন্দুরা মুসলমানদের চেয়ে বেশি সুযোগ-সুবিধা পাবেই। শারিয়া আইনে আফগানিস্তানের তালেবান সরকার বানিয়ান-এ অবস্থিত বিশ্বের সর্ববৃহৎ বুদ্ধমূর্তি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল ও অমুসলিম নাগরিকদেরকে কপালে হলুদ পট্টি বাঁধতে বাধ্য করেছিল যাতে রাস্তায় মুসলিম-অমুসলিম চেনা যায়। গুজব উঠেছিল ইরাণ সরকারও নাকি এ-আইন চালু করতে যাচ্ছে, পরে অবশ্য সেটা হয়নি (বিশ্ববিখ্যাত সাংবাদিক আমির তাহেরী)। মুসলিম বিশ্ব পরের দিকে আমেরিকার ভয়ে তালেবানদের প্রচণ্ড নিন্দা করে বলেছে এগুলো ইসলাম-বিরোধী কাজ। কিন্তু সহজ সরল পাহাড়ী তালেবানদের বুকে এত পাটা নেই যে ইচ্ছেমত ইসলামের নামে নতুন কিছু করবে। ওরা সরল অন্ধবিশ্বাসে সে আইনই প্রয়োগ করেছে যা হাদিস বা শারিয়ায় আছে। বুদ্ধমূর্তি ভাঙার নির্দেশটা সহি বুখারিতেই আছে (হাদিস নং ২৭০, পৃঃ ১০০, মওলানা আবদুল জলিলের বাংলা অনুবাদ)।

অমুসলিমদের কপালে হলুদ পট্টির আইন আছে 'ওমর'স প্যাক্ট'-এ। তালেবানদের দেখাদেখি ভারতে হিন্দুরা কিংবা ইসরাইলে ইহুদীরা কিংবা পশ্চিমে খ্রীষ্টানরা আমাদের কপালে হলুদ পট্টি লাগিয়ে দিলে আমাদের কি ভয়ানক অবস্থা হবে আর তার জন্য দায়ী কে হবে ? আমরা ওদের ওপরে আমাদের আইন চাপাব, আর ওরা আমাদের ওপরে ওদেরটা চাপাতে পারবে না, এ দাবিই বা করি কি করে ? তালেবানরা হয়ত খতিয়ে দেখেনি ক্ষমতার লড়াইয়ে নিজেদের কুকীর্তিকে হালাল করার জন্য এ-সব দলিল বানিয়েছে পরবর্তী খলিফারা। কেননা অমুসলিমের প্রতি হজরত ওমরের সাম্যবাণী ইতিহাসে মশহুর হয়ে আছে যখন তিনি জেরুজালেম অধিকার করেছিলেন। এমনকি তিনি এক গরিব অমুসলিম গোত্রকে জিজিয়া কর থেকেও রেহাই দিয়েছিলেন। তাই ওই 'ওমর'স প্যাক্ট'-এ আমরা বিশ্বাস করি না। কিন্তু ওটাই বহু জায়গায় প্রয়োগ হয়েছে।

"খলিফা" নামধারী গণহত্যাকারীদের হাতে ইসলাম পড়লে কি সর্বনাশ হয়, ইমাম গাজ্জালী থেকে তার উদ্ধৃতি দিয়েছেন মওলানা মওদুদি ঃ "বাদশাহদের প্রায় সব জমিজমা ও প্রাসাদ (রিয়েল এস্টেট) অবৈধভাবে অর্জিত। কাহারো উচিত নহে এসব সুলতানকে মুখ দেখানো বা তাহাদের মুখ দেখা। তাহাদের অত্যাচারের জন্য তাহাদিগকে ঘৃণা করা উচিত, তাহাদের অস্তিত্বকেই নিন্দা করা উচিত, তাহাদের প্রশংসা করা উচিত নহে...তাহাদের রাজপ্রাসাদ ও সাজ-পোশাককে নোংরা ও অনৈসলামিক ঘোষণা করা উচিত"... তিনি সকল মন্ত্রীদিগকে চিঠিতে লেখেন যে, – "স্বৈরতন্ত্রের অত্যাচার সকল সীমা অতিক্রম করিয়াছে। আমি এইস্থান ত্যাগ করিয়া যাইতেছি যাহাতে স্বৈরতন্ত্রের এই নিষ্ঠুর ও নির্লজ্জ কর্মকাণ্ড আমাকে দেখিতে না হয়" – (এ শর্ট হিস্ট্রি অব্ দ্য রিভাইভালিস্ট মুভমেন্ট ইন্ ইসলাম – পৃষ্ঠা ৬২-৬৩)।

ইমাম গাজ্জালীর ইসলামি ব্যাখ্যার সাথে অনেকের দ্বিমত থাকতেই পারে এবং ছিলও, কিন্তু খলিফাদের অত্যাচারে তাঁর হৃদয়ের বেদনা এতে ফুটে উঠেছে। বস্তুত প্রায় প্রতিটি ইমামই এই কষ্ট নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন যে, ইসলামের নামে যা চলেছে তা ইসলাম নয়। নেতাদের প্রতি আহ্বান রইল তাঁরা যেন কোনকিছু না লুকিয়ে জাতিকে প্রকৃত ইতিহাস শেখান। এটা আমাদেরই ইতিহাস, এর মুখোমুখি না হয়ে উপায় নেই আমাদের। মুসলিম-সভ্যতার যা বিপুল অর্জন তা সেই কৌতূহলী, মানবদরদী এবং মেধাবী বৈজ্ঞানিকদের উপহার এখনো দুনিয়ার বৈজ্ঞানিকেরা স্মরণ করেন কৃতজ্ঞতার সাথে। এর সাথে মুসলিম খেলাফতের যোগ সামান্যই, হাতেগোনা দু'একজন জ্ঞানপিপাসু খলিফা ছাড়া।

অতীতে শারিয়া নারী-অধিকার রক্ষা করেছিল একথাও ঠিক নয়। এ বইয়ের শেষে আইনগুলোর উদাহরণ দেখলেই বোঝা যাবে ওগুলো দিয়ে ন্যায়বিচার সম্ভব নয়। অসংখ্য আইন ও মামলার উদ্ধৃতি দিয়ে ডঃ আমিরা আজহারি তাঁর 'উইমেন, দ্য ফ্যামিলি অ্যাণ্ড ডিভোর্স ল'জ ইন ইসলামিক হিস্ট্রি' বইতে দেখিয়েছেন অতীতেও শারিয়া-রাষ্ট্রে মুসলিম নারীর অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। এমনকি তাঁদের ন্যায্য অধিকার ছেড়ে দেবার জন্য শারিয়া কোর্ট নতুন এক কোরাণ-বিরোধী ফর্ম বানায় যাতে নারীরা বাধ্য হয়ে সই করত। উদাহরণ দিচ্ছি ঃ "...তালাকের পর মোহর আদায় করা স্ত্রীদের জন্য খুবই কষ্টসাধ্য ছিল...সতেরো ও আঠারো শতাব্দীতে প্রচুর খুলা হইত। খুলা পদ্ধতিতে স্ত্রীকে যে কোন প্রাপ্য, এমনকি স্ত্রীর নিজের ও সন্তানদের ভরণপোষণও পরিত্যাগ করিতে হইত। এই জন্য খুলার দলিলে এক অতিরিক্ত কাগজ সংযোজিত করা হয়। উহাতে সন্তানদের নাম, পিতার নাম ও সন্তানদের খরচের ব্যাপারে (স্বামীর দায়িত্ব নাই, এই ব্যাপারে) স্ত্রীর স্বীকৃতির কথা লিখা থাকে। ভিদিন অঞ্চলের হাওয়া খাতুন ১৭৮৩ সালে স্বামীকে খুলা-তালাক দেয়। তাহাকে মোহরের ৪০০০ অ্যাক্সেসের (তৎকালীন তুর্কী টাকা) অপরিশোধিত ১০০০ অ্যাক্সেস এবং ভরণপোষণের অর্থ পরিত্যাগ করিতে হয়...। জুলাই ১৮০২ – ইস্তাম্বুলের হালিমা খাতুন আসিয়া দাবি করিল যে মোহর

পরিত্যাগ করিবার জন্য তাহার স্বামী আহমেদ তাহাকে খুলার জন্য চাপ দিতেছে...। দুর্নীতিপরায়ণ কাজি-রা ষড়যন্ত্র করিত ও ঘুষ খাইত" (পৃঃ ৮৯, ৯২, ১০০, ১০৪, ইত্যাদি)।

যে শারিয়া মুসলমানের মধ্যেই ভিন্নমত সহ্য করতে পারে না সে অমুসলমানদের সাথে কি ব্যবহার করেছে সেটা আমরা পাব নীচের আইনগুলোতে ঃ

১। "শারিয়া কোর্টের জজকে হইতে হইবে মুসলমান। তবে অভিযুক্ত যদি হয় অমুসলিম তবে জজ অমুসলিম হইতে পারে" (পেনাল ল' অব্ ইসলাম ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় হুদুদ আইন, ১৯৭৯-এর ৭, ১৯৮০-এর ২০ দ্বারা সংশোধিত, আইন নং ২১) ; ক্রিমিন্যাল ল' ইন ইসলাম অ্যাণ্ড দ্য মুসলিম ওয়ার্লড, পৃঃ ৪৪৮)।

২। পেনাল ল' অব্ ইসলাম, পৃঃ ১৪৯ ও পৃঃ ৪৭ ঃ "ধর্মের পার্থক্যকেও হিসাবে ধরিতে হইবে, কোন অবিশ্বাসীকে হত্যা করিবার জন্য কোন মুসলমানের প্রাণদণ্ড হইবে না ...কোন অবিশ্বাসী যাহাকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার জন্য শাস্তি দেওয়া হইয়াছে (এবং তার সাক্ষ্য ভবিষ্যতে আর নেয়া হবে না) সে যদি পরে মুসলমান হইয়া যায় তবে তাহার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।"

৩। মুসলিম পুরুষের রক্তমূল্য অপেক্ষা ঃ (১) মুসলিম নারীর রক্তমূল্য অর্ধেক, (২) ইহুদী-খ্রীষ্টানের রক্তমূল্য তিনভাগের একভাগ, ও (৩) অগ্নি-উপাসকের (সম্ভবত হিন্দুদেরও – *লেখক*) রক্তমূল্য পনেরো ভাগের একভাগ (শাফি'ই আইন পৃঃ ৫৯০, Law #o.4.9)।

৪। "ইসলামিক উম্মা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করিবার পর ... রাষ্ট্র পরিচালনায় অমুসলিমদের অধিকার অস্বীকার করিবে ... অমুসলিম নারীদিগকে পোশাকের ব্যাপারে শারিয়ায় বর্ণিত সর্বক্ষি ভব্যতা মানিয়ে চলিতে বাধ্য করিবে ... সিনেমার উপরে বিধিনিষেধ লাগাইবে ... অমুসলিমদের এমন কোন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড করিতে দিবে না যাহা ইসলামের দৃষ্টিতে ক্ষতিকর" (জিহাদ ইন ইসলাম, মওলানা মওদুদি পৃঃ ২৭)। বলা বাহুল্য, কোন্ কাজটা 'ইসলামের দৃষ্টিতে ক্ষতিকর' তা শারিয়াপন্থীরাই ঠিক করবেন।

৫। "যাহারা ইহার (শারিয়া-রাষ্ট্রের) পথনির্দেশ ও পরিকল্পনা মানে না তাহাদিগকে রাষ্ট্রের মৌলিক নীতিমালা প্রণয়নের ব্যাপারে কোন অধিকার দেওয়া হইবে না ... পরিপূর্ণ মুসলমানের এলাকায় অমুসলমানেরা অতীতে নির্মিত আরাধনার স্থানগুলি পুনর্নির্মাণ বা মেরামত করিতে পারিবে কিন্তু তাহাদিগকে নূতন কোন আরাধনা-গৃহ নির্মাণ করিতে দেওয়া হইবে না ... জিম্মিদিগকে (অমুসলিম) দেশরক্ষার দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হইয়াছে ... যুদ্ধে যাইবার মত সমর্থ অমুসলিমের নিকট হইতে কর নেওয়া হইবে" (মওলানা মওদুদি – ইসলামিক ল' অ্যাণ্ড কন্সটিটিউশন, পৃঃ ১৪৬, ২৮৮, ও ২১১)।

৬। "হালাকু খান যখন মওলানাদের জিজ্ঞাসা করিল, ন্যায়বিচারী অমুসলিম রাজা আর অন্যায়কারী মুসলিম রাজার মধ্যে কে বেশি গ্রহণযোগ্য, তখন তাহারা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রথমটিকে (ন্যায়বিচারী অমুসলিম রাজাকে) সমর্থন করিল। এই ঘটনা হইতেই ঐ সময়ের ধর্মীয় নেতৃত্বের অবস্থা (অর্থাৎ ইসলামি মওলানাদের 'অধঃপতন') বোঝা যায়" (এ শর্ট হিস্ট্রি অফ দ্য রিভাইভ্যালিস্ট মুভমেন্ট ইন্ ইসলাম – মওলানা মওদুদি – ৬৫ পৃষ্ঠায় ফুটনোট)।

৭। এবারে দেখুন এই অসাম্য প্রতিষ্ঠিত করতে কিভাবে হজরত ওমরকেও ব্যবহার করা হয়েছে।

উদ্ধৃতি ঃ "ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেন যে, হজরত ওমর ফারুক (রাঃ)-কে বলা হলো যে, এখানে একজন হস্তলিপিতে সুদক্ষ অমুসলিম বালক রয়েছে। আপনি তাকে ব্যক্তিগত মুন্সী হিসেবে গ্রহণ করে নিলে ভালোই হবে। হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) উত্তরে বলেন, "এরূপ করলে মুসলমানদের ছাড়া অন্য ধর্মাবলম্বীকে বিশ্বস্ত রূপে গ্রহণ করা হবে, যা কোরআনের নির্দেশের পরিপন্থী" (পৃঃ ১৯৮, বাংলা কোরাণ – মুহিউদ্দীন খান)।

আপনারা নিশ্চয় খেয়াল করেছেন এ-বইতে আমি বেশির ভাগ দলিল দেখাচ্ছি বিখ্যাত শারিয়া-সমর্থক বিশেষজ্ঞদের থেকেই। এতে পাঠক বুঝবেন সত্যি সত্যিই শারিয়া আইনে মহা সমস্যা আছে। আসলে চার রকম শারিয়া আইনের উদ্ভব হওয়ার সাথে সাথে মানুষের যা স্বভাব তাই হয়েছিল, বিভিন্ন মজহাবের অনুসারীদের মধ্যে প্রচণ্ড বিরোধীতা শুরু হয়েছিল। সবাই বলত তারটাই ঠিক, অন্যরা মিথ্যা এবং ইসলাম নষ্ট করছে। ইউরোপের বিখ্যাত শারিয়া-সমর্থক বিশেষজ্ঞ বিলাল ফিলিপ-এর বই 'দি এভল্যুশন অব্ ফিক্হ্'-এর ১০৭ ও ১৩৯ পৃষ্ঠা থেকে সংক্ষেপে উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ "এইভাবে ইসলাম ধর্মটি চার মজহাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িল। কেহ এই মজহাবের কোনোটিকেও না মানিলে তাহাকে ইসলাম-ত্যাগী ধরা হইত। এই অতিরিক্ত রক্ষণ-প্রবণতা এতদূর গিয়াছিল যে কোনো এক মজহাব ছাড়িয়া অন্য মজহাবের অনুসারী হইলে তাহার শাস্তি হইতে পারিত। হানাফি মজহাবে শাফি-অনুসারীদের সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ করিয়া আইনও করা হইয়াছিল।"

বইটার ১০৬ পৃষ্ঠায় ১৮৮৪ সালের একটা মারাত্মক ছবি আছে যা আমার এ-বইতে দেবার খুব ইচ্ছে ছিল কিন্তু তিনি হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন তাঁর লিখিত অনুমতি ছাড়া কেউ যেন সে-বইটির কোনকিছু ব্যবহার না করে (এটি অনেক লেখকই করেন যদিও ছোটখাটো উদ্ধৃতিতে অসুবিধে নেই)। ছবিটা হল, কাবা শরীফের আঙিনায় চার কোণায় চারটি ছোট ছোট ঘর। তিনি বলছেন, "এক মজহাবের অনুসারীরা অন্য মজহাবের ইমামের পেছনে নামাজ পর্যন্ত পড়িত না। এজন্য মসজিদের ভিতরে নামাজ পড়ার আলাদা জায়গা করা হইয়াছিল। কাবা ঘর পর্যন্ত বাদ যায় নাই। প্রত্যেক মজহাবের ইমামের জন্য কাবার চারিপাশে পৃথক চারটি মঞ্চ বানানো হইয়াছিল। আশ্চর্য যে, কাবা'র চারিপাশে এই পৃথক নামাজের জায়গা বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অক্ষত ছিল। বাদশাহ আবদুল আজিজ ইবনে সৌদি (সৌদি আরব ও সৌদী বাদশাহীর প্রতিষ্ঠাতা)

১৯২৪ সালের অক্টোবরে মক্কা বিজয় করিয়া মজহাব নির্বিশেষে একই ইমামের পিছনে নামাজে সব মুসলিমকে একত্রিত করেন ।”

এই হলো অবস্থা । অর্থাৎ শারিয়া আইন চোদ্দশ’ বছরের মধ্যে তেরোশ’ বছরই মুসলিম সমাজকে বিভক্ত করে রেখেছিল । কতখানি বিভক্ত করে রেখেছিল ? ইমাম মালিকের সমর্থকরা ইমাম শাফি’কে এত মর্মান্তিকভাবে প্রহার করেছিল যে তাতেই তিনি কয়েকদিন পরে মৃত্যুবরণ করেন – চার ইমামের ওপরে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য কেতাবের একটা “দ্য ফোর্ ইমাম্স্” – আবু যাহরা, পৃঃ ২৭৩ । এ-বইটা দুনিয়ার সর্বোচ্চ গবেষকেরা সূত্র হিসেবে ব্যবহার করেন, যেমন হাসান বান্না’র নাতি ডঃ তারিক রামাদান ॥

শারিয়া-আইন কি বিশ্ব-মুসলিমের ঐতিহ্য ?

মোটেই নয়। শারিয়াপন্থীরা যতই বলুন শারিয়া-আইন বিশ্ব-মুসলিমের ঐতিহ্য কিংবা মোগল আমলেও ইসলামি আইন ছিল, মোটেই সত্যি নয়। শারিয়াপন্থীদের দাবির উদ্ধৃতি দেখুন বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ১ম খণ্ডের পৃষ্ঠা ৯ থেকে ঃ

১। "১৭শ' শতকে সর্বপ্রথম মুগল সম্রাট আওরঙজেব আলমগীর সিংহাসনে আরোহণের চার বৎসর পর একটি রাজকীয় ফরমানের সাহায্যে ইসলামি আইনের একটি পূর্ণাঙ্গ সঙ্কলন প্রণয়নের নির্দেশ জারি করেন ... সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ইহাই ইসলামি আইনের সর্বপ্রথম সঙ্কলন।"

২। তুর্কী উসমানী সরকার ১৮৬৯ সালে সাআদাত পাশার নেতৃত্বে একটি কমিটি ... ১৮৫১ ধারা সম্বলিত ইসলামি দেওয়ানি আইনের একটি সঙ্কলন প্রণয়ন করে ... এই সঙ্কলনটি প্রধানত ফাতাওয়া আলমগীরিকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করিয়া রচিত হইয়াছে ... ১৯২৬ সাল পর্যন্ত তুর্কী সাম্রাজ্যে ইহা বলবৎ থাকে।

শারিয়াপন্থীরা এ-ও বলেন ঃ "ভারতবর্ষের মুসলিম শাসন আমলেও দেশে ইসলামি আইন প্রচলিত ছিল...আকবর তাঁর ষড়যন্ত্রমূলক এক অতি অভিনব ধর্ম প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু সেইসাথে তিনি এ উপমহাদেশে মোগল সাম্রাজ্য তথা মুসলিম শাসনের অধঃপতনের বীজও বপন করেন। তার ফলেই ১৭৫৭ সালে পলাশীর মাঠে মুসলিম শাসনের রবি অস্তমিত হয়" (জামায়াতে ইসলামির ইতিহাস, পৃঃ ৩ ও ১৯৮)। এ এক অভিনব ইতিহাস !! এবং মিথ্যা ইতিহাস।

আর আমরা বাঙালিরা নাকি নৃতাত্ত্বিক দিক দিয়ে আরবি। বঙ্গ নামটাও নাকি আদি মুসলিম থেকেই এসেছে – দৈনিক ইনকিলাব ১২ই নভেম্বর ২০০৭ ও ২৫শে জুন ২০০৮। রাজনৈতিক শারিয়াপন্থীরা ভালভাবেই জানে যে একটা মিথ্যেকে বারবার এবং বারবার বলতে থাকলে কিছু মানুষের মনে সেটা ধীরে ধীরে সত্য হয়ে ওঠে, দৈনিক পত্রিকায় হলে তো সোনায় সোহাগা। অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত জনগণের বেলায় এটা আরো সত্যি। রাজনৈতিক শারিয়াপন্থীরা ভালভাবেই জানে যে তারা মিথ্যে বলছে। তারা এ-ও জানে যে আলোকিত লোকেরা তাদের এ মিথ্যে বুঝতে পারে। কিন্তু তারা এ-ও জানে যে আলোকিত লোকেরা বুঝতে পারলেও এ মিথ্যে বলার জন্য তাদের কোন শাস্তি হবে না। এবং তারা এ-ও জানে যে আলোকিত লোকেরা বুঝতে পারলেও অনালোকিত যত লোককে প্রভাবান্বিত করে কব্জা করে যায় ততই তাদের ভোটেও লাভ, মিছিলেও লাভ। এরকম বহু ষড়যন্ত্র চলছে আমাদের মাতৃভূমিকে মরুভূমির অপসাংস্কৃতিক উপনিবেশ করার জন্য। বেশ কিছু ষড়যন্ত্র সফলও হয়েছে। পাকিস্তানে এ ষড়যন্ত্র পুরোপুরিই সফল হয়েছে।

ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, ব্রুনাই, রাশিয়া, চীন, ইউরোপ ও বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তানে কখনোই শারিয়ার শাসন ছিল না। ভারতবর্ষে মোগল বা সুলতানী আমলে তো ছিলই না। সারা ভারতবর্ষে শত শত বছরে চোরের হাত কাটা কিংবা পাথর মেরে হত্যার শাস্তি একটাও নেই। তাহলে আর শারিয়া-রাষ্ট্র কোত্থেকে হল ? রিচার্ড ইটন ভারতে ইসলামের ওপরে বিশ্ব-নন্দিত পণ্ডিত, তিনি বলেন ঃ "ধর্মীয় সংস্কৃতির দিক দিয়ে বাংলার মুঘলদের তিনটি বৈশিষ্ট্য ছিল – চিশতি-তরিকার প্রতি বিশেষ সম্বন্ধ, **ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ** ও অমুসলমানদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করায় তাঁদের অনীহা। ... আলাউদ্দীন হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯) ও তাঁর পুত্র নাসিরুদ্দীন নুসরত শাহ (১৫১৯-১৫৩২)-এর আমলকে সাধারণভাবে বাংলার স্বর্ণযুগ বলা হয়। হুসেন শাহ-এর সময়ে হিন্দুরা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় সরকারে কর্মরত ছিলেন, যেমন তাঁর প্রধান মন্ত্রী, প্রধান দেহরক্ষী, ব্যক্তিগত-একান্ত সচিব, ব্যক্তিগত রাজ-চিকিৎসক, অর্থশালা-প্রধান ও চট্টগ্রামের গভর্নর...।" (The Rise of Islam and the Bengal Frontier – 1204-1780)।

একই কথা বিস্তারিত বলেছেন রামমোহন রায় কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রধান ডঃ তেসলিম চৌধুরী ঃ "মুঘল শাসনে (১৫২৬-১৭০৭) ভারতবর্ষ কখনো ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্র হতে পারেনি ... (মুসলিম) খলিফার প্রাধান্য অস্বীকার করে বাবর যে সার্বভৌম রাজত্বের সূচনা করেন তা রক্ষণশীল সম্রাট আওরঙজেব পর্যন্ত অক্ষুণ্ন রাখেন ... **মুঘল শাসনের সাথে ধর্মরাজ্যের কোন মিল নেই...মুঘলরা দেশ ও কালের প্রয়োজন অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় নীতি প্রবর্তন করেন** ... আওরঙজেব সিংহাসনে বসেন ১৬৫৮ সালে, ২১ বছর পর জিজিয়া প্রবর্তন করেন ১৬৭৯ সালে ও ১০ বছর পর ১৬৮৯ সালে দাক্ষিণাত্যে জিজিয়া রহিত করেন ... শাহজাহানের সময় ১১০ জন হিন্দু মনসবদার ছিল, আওরঙজেবের সময় ছিল ১০৫ জন, তার মধ্যে ৭০০০-হাজারি মনসবদার ছিল জয়সিংহ ও যশোবন্ত সিংহ – মোঘল আমলে

এটা এই প্রথম...বাংলায় আকবরের আমলে ৯ জন, জাহাঙ্গীরের আমলে ৫১ জন এবং আওরঙজেবের আমলে ১৬০ জন উচ্চপদস্থ হিন্দু কর্মচারী ছিল...মুঘল শাসনে বাংলায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ঘটে ... (তার আগে বাংলার সুলতানি আমলে ৭১২-১৫২৬) সুলতানি শাসন সম্পূর্ণ আলাদা ছিল, মদ্যপান ও অবৈধ বহু নারীসঙ্গ এগুলিকে ভোগবিলাসের উপকরণ হিসেবে সুলতানগণ কমবেশি গ্রহণ করেছিলেন" (মধ্যযুগের ভারত, ১ম ও ২য় খণ্ড, বিভিন্ন পৃষ্ঠা)।

মোগল-দরবার ভরা ছিল অমুসলিম রাজন্য-আমাত্য দিয়ে আর অন্তঃপুরে অনেক সময়ই ছিলেন অমুসলিম রাণীরা – যাঁদের বিয়ে করা ইসলামে অবৈধ। তাঁরা অমুসলিম উৎসবগুলোও পালন করতেন রাষ্ট্রীয়ভাবে, যেমন দিওয়ালী, নওরোজ, ইত্যাদি। মোগল আমলে ইসলামি শাসন ছিল না সেটা মওলানা মওদুদিও জানতেন। তাই তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন ঃ "যদি এই ইসলামই (অর্থাৎ শারিয়া-ভিত্তিক ইসলাম) ভারতের বুকে পেশ করা হতো এবং তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যাঁরা বাইরে থেকে এসেছিলেন এবং এখানে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা যদি চেষ্টা করতেন তাহলে ভারতের চিত্র অন্য রকম হতো" (পাঠানকোটের বক্তৃতা – ১৯, ২০ ও ২১শে এপ্রিল, ১৯৪৫)। মোগল শাসনকে শারিয়াপন্থীরা "ইসলামী শাসন" হিসেবে খুব দাবি করেন কিন্তু ইতিহাসে পাওয়া যায় ঠিক উল্টো ঃ "লক্ষ্য করা দরকার যে, জন্মসূত্রে সুন্নি হইলেও সম্রাট হুমায়ুন শের শাহ্-এর কাছে রাজ্য হারাইবার পর তাহা উদ্ধারে ইরাণী সম্রাটের সাহায্যপ্রাপ্তির পূর্বশর্ত হিসেবে শিয়া ধর্মে ধর্মান্তরিত হন। ... ইরাণের সম্রাট হুমায়ুনের সম্মানে এক ভোজের আয়োজন করেন ... সম্রাট জাহাঙ্গীরের মাতা ছিলেন হিন্দু ... তাঁহার দুই হিন্দু মহারাণী মানবাঈ ও মহারাণী জগতের প্রবল প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল ... আওরঙ্গজেব বাজীপুর, হায়দ্রাবাদ ও লক্ষ্ণৌ-এর মুসলিম নবাবদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেন।"

রাণীরা হিন্দু কিন্তু রাজত্ব ইসলামি ? হতে পারে এটা ? এর ফলেই আমরা মুঘল দরবারে ইরাণের ফার্সী ভাষার প্রাধান্য দেখি যা ভারতের মুসলমানদেরকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছে। আজো ফার্সী ভাষার "খোদা", "নামাজ", "রোজা" ইত্যাদি বহু ফার্সী শব্দ আমাদের ইসলামী ঐতিহ্য হয়ে রয়েছে অথচ খোদ আরবের লোকেরা ওগুলো বোঝেও না। ওগুলোর আরবী শব্দ হলো যথাক্রমে আল্লাহ্, সালাত, ও সায়েম।

বাঙালি বুদ্ধিমান জাতি। রাজা মুসলমান হলেই সেটা ইসলামী রাষ্ট্র হয় না তা জাতি ঠিকই বোঝে। ঘটা ক'রে যতই "বখতিয়ার খিলজী দিবস" পালন করা হোক না কেন ওটা যে একটা যুদ্ধমাত্র ও তার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই সেটাও জাতি বিলক্ষণ বোঝে। সিরাজুদ্দৌলাও তাই। সিরাজুদ্দৌলার শাসন 'মুসলিম শাসনের রবি' ছিল বলে দাবি করেন অনেকে। কিন্তু রাজ-দরবারে সর্বোচ্চ পদগুলোতে দাপটের সাথে কাজ করেছে মাণিকচাঁদ, উমিচাঁদ, জগৎশেঠ, কৃষ্ণবল্লভ, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, নন্দকুমার প্রমুখ অমুসলিমের দল। সেনাপতির ওপরেই রাজাদের মাতব্বরি চলে। সিরাজের সেনাপতি ছিলেন বিশ্বস্ত হিন্দু ও

কাশ্মীরী দুই সেনাপতি মীরমদন ও মোহনলাল। তাঁরা ক্লাইভ-ওয়াটসন-কিলপ্যাট্রিকের হাতে প্রাণ দিয়েছেন কিন্তু নবাবকে ছেড়ে পালাননি। আর মীরজাফর পলাশীর সেই ঘোর নিয়তির সময় কোরাণ হাতে (শোনা কথা, সম্ভবত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে আছে) নবাবের পক্ষে যুদ্ধ করার কসম খেয়েছিল, যার বিশ্বাসঘাতকতায় আমরা পরাধীন ছিলাম ১৯০ বছর। বাংলার ইতিহাসে চোরের হাতকাটা বা পরকীয়ার পাথর মেরে মৃত্যুদণ্ড একটাও নেই। বাংলার ইসলাম প্রচারকরা বাংলার ধারেকাছে শারিয়া আইনকে আসতে দেননি ॥

শারিয়া আল্লাহ'র আইন হলে...

দুনিয়ায় হাজার হাজার বিশ্বাস-ভিত্তিক দাবি চালু আছে। শারিয়াপন্থীদের শারিয়ায় বিশ্বাসের মত একই বিশ্বাসে কোটি কোটি হিন্দু বিশ্বাস করে মানুষের শরীরে হাতির মাথা নিয়ে গণেশ হল সিদ্ধিদাতা, ও-থেকেই নাকি আজকের অর্গ্যান ট্র্যান্সপ্ল্যান্ট এসেছে যেমন একজনের চোখ বা হৃৎপিণ্ড বা কিডনী অন্যের দেহে লাগানো। রামায়ণের যুদ্ধে রাবণ আকাশের পুষ্পক রথ থেকে রামের ওপরে অগ্নিবাণ মেরেছিল। এ-থেকেই নাকি আজকের ফাইটার প্লেন আর ব্যালিস্টিক মিসাইলের জন্ম। যুগ যুগ ধরে অনেকে এধরনের ভিত্তিহীন দাবি করেছেন শারিয়া সম্বন্ধেও। কিছু বিষয় আগের অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করেছি, বাকি কয়েকটা তুলে দিচ্ছি।

- আল্লাহ এক। শারিয়া আল্লার আইন হলে আইন একটাই হতো, চার-পাঁচ রকম হতো না। বিভিন্ন শারিয়ার মধ্যে পার্থক্য, বিরোধ বা উল্টো আইনও থাকত না।
- শারিয়ার কি কি আইন কোরাণের কোন্ কোন্ আয়াতকে ও তার পটভূমিকে লঙ্ঘন করে তার কিছু উদাহরণ দেখানো হয়েছে, আরও আছে আমার Banglarislam.com ওয়েবসাইট-এ। শারিয়া আইন যদি আল্লার হয় তবে তা আল্লার কোরাণকে লঙ্ঘন করার প্রশ্নই ওঠে না।
- ইমাম মালিক-আবু হানিফা-হাম্বল-শাফি'র মধ্যে বিপুল মতবিরোধ ছিল। এ-সব বিরোধের সমন্বয় করার চেষ্টা করেছেন ইমাম শাফি' তাঁর 'রিসালা' বইতে, কিন্তু তিনিও ইরাক থেকে আরবে গিয়ে একবার, আর আরব থেকে মিশর যাবার পরে দ্বিতীয়বার তাঁর ব্যাখ্যা বদলেছেন। আল্লার আইনে এ-সব পরিবর্তনও হয় না, বিরোধও হয় না, এবং সে বিরোধ মানুষের মেটানোর প্রশ্নও ওঠে না।
- কোরাণে শাশ্বত সামাজিক আইনের আয়াত কয়টা এই মূল ব্যাপারেও একমত হতে পারেননি বিশেষজ্ঞ বা আলেমরা। যেমন ঃ (১) অনেকে বলেছেন শূন্য – (মওলানা চিরাগ আলী থেকে শুরু করে ইমাম বোখারী পর্যন্ত – এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা ১৯৮৩)। আমি জানি না কি করে এটা হয় কারণ মদ্যপান কিংবা শূকরের মাংস নিষিদ্ধ, এটা চিরকালের সামাজিক আইন। কেউ কেউ অবশ্য প্রশ্ন করতে পারেন নিতান্ত বাধ্য হলে প্রাণ বাঁচানোর জন্য সেটাও সামান্য খাবার অনুমতি কোরাণে আছে। (২) আশি – ডঃ তাজুল হাশমী। (৩) দুইশ' – ইমাম শাফি'র রিসালা। (৪) সাড়ে তিনশ' – প্রিন্সিপল্স্ অব্ ইসলামিক জুরিস্প্রুডেন্স পৃষ্ঠা ২৬। (৫) পাঁচশ' – শারিয়া দি ইসলামিক ল' পৃষ্ঠা ৭ ও কুরাণিক ল' অব্ ক্রাইম্স্ পৃষ্ঠা ৬ ইত্যাদি। এর মধ্যে কোন্টা আল্লাহ'র আইনের আয়াতের আসল সংখ্যা ? যার মূল বিষয়েই এত বেশি মতভেদ তাকে আল্লার আইন হিসেবে দাবি করা যায় না।
- শারিয়াপন্থীরা মনে করেন আল্লাহ বড় মেহেরবানি করে মানুষকে শারিয়া দিয়েছেন যাতে সব অমুসলিম-রাষ্ট্র উচ্ছেদ করে শারিয়ার ভিত্তিতে দুনিয়াময় ইসলামি রাষ্ট্র কায়েম করে মানুষ সুখে-শান্তিতে থাকতে পারে। কিন্তু আমরা জানি আরও হাজারটা জিনিস আইনের চেয়ে ঢের বেশি দরকার অথচ আল্লাহ সেগুলো সরাসরি দেননি। কাল সকাল থেকে দুনিয়ার সব কাপড় উধাও হয়ে গেলে কি ভয়াবহ অবস্থা হবে ? মানুষ বাইরে বেরুতে পারবে না, অফিস-কল-কারখানা হাট-বাজার বাস-ট্রেন-প্লেন-লঞ্চ-স্টীমার পোস্ট-অফিস সব বন্ধ হয়ে যাবে, বাড়ির ভেতরেও মানুষ বাবা-মা ভাই-বোন ভাবী-দুলাভাই চাচা-চাচী কারো সাথে থাকতে পারবে না। এমন অতি দরকারি জিনিসটাও যখন মানুষকেই বানিয়ে নিতে হয়েছে আল্লাহ আশমান থেকে তৈরি করে পাঠাননি, তখন আল্লাহ কেন রাষ্ট্র চালানোর আইন বেহেশ্ত্ থেকে তৈরি করে পাঠাবেন ? শত-লক্ষ-কোটি বছর ধরে কোটি কোটি বাবা-মায়ের চোখের সামনে বাচ্চারা, বাচ্চাদের সামনে বাবা-মা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রীর সামনে ভাই-বোন স্বামী-স্ত্রী সহ কষ্ট পেয়ে ডায়াবেটিস-ম্যালেরিয়া-বসন্ত-প্লেগে কাতরাতে কাতরাতে মরে গেছে, আল্লাহ্ বেহেশ্ত্ থেকে কোন ওষুধ তৈরি করে পাঠাননি। আগুন, ভাষা, প্লাস্টিক বা রবার ছাড়া দুনিয়া এক মুহূর্তে অচল হয়ে পড়বে। কিন্তু তবুও সরাসরি আল্লাহ ও-সবের কোনকিছুই দেননি, দেবেনও না। মানুষের দরকার পূরণের জন্য তিনি দিয়েছেন দু'টো অপূর্ব অস্ত্র – বুদ্ধি আর বিবেক। দিয়ে বলেছেন যাও, এখন চরে খাও, আর শয়তানের হাত থেকে বেঁচে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ কর, আখেরে আমি কাহ্হার (প্রচণ্ড পাকড়াওকারী) হয়ে ধরব। মানুষ প্রয়োজনমত সবকিছু আবিষ্কার করেছে, ভবিষ্যতেও করবে। কাজেই আল্লাহ্ মানুষকে বাকি সবকিছু বাদ দিয়ে শুধু রাষ্ট্র চালানোর আইন দিয়েছেন তা হতে পারে না।

- "এমনকি খুলাফায়ে রাশেদীন বিচারক হিসেবে ইজতিহাদের ভিত্তিতে যে-সব রায় প্রদান করিয়াছেন তাহাও শরিআতে আইন হিসেবে স্বীকৃত নহে" (বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ১ম খণ্ড ২য় ভাগ পৃঃ ১৩)। যদি নবীজীর পরে স্বয়ং সাহাবী খোলাফায়ে রাশেদীনের সিদ্ধান্তই 'আল্লার আইন' হতে না পারে তবে এক-দেড়শ' বছর পরের অন্যান্য ইমামদের ব্যক্তিগত মতামতও 'আল্লার আইন' হতে পারে না।
- সুদূর অতীতের সেই বিশেষ সময়ের বিশেষ সমাজের বিশেষ ঘটনার নির্দেশকে সবার ওপরে চিরকাল চাপিয়ে দিলে ক্ষতি হতে বাধ্য, যে ক্ষতি শারিয়ায় প্রতিফলিত। এ-কথা মওলানা মুহিউদ্দিনের বাংলা কোরাণেও আছে – "কালের পরিবর্তন মানবস্বভাবের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যদি সবার জন্য শাখাগত বিধান এক করে দেয়া হয় তবে মানুষ গুরুতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে ... আসল সত্য হচ্ছে এই যে, বিগত দিনগুলোতে সে ব্যবস্থাপত্রই নির্ভুল ও জরুরী ছিল এবং পরবর্তী পরিবর্তিত অবস্থায় পরবর্তী পরিবর্তিত ব্যবস্থাপত্রই নির্ভুল ও জরুরী" ইত্যাদি (পৃঃ ৩৩৪)।
- বর্তমানেও যেখানে শারিয়ার শাসন চলছে তার প্রত্যেকটিতে নারীদের ও অমুসলিমদের মানবাধিকার প্রচণ্ডভাবে লঙ্ঘন হয়। আল্লার আইন হলে এমন হতে পারত না।
- নবীজী ইসলামের অনেক ইসলামি সিদ্ধান্তকে অন্যদের কাছে পৌঁছাতে বলেছেন কিন্তু যে-সব আইনগত সিদ্ধান্ত তাঁকে নিতে হয়েছিল সেগুলোকে তিনি কখনো অন্যদের কাছে পৌঁছাতে বলেননি কারণ তিনি জানতেন এক যুগের এক সমাজের আইন অন্য যুগে অন্য সমাজে খাটালে বিপদ হতে বাধ্য।
- শারিয়াকে রাষ্ট্রের আইন হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে সঙ্কলন করা হয় মাত্র সেদিন, ১৭শ' সালে ভারতে আওরঙজেবের আমলে "ফতোয়া-এ আলমগিরি" ও ১৮৬৯ সালে তুর্কী খলিফা সা'দত পাশা'র আমলে।
- শারিয়া আল্লাহ'র আইন হলে ইসলাম-প্রচারকেরা যেখানে জমিদারদের সাথে লড়াই করে বিজয়ী হয়েছিলেন সেখানে শারিয়া আইন প্রতিষ্ঠা করতেন। কিন্তু এমন একজন প্রচারকও পাওয়া যায় না যিনি শারিয়া আইন প্রচার করেছেন। অর্থাৎ শারিয়া আইন ইসলামি ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গ নয়।
- শারিয়ায় কখনো জনগণের মতামত প্রতিফলিত হয়নি, জনগণকে কখনো কিছু জিজ্ঞাসা করা হয়নি। সে হিসেবে শারিয়া হল গণবিচ্ছিন্ন স্বৈরতন্ত্র (হিউম্যান রাইট্স্ ইন্ মুসলিম ওয়ার্লড – ডঃ মায়মুল খান, পৃঃ ৯৪)। বর্তমান বিশ্বে এ-সব আইন অচল কেন তা আইনের উদাহরণ অধ্যায়ে আইনগুলো নিজেই বলবে।
- আমাদের জন্য শারিয়াভিত্তিক রাষ্ট্র বৈধ হলে ভারতে হিন্দুরাষ্ট্র বা ইসরাইলে ইহুদীরাষ্ট্র বা পশ্চিমে খ্রীষ্টানরাষ্ট্র কেন বৈধ হবে না ? কেন ওগুলোকে উস্কে দেয়া হবে না ?

কোনো এক শারিয়া-বিরোধী মওলানা বলেছিলেন ঃ "কোরাণের দুনিয়াবী সব আয়াত পানির মত স্পষ্ট বুঝি, কিন্তু ঐ একই আয়াতগুলোর তফসিরগুলো পড়লেই মনে হয় আফ্রিকার জঙ্গলে ঢুকে গেলাম।" মহাকবি ইকবাল পরিহাস করে বলেছিলেন ঃ "আমাদের মোল্লা-মওলানাদেরকে অনেক ধন্যবাদ, তাঁরা আল্লাহ-রসুলের বাণী আমাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা সে বাণীর যে চেহারা করেছেন তাতে আল্লাহ-রসুল পর্যন্ত তাজ্জব হয়ে গেছেন !" কিন্তু তা হলে তো চলবে না ! কোরাণের বাণী খুব স্পষ্ট (সুরা ইমরান ৭ ও আরো বহু আয়াত), দুনিয়াবী ব্যাপারে প্রতিটি আয়াত একটা ষোল বছরের বাচ্চাও বুঝতে পারবে। কিন্তু কোরাণের বাণী খুব সংবেদনশীলও, অর্থাৎ মূলে সামান্য তফাৎ হলেই পরিবর্তী ফলাফল বিপুলভাবে বদলে যাবে। ঠিক তেমনি, শারিয়া-তত্ত্বটা দাঁড়িয়ে আছে কোরাণের মূল দর্শনটার অতি সূক্ষ্ম পরিবর্তনের ওপর যা ভক্ত মনের পক্ষে ধরা কঠিন কিন্তু ফলাফলে আকাশ-পাতাল পার্থক্য হয়ে যায়। সে পার্থক্যটা আমরা দেখি হজরত শাহ-জালাল আর গোলাম আজমের মধ্যে, নিজামুদ্দীন আওলিয়া আর মওদুদির মধ্যে। এঁদের ইসলাম পরস্পর-বিরোধী।

অনেক সময় অত্যাচারী বুদ্ধিমানেরা আইনের মারপ্যাঁচে আদলতের শাস্তি এড়িয়ে যায় বটে, কিন্তু সাধারণ মানুষ ঠিকই বুঝতে পারে সে অপরাধী। কিন্তু ধর্মের ও আল্লাহ'র নামে অত্যাচার হলে মানুষ বুঝতে পারে না কিংবা বুঝতে চায় না যে ওরা আসলে অপরাধী। কখনো শাস্তি হয় না বলে ওদের সাহসও অনেক। সেজন্যই ওরা ভয় দেখায়, মানুষ ভয় পায় বলে ওরা আরো ভয় দেখায়। কেন ওরা শাস্তি পায় না ? কারণ, ওদের শাস্তি দেবার আইনটাই এখনো বানিয়ে উঠতে পারেনি মানুষ। তাছাড়া ওরা মানুষকে কষ্ট দেয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, লেবাস, উপাসনালয়ের ভেতরে থেকে। এ-সব দেখেই সাধারণ মানুষ ভোলে বেশি। তাছাড়া ওদের প্রতিরোধ করতে গেলে ওরা 'ধর্মে আঘাত হানা হচ্ছে' বলে চেঁচামেচি জুড়ে দেয় ও খুনখারাপি শুরু করে। এ বড় কঠিন ফাঁদ।

কিন্তু যত কঠিনই হোক, এ ফাঁদ থেকে একদিন উঠে আসবে মানুষ। উঠে আসতেই হবে তাকে। আর সেজন্যে ফাঁদটার চেহারা-স্বরূপ, স্বভাব-প্রকৃতি জানা খুব দরকার। ইসলাম সহজ সরল ধর্ম, তাই কোরাণের ঘটনা-নিরপেক্ষ মানবিক মূল্যবোধের আয়াতগুলো নিয়ে শারিয়া বানালে তখনই বিশ্ব-মানবকে গণতন্ত্র আর ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অব্ হিউম্যান রাইট্স্ দিতে পারত মুসলমানেরাই। ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দেশগুলোর গঠনতন্ত্রে আর ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অব্ হিউম্যান রাইট্স্-এর ১৮ নম্বর আর্টিকেল-এ হুবহু কোরাণের মর্মবাণী লেখা আছে – লা ইক্রাহা ফিদ-দ্বীন, লা'কুম দ্বীনুকুম ওয়ালিয়া দ্বীন। দুর্ভাগ্য, হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বীতে বিশ্ব-শান্তির অন্তত একটা দিগ্দর্শন যা থেকে পাওয়া যেত, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সেই চমৎকার আয়াত দু'টোর জায়গা হয়নি শারিয়ায়।

আল্লার ইবাদতের নামে শারিয়া-রাষ্ট্রগুলোতে অসংখ্য নিষ্ঠুর ঘটনা ঘটে চলেছে। শারিয়া আসার আগে ওসব দেশের লোকেরা আমাদের মতই মনে করত ওদের দেশে এসব অসম্ভব। এখন অত্যাচার সহ্য করা ছাড়া ওদের আর কিছু করার নেই কারণ ওরা দেখে

শেখেনি – এখন ঠেকে শিখছে। মা-বোনের ওপর এরকম হাজার হাজার হৃদয়বিদারক নিষ্ঠুর ঘটনা নাম-ধাম সহ ধরা আছে উইমেন লিভিং আণ্ডার মুসলিম ল'-এর ওয়েবসাইট http://www/wluml.org/english/index.shtml। আমরাও যদি দেখে না শিখি তবে ভয়ানক মূল্য দিয়ে ঠেকে শিখতে হবে ৷৷

শারিয়াপন্থীদের যুক্তি

এধরনের আলোচনায় যেহেতু সদ্ভাবে, নৈর্ব্যক্তিকভাবে এবং আবেগহীনভাবে সবগুলো দিকই দেখতে হয়, তাই এবারে চলুন আমরা দেখি শারিয়াপন্থীদের যুক্তি কি।

সবচেয়ে ভাল হত যদি শারিয়াপন্থীদের সাথে আমাদের দলিলভিত্তিক আলোচনার ভিডিও জাতির সামনে তুলে ধরা যেত। দেশে বিদেশে প্রাণান্ত চেষ্টা করেছি আমরা কিন্তু তাঁরা আলোচনায় রাজি নন। যাহোক, তাঁদের যুক্তিগুলো ধরা আছে শারিয়াপন্থী ওয়েবসাইটগুলোতে, হিজবুত তাহরীর-মুসলিম ব্রাদারহুড-জামাতের মত শারিয়াপন্থীদের গঠনতন্ত্রে, বান্না-কুতুব-মওদুদি-কারজাভী-বাদাওয়ি-খোমেনির মত শারিয়া নেতাদের বই-বক্তৃতায় এবং শারিয়া কেতাবগুলোর মুখবন্ধে। এ-যুক্তির সমর্থনে তাঁরা চমৎকার শব্দ ব্যবহার করেন, যেমন নবীজীর প্রতিষ্ঠিত ইসলামি রাষ্ট্র, খুলায়ায়ে রাশেদীনের পরিচালিত ইসলামি রাষ্ট্র, আল্লার আইন, সামগ্রিক জীবন-বিধান, বিশ্ব-মুসলিম ভ্রাতৃত্ব, ইসলামি মূল্যবোধ, ইসলামি সমাজের অনাবিল সুবিচার ও শান্তি, নবীজীর সুন্নতের অনুসরণ, কোরাণ-হাদিসভিত্তিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা, সৎলোকের শাসন, ইসলামি সভ্যতা, ইসলামি কৃষ্টি ও ঐতিহ্য, ইসলামি অর্থনীতি, ইত্যাদি। ভক্ত মুসলমানের মনে এই শব্দগুলোর সম্মোহন-শক্তি হ্যামিলনের বাঁশির চেয়েও প্রবল। কষ্টকর জীবনের চাপে বিপর্যস্ত, অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত মুসলিম সমাজে এসব শব্দ প্রচণ্ড ধর্মীয় আবেগের সঞ্চার করে ও মোহময় আশার আলো জাগায়। দুর্নীতিপরায়ণ ও অকর্মণ্য রাজনৈতিক দলগুলোর পাল্লায় পড়ে দেশের আজ অসম্ভব দুরবস্থা – জনগণের কষ্টের শেষ নেই। এই কষ্টের অবসান করার আশায় মানুষ মনে মনে চলে যায় মায়াময় একটা চমৎকার স্বপ্নীল দুনিয়ায় যা ইহকাল-পরকালে সবদিক দিয়ে সফল। অনতিক্রম্য এ স্বপ্নের আকর্ষণ, দুর্বার এর হাতছানি। তাঁদের যুক্তি ও কোরাণ-হাদিসের সূত্রগুলো সর্বদা

একই, তবে সেগুলো আমি দেখাব অন্য এক নিবন্ধ থেকে। ২০০৩-২০০৫ সালে টরন্টো শারিয়া কোর্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার সময় আমরা অনেক হুমকি পাই, এমনকি টেলিফোনের অ্যান্সারিং মেশিনে মুসলিম ক্যানাডিয়ান কংগ্রেসের কমিটি-সদস্যদেরকে জবাই করার হুমকিও ছিল। এ নিয়ে কাগজে লেখালেখি পুলিশ তদন্ত হয়েছে, হুমকিদাতা ধরা পড়েনি। তখন আমি হুমকি সহ একটা বিশাল নিবন্ধ পাই। এটা ছিল মওদুদি-খোমেনির চেয়ে অনেক বেশি সুলিখিত। সেখান থেকে তাঁর হুমকি বাদ দিয়ে যুক্তিগুলো দেখাচ্ছি।

তার আগে সংক্ষেপে ক্যানাডিয়ান শারিয়া কোর্টের কথাটা বলা প্রয়োজন। পশ্চিমা দেশগুলোর আইনে শারিয়ার কিছু আইন ঢোকানোর চেষ্টা শারিয়াপন্থীরা করছেন অনেক আগে থেকেই, ক্যানাডিয়ান শারিয়া কোর্ট ছিল তাঁদের চূড়ান্ত সাফল্য। বহু মামলা জমে যাবার ফলে ক্যানাডার অন্টারিও প্রদেশের সরকার ১৯৯১ সালে ধর্মীয় কোর্টগুলোকে পারিবারিক ও ব্যবসায়িক মামলা নিষ্পত্তি করার অধিকার দিয়ে আইন পাশ করে। সাথে সাথে শারিয়া কোর্ট, ইহুদি কোর্ট ইত্যাদি বানানো হয় কিন্তু আমরা কিছুই জানতাম না। দীর্ঘ তেরো বছর ধরে মামলা নিষ্পত্তি করার পর ২০০৩ সালে শারিয়া কোর্ট সরকারের কাছে আবেদন করে আর্বিট্রেশন স্ট্যাটাসের জন্য। এটা পেলে শারিয়া কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে ক্যানাডার কোর্টে আপিল করা যেত না। অর্থাৎ, তাঁরা একই দেশে সমান্তরাল দু'টো বিচার ব্যবস্থা চেয়েছিলেন। এ-খবর ফাঁস হ'লে ক্যানাডিয়ানরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। আমি শারিয়া কোর্টের কাছে দু'বার চিঠি পাঠাই কিছু মামলার বিবরণ (স্বামী-স্ত্রীর নাম-ধাম গোপন রেখে) এবং যে শারিয়া আইনগুলো তাঁরা প্রয়োগ করেছেন তা পাঠাতে যাতে আমরা বুঝতে পারি মুসলিম-নারীরা সুবিচার পাচ্ছেন কিনা। তাঁরা জবাব দেননি। তখন মুসলিম ক্যানাডিয়ান কংগ্রেস, ক্যানাডিয়ান কাউন্সিল অব্ মুসলিম উইমেন, এবং ইন্টারন্যাশনাল মুভমেন্ট এগেন্সট্ ক্যানাডিয়ান শারিয়া কোর্ট, এই তিনটে ছোট দল ওই শারিয়া কোর্টের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলনে নেমে পড়ে। মুসলিম ক্যানাডিয়ান কংগ্রেসের ডিরেক্টর অব্ শারিয়া ল' হিসেবে আমার সুযোগ হয়েছিল এ-সংগ্রামের প্রথম সারিতে থাকার। প্রবল পরাক্রান্ত প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দীর্ঘ আড়াই বছর ধরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রুদ্ধশ্বাসে এ সংগ্রাম চলেছে। আমাদের অক্লান্ত আন্দোলনের ফলে সরকার ২০০৫ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরে নূতন আইন ক'রে সব ধর্মের কোর্টকে উচ্ছেদ করার ঘোষণা দেয়। যদি এটা না হতো, যদি আমরা হেরে গিয়ে এই শারিয়া কোর্ট টিকে থাকত তবে মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত শারিয়াপন্থীরা প্রগতিশীল মুসলমানদের নাকের ডগায় এই ক্যানাডিয়ান শারিয়া কোর্টের উদাহরণ তুলে ধরে বলত ঃ 'ক্যানাডার মত দেশ তাদের আইনের চেয়ে ভালো বলেই তো আল্লাহ'র আইন প্রয়োগ করেছে।' এর কোন জবাব ছিল না প্রগতিশীল মুসলমানদের। সেদিক দিয়ে বিশ্ব-মুসলিম এক ভয়াবহ অবস্থা থেকে বেঁচে গেছে।

এবারে শারিয়াপন্থীদের সূত্র ও যুক্তিতে আসি। তাঁর বিশাল নিবন্ধ থেকে দরকারি অংশটুকু ভাবানুবাদ করে তুলে ধরছি।

* *

ইসলামের একটি রাজনৈতিক রূপ আছে এবং তাহা কোরাণ-রসুল দ্বারা সমর্থিত ও নির্দেশিত। ইহার কারণগুলি হইল ঃ-

১। এই দুনিয়া আল্লাহ'র সৃষ্টি ও সম্পত্তি।

২। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলেই তাঁহার দাস। কেহ কেহ ইচ্ছাকৃত দাস (মুসলিম) যাহারা তাঁহার মালিকানা মানিয়া লইয়াছে, এবং বাকিরা বিদ্রোহী দাস যাহারা তাঁহার মালিকানা অস্বীকার করে ও তাঁহার অবাধ্য। অবশ্য ইহাতে তাহাদের দাসত্বের হেরফের হয় না, তাহারা বিদ্রোহের জন্য শাস্তিযোগ্যই থাকে।

৩। যেহেতু আল্লাহ স্রষ্টা তাই তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন সৃষ্টির সর্বাপেক্ষা মঙ্গল কিসে। তাই তাঁহার আইন মানুষের বানানো যে-কোনো কিছু হইতে উন্নত।

৪। যেহেতু স্রষ্টার জ্ঞান সৃষ্টির জ্ঞানের চেয়ে উন্নত তাই আমরা কোনদিনই আল্লাহ অপেক্ষা বেশি জানিব না। সেই কারণেই তাঁহার আইন মানিয়া চলাতেই মানুষের মঙ্গল নিহিত। আল্লাহ যাহা নিষেধ করিয়াছেন (পরকীয়া, সমকামীতা, জুয়া, সুদ, মদ্যপান ইত্যাদি) তাহাকে বৈধ করার মধ্যে কল্যাণ নাই।

৫। আল্লাহ সকল নবী-রসুলকে একই উদ্দেশ্যে পাঠাইয়াছেন—যাহা কিছু মঙ্গল তাহা বৈধ করা ও পালন করার আদেশ দেওয়া, এবং যাহা মন্দ তাহাতে বারণ করা।

৬। নবীদের প্রত্যেকে আল্লাহ'র আইন আনিয়াছেন পালন করিতে, প্রচার করিতে ও শক্তির সাথে প্রয়োগ করিতে (to enforce it)।

৭। সুতরাং তাঁহারা ঘটনাক্রমে বা দৈবাৎ কিছুই করেন নাই। তাঁহারা যাহাই করিয়াছেন তাহা প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের কর্তব্য ঠিকমত করার যোগ্যতা হাসিলের জন্য আল্লাহ'র পরিকল্পনা মাফিকই করিয়াছেন। আল্লাহ'র ইচ্ছা ছাড়া কিছুই ঘটে না।

৮। একদিন আমাদিগকে আল্লাহ'র নিকট ফিরিয়া যাইতে হইবে এবং আমাদের কর্মের জবাব দিতে হইবে।

মানবসভ্যতা এখন পার্থিব চরম উন্নতি সত্ত্বেও আধ্যাত্মিক দিক দিয়া দেউলিয়া হইয়া উদ্ভ্রান্ততা ও অর্থহীনতায় ভুগিতেছে। খুবই পরিতাপের বিষয় যে ইহার সমাধান (অর্থাৎ শারিয়া-আইন – *লেখক*) যাহাদের কাছে আছে তাহাদেরই একটি অংশ (অর্থাৎ শারিয়া আইন-বিরোধী মুসলমানেরা – *লেখক*) সেই সমাধানকে কাজে লাগাইবার ব্যাপারে বাধা দিতেছেন।

মানুষের দুইটি মূল প্রয়োজন আছে—পার্থিব ও আধ্যাত্মিক। শুধুমাত্র ইসলামই ইহা দিতে পারে। কেননা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আবিষ্কার করিয়াছে যে শুধুমাত্র ইসলামের কোরাণ-সুন্নতই বাস্তবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ আগের ধর্মগ্রন্থগুলিকে এমনভাবে বিকৃত করা হইয়াছে যে ঐগুলি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সাথে মিলে না। ফলে, বিজ্ঞানমনস্ক মানুষেরা স্রষ্টার দেওয়া ধর্মগ্রন্থগুলিকে বর্জন করিয়াছে এবং ধর্মনিরপেক্ষতা ও নাস্তিকতার জন্ম হইয়াছে। কিন্তু ইসলাম ধর্মনিরপেক্ষ নহে কারণ ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হইল জীবনযাপনে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে স্রষ্টার অনুপস্থিতি। মুসলমানের প্রতিটি সিদ্ধান্তে আল্লাহ'র উপস্থিতি এবং তাঁহাকে খুশি করাই মূল কথা। যখন কোন মুসলমান আল্লাহ'র ইচ্ছামাফিক জীবনযাপন করে তখন ইহকাল-পরকালে কল্যাণ হয়।

ইসলামের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়। গায়ের রং, গোত্র, লিঙ্গ কিংবা কোনকিছুরই ভিত্তিতে ইসলাম নারীর বা কাহারো বিরুদ্ধাচারণ করে না। ন্যায়বিচার, সাম্য ও কল্যাণ হইল ইসলামের রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ভিত্তি। বিজ্ঞাপন, তদবির বা ভোটের সংখ্যা দ্বারা ইহার এদিক-ওদিক করার উপায় নাই। ইসলাম ব্যক্তিস্বাধীনতার বিরোধী যখন তাহা অন্যের বা জাতির অধিকার লঙ্ঘন করে। ইসলাম গুরুত্ব দেয় দায়িত্বের উপর, বিশেষ করিয়া নেতাদের দায়িত্বের উপর যাহাতে শুধু মুসলমান নয় বরং সকলের মঙ্গল হইবে। বহু-সংস্কৃতি ও বহু-ধর্মের সমাজে অমুসলিমের অধিকার ও তাহাদিগকে সার্বিকভাবে রক্ষা করা ইসলামি রাষ্ট্রের কর্তব্য। এই পরিপ্রেক্ষিতেই অমুসলিমেরা যদি চায় তবে দেশরক্ষার যুদ্ধে না-ও যাইতে পারে। ইহা একটা সুবিধা যাহা শুধু অমুসলিমদিগকেই দেওয়া হইয়াছে। ইসলামি রাষ্ট্রে তাহাদের উপাসনার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, উপাসনালয়গুলি সুরক্ষিত এবং তাহারা সকল রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধার অধিকারী। ইসলাম কোন বাদশাহের বাদশাহী প্রতিষ্ঠা করিতে চায় না। ইসলাম চায় আল্লাহ'র সৃষ্ট সমস্ত জমিতে (যাহা তাঁহার সম্পত্তি) তাঁহার সৃষ্ট সকল মানুষের উপর তাঁহারই আইন প্রয়োগ করিতে। তাই ইসলামি রাষ্ট্রে ইসলামি আইন প্রয়োগ হইবে ইহাই ইসলামের রাজনৈতিক চরিত্র।

১। সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহ'র। তাই সমস্ত সৃষ্টিকে আল্লাহ'র দেয়া বিধিবিধান আইন মানিয়া চলিতে হইবে।

২। রসুলকে আল্লাহ অধিকার দিয়াছিলেন সামাজিক আইন দিবার – সূত্র আরাফ ১৫৭, তাওবা ২৯, আহযাব ৩৬, হাশর ৭, নূর ৪৭-৫২ ইত্যদি।

৩। রসুল হইলেন আল্লাহ'র মুখপাত্র। তাই রসুলকে মান্য করিতেই হইবে এবং তাঁর বিচার মানিয়া লইতে হইবে। যেহেতু রসুলের প্রতি আনুগত্য আল্লাহ'র প্রতি আনুগত্য, তাই রসুলের প্রতি অবাধ্যতা আল্লাহ'র প্রতি অবাধ্যতা যার অর্থই হল জাহান্নাম – সূত্র মায়েদা ৪৪-৫০, নিসা ১৪, ১৫, ৬৪, ৮০, আহযাব ৩৬, জ্বিন ২৩, আনফাল ১৩, তওবা ৬৩ ইত্যাদি।

৪। রসুলের অনুগত না হইয়া আল্লাহ'র অনুগত হইবার উপায় নাই এবং আল্লাহকে সামনাসামনি পাওয়া যাইতেছে না তাই রসুলের অনুগত হওয়াই যথেষ্ট – সূত্র নূর ৫৪, ৫৬, নিসা ৪২, ১১৫, আশ শুরা ৫১, নজ্‌ম্‌ ৩ ইত্যাদি।

৫। ১৫শ' শতাব্দীর হিউগো গ্রোটিয়াসকে আন্তর্জাতিক আইনের পিতা ধরা হয়। কিন্তু তাঁহার প্রায় আটশ' বছর আগে মুহম্মদ বিন আল্ শায়বানী ইসলামি আন্তর্জাতিক আইনের রূপরেখা দিয়াছেন তাঁহার কিতাব 'কিতাবুল সিয়ারুল কবির'-এ।

৬। ১৯৪২ সালে ডঃ হামিদুল্লাহ মদিনার গঠনতন্ত্র নিয়া লিখিয়াছেন 'দ্য ফার্স্ট রিটন্ কন্সটিটিউশন ইন্ দ্য ওয়ার্লড' অর্থাৎ 'বিশ্বের প্রথম লিখিত গঠনতন্ত্র।'

ইহা সুস্পষ্ট যে শুধু আমাদের রসুল নহেন বরং আগেকার নবী-রসুল যেমন মুসা (আঃ)-কে আল্লাহ আইন দিয়াছিলেন যাহা প্রয়োগ করা তাঁহাদের দায়িত্ব ছিল। ইহা ইসলামের রাজনৈতিক চরিত্র ছাড়া আর কি ? লক্ষণীয় যে, কোরাণ যখনই আল্লাহ'র প্রতি অনুগত থাকার কথা বলিয়াছে তাহার পরে সর্বদাই আমাদের রসুলের প্রতি অনুগত থাকার কথা বলিয়াছে। অপরপক্ষে, কিছু আয়াতে শুধু রসুলের প্রতি অনুগত থাকার কথা বলা হইয়াছে কিন্তু আল্লাহ'র প্রতি আনুগত্যের কথা নাই। রসুলের প্রতি আনুগত্যকে এত গুরুত্ব দিবার কারণ হইল রসুলের প্রতি আনুগত্য ছাড়া আল্লাহ'র প্রতি আনুগত্য করা সম্ভব নহে কারণ আল্লাহ প্রত্যেক মানুষের সাথে কথা বলেন না (সূত্র আশ শুরা ৫১)। কাজেই যখন কোন রসুল কিছুকে বৈধ বা অবৈধ করেন তখন আল্লাহ'র রসুল হিসোবেই করেন। সুরা নিসা ৮০ ও নজ্ম্ ৩ অনুসারে রসুলের প্রতি আনুগত্যই আল্লাহ'র প্রতি আনুগত্য, রসুলের প্রতি আনুগত্য ছাড়া আল্লাহ'র প্রতি আনুগত্য অসম্পূর্ণ। তাই আল্লাহ কোরাণে উল্লেখ না থাকিলেও রসুলের কথা এবং কর্মকে সম্পূর্ণভাবে পালনের জন্য বৈধ করিয়াছেন।

হজরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর একটি কর্তব্য ছিল ভালকে ভাল ও মন্দকে মন্দ ঘোষণা করা। আইনদাতা হিসেবে তাঁহার আরেকটি কর্তব্য ছিল আইনগতভাবে ভালকে বৈধ এবং মন্দকে অবৈধ করা (আল্ আরাফ ১৫৭)। এই দুইটি কর্তব্যে তফাৎ হইল প্রথমটি শুধু প্রচার এবং দ্বিতীয়টি হইল আইন বানানো ও প্রয়োগ। এই আয়াতে রসুলকে সেই সব আইনও বানাইবার ও প্রয়োগের অধিকার দেওয়া হইয়াছে যে আইন কোরাণে নাই। তাই ইহা কিছুতেই বলা যাইতে পারে না যে আইন শুধুমাত্র কোরাণই দিবে। আয়াতটিতে রসুলের উপর মানুষের বিশ্বাসকেও প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ কোন কিছুকে আইনগতভাবে বৈধ বা অবৈধ করা সহ তাঁহার প্রতিটি কাজের প্রতি বিশ্বাস থাকিতে হইবে। এই আয়াতে নূরকে অনুসরণ করিতে বলা হইয়াছে অর্থাৎ কোরাণের মাধ্যমে এবং কোরাণের বাহিরেও তাঁহার আদেশ মানিতে বলা হইয়াছে। ইহাও বলা হইয়াছে – "তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর তাহলে কিতাবের ঐ লোকদের সাথে যাহারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে না, আল্লাহ ও তাঁহার রসুল যাহা হারাম করিয়াছেন তাহা হারাম করে না।" ইহাতে বুঝা যায় কোন কিছুকে হারাম করিবার অধিকার আল্লাহ'র সহিত আল্লাহ'র প্রদত্ত অধিকারের বলে রসুলেরও আছে। অর্থাৎ আল্লাহ ও রসুল একত্রে বা আলাদাভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন ও কেহ তাহা অমান্য করার অধিকার রাখে না।

আসাদ গোত্রের এক নারী আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ-এর নিকটা আসিয়া বলিল – 'আমি শুনিলাম আপনি এই এই জিনিসকে অবৈধ বলেন। আমি আল্লাহ'র কেতাব পড়িয়াছি কিন্তু তাহাতে উহা পাই নাই।' আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ বলিলেন – 'তুমি যদি কেতাবটি (ঠিকমত) পড়িতে তবে তাহা পাইতে। আল্লাহ বলিয়াছেন ঃ 'রসুল যাহা কিছু দেন তাহা গ্রহণ কর এবং যাহা নিষেধ করেন তাহা হইতে বিরত থাক' (আল্ হাশর ৭)। রসুল স্পষ্টতই বিচারকের বেশিই ছিলেন। কেননা রায় দিবার অধিকার বিচারকের অবশ্যই আছে এবং তাহা সকলে মানিতে বাধ্য কিন্তু তাঁহার রায়ের প্রতি মানসিক অনুগত না থাকিলে গুনাহও হয় না এবং মুসলমানও থাকা যায়। কিন্তু রসুলের ক্ষেত্রে তাহা নহে। রসুলকে বিচারক না মানিলে কিংবা তাঁহার বিচারকে খুশি মনে না মানিলে মুসলমানই থাকা যাইবে না (নিসা ৬৫, নূর ৪৭-৫২)।

ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে দুনিয়ার সৎ মুসলমান ও সৎ অমুসলমানেরা নিরপেক্ষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখুক মানবজাতিকে ইসলামের কি দিবার আছে। তাহা হইলে দেখা যাইবে যে-সকল বিষ বর্তমান বিশ্বকে বিষাক্ত করিতেছে তাহার সমাধান একমাত্র ইসলামেই আছে। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে আমরা যে-সকল সমস্যার সম্মুখীন হইতেছি তাহার মূল কারণ হইল আল্লাহ'র ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন অপেক্ষা মানুষের ব্যক্তিগত লোভ ও লালসা বড় হইয়া গিয়াছে। মানুষ তখনই ইহা করে যখন সে মনে করে কাহারও কাছে তাহাকে জবাবদিহি করিতে হইবে না। ইসলাম এই ধারণাকে নস্যাৎ করিয়া দেয়। নবী-রসুলদিগকে পাঠাইবার উদ্দেশ্য ছিল না শুধু কিভাবে ইবাদত করিতে হয় তাহা দেখানো কিংবা বেহেশ্ত-দোজখের খবর দেওয়া। সে-উদ্দেশ্য ছিল প্রচার ও ব্যক্তিগত উদাহরণ দিয়া দেখাইয়া দেওয়া কিভাবে জীবনযাপন করিলে ইহকাল পরকালে মঙ্গল হইবে। ইসলাম শুধু ইবাদতের কিছু আনুষ্ঠানিকতা কিংবা ভাল ব্যবহারের কিছু এলোপাথাড়ি নির্দেশ নহে। যিনি আমাদের জীবন দিয়াছেন ও বিশ্ব-নিখিল সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার ইচ্ছা মোতাবেক জীবন পরিচালনা করার ইহা একটি সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ বিধান।

মানি বা না মানি আমরা আল্লাহ'র কাছে জবাব দিতে বাধ্য। যদি আমরা পরস্পরের উপর দায়িত্বশীল হইয়া জীবনযাপন করি তবে সকলের মঙ্গল হইবে। না হইলে বর্তমান অবস্থা চলিতে থাকিবে যেখানে ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে একটি দেশ অন্য দেশকে নিপীড়ন করে ও তাহার প্রাকৃতিক সম্পদ হরণ করে। সবাই জানে পতিতাবৃত্তি, সমকামীতা, জুয়া ও মদ্যপান ক্ষতিকর কিন্তু তবুও এগুলিকে বৈধ করা হইতেছে। স্বাধীনতার নামে নারীকে যৌনবস্তুতে পরিণত করা হইতেছে। সুদ-ভিত্তিক অর্থনীতি গরিবি বাড়াইয়া ধনীকে আরো ধনী করিতেছে। দুনিয়াতে গোত্র, বর্ণ, জাতীয়তা ও নারী-পুরুষের ভিত্তিতে বৈষম্য রহিয়া গিয়াছে। জীবনের উন্নতির নির্লজ্জ

বাহানায় একটি দেশ জবরদস্তি করিয়া পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট করিতেছে । এই অবস্থায় চুপ করিয়া থাকাও অপরাধ । যাহা দিয়া এইগুলিকে ঠিক করিয়া ন্যায়বিচার, সাম্য, বৈষম্যহীনতা, আল্লাহ'র প্রতি জবাবদিহিতা ও তাঁহার কাছে ফিরিয়া যাওয়ার ধারণা প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহাকে ইচ্ছা করিয়া লুকাইয়া রাখা হইল সবচাইতে বড় অপরাধ ।

আল্লাহ'ই সবচাইতে ভাল জানেন ।

* *

শারিয়াপন্থীদের সূত্র ও যুক্তি শেষ হল । এ-কথা মানতেই হবে যে যা বলা হয়েছে এবং যেভাবে তা বলা হয়েছে তা অত্যন্ত আকর্ষণীয় । ভক্ত মুসলমানের মনে এর আবেদন অত্যন্ত শক্তিশালী । বলা বাহুল্য কোন মুসলমান এর কোনটাতেই দ্বিমত করবে না । কারণ সূত্রগুলো আসলেই সত্যি । কিন্তু সত্যি হলেও অসম্পূর্ণ । কারণ এ-বিষয়ের সাথে বাস্তবতা ও ঐ কোরাণ-রসুলেরই অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো ধরা হয়নি । সেগুলো একসাথে করলে পুরো চিত্রটাই বদলে যাবে । অসম্পূর্ণ সত্য পুরো ধর্মটাকেই উল্টিয়ে দিয়ে কি সাঙ্ঘাতিক বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে এটা তার জ্বলন্ত উদাহরণ । সে-কারণেই এই মতামত ও বিশ্লেষণের সাথে অতীত-ভবিষ্যতের বহু মুসলমানেরাই একমত নন । ইসলামের সম্পূর্ণ চরিত্র জানতে হলে এগুলোর সাথে কোরাণ-রসুলের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো একসাথে করে দেখতে হবে । ওপরের প্রতিটি বিষয়ে এ-বইয়ের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে সেই সব অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বিস্তারিত দেয়া আছে যাতে পাঠক ইসলামের সঠিক ও সম্পূর্ণ চিত্র পান ।

এ নিবন্ধে তিনি উল্লেখ করেননি, কোরাণ লঙ্ঘনের কারণে শারিয়া আইনে বিভিন্ন মুসলিম দেশে যেভাবে নারী-নির্যাতন হচ্ছে তার সমালোচনা করছেন বহু মুসলিমরাই । মুশকিল হল এ-সমালোচনা দেখলেই শারিয়া-সমর্থকেরা উত্তেজিত হয়ে পড়েন । কাজেই এ-থেকে কিভাবে ইসলামি পদ্ধতিতেই বেরিয়ে আসা যায় সে আলোচনা অসম্ভব হয়ে পড়ে । একদিকে তাঁরা স্বীকার করেন যে অন্যান্য কিছু ধর্মের মত ইসলামের নামেও কিছু নারী-নির্যাতন হয়েছে, অন্যদিকে সে নির্যাতন দেখানোর সাথে সাথে তাঁরা ইউরোপ-আমেরিকায় কিভাবে এবং কত নারী নির্যাতন হয় তার তালিকা নাকের ডগায় তুলে ধরেন । তাঁরা প্রতিষ্ঠা করার প্রাণান্ত চেষ্টা করেন যে 'ওদের চেয়ে আমরা ভাল আছি !' ভাবখানা এই যে, পরীক্ষায় আমরা একশোতে দশ পেলে কি হবে ওরা তো পেয়েছে সাত, কাজেই আমরা ওদের চেয়ে ভাল আছি । শারিয়াপন্থী খবরের কাগজগুলোতে এটা খু-ব-ই দেখা যায় । এটা আসলে নিজেকেই ঠকানো কারণ দু'জনেই ডাব্বা মারা ফেল্ । এই ফাঁকা আত্মতৃপ্তিতে নিশ্চিন্ত থাকলে একটা মস্তবড় ক্ষতি হয় । তা হল, পশ্চিমা দেশে যা হচ্ছে তা ওরা দেখুক, আমাদের মা-বোনেরা কিভাবে নির্যাতিত হচ্ছেন এবং কিভাবে আমরা তা বন্ধ করতে পারি সেদিক থেকে আমাদের মনযোগ সরে যায় ।

এটা খুবই সত্যি যে পশ্চিমা দেশেও নারী নির্যাতন হয় এবং অনেকই হয় । কিন্তু পশ্চিমা দেশে নারী-নির্যাতনের যে তালিকা তাঁরা দেখান তা কিন্তু ঐ পশ্চিমা দেশেরই

সরকার বা কোন সংগঠনের পরিশ্রমের ফসল । ওখানে ওরা নিয়ত গবেষণা করে চলেছে দেশে ও বিদেশে নারী-নির্যাতন কোথায় বাড়ছে, কি কারণে বাড়ছে, এবং কোথায় কমছে, কি কারণে কমছে । এ-সব তথ্য থেকে ওরা বের করার চেষ্টা করে কিভাবে কি করলে নারী-নির্যাতন বন্ধ হতে পারে, এবং সরকারও এ-সব গবেষণার ভিত্তিতে আইন তৈরি করে । আমাদের দেশেও এমন গবেষণা কিছু হচ্ছে যদিও আরো হওয়া দরকার । কিছু ব্যতিক্রম বাদে আমাদের সরকারগুলো সাধারণত এ-সব গবেষণাকে পাত্তা দেয় না । আরব দেশগুলোতে তো নারী-নির্যাতনের ওপরে কার্যকর কোন গবেষণাই নেই । পশ্চিমা দেশে রাষ্ট্রীয় আইন বা ধর্মীয় নেতৃত্ব নারী-নির্যাতনকে অপরাধ হিসেবেই দেখে, ওটাকে বৈধ করার চেষ্টা করে না । কিন্তু মুসলিম দেশগুলোতে কিছু বিশেষ নারী-নির্যাতনকে অপরাধ হিসেবে দেখা তো হয়ই না, বরং আল্লার আইনের নামে বৈধ করা হয় । তাছাড়া, মুখে 'আল্লাহই সবচাইতে ভাল জানেন' (যার একমাত্রই অর্থ হল 'আমি যা জানি তা অসম্পূর্ণ কিংবা ভুল হতে পারে') বলার পর রাষ্ট্র আইন বানিয়ে জাতির ওপর নিজের মতামত চাপিয়ে দেয়াটা ইসলামের নিদারুণ বরখেলাপ কিনা সেটা বুঝে নেয়ার ভারও আমি পাঠকের ওপরেই ছেড়ে দিচ্ছি ।

শারিয়াপন্থীরা এটাও বলেন না যে পশ্চিমা দেশে আইন প্রণয়নে নারীজাতির অবদান অসামান্য কিন্তু হাদিসে নারীজাতির কিছু অবদান থাকলেও শারিয়া আইনে কোনই অবদান নেই । চোদ্দশ' বছরের মধ্যে একজনও নারী শারিয়া-ইমামের নাম পাওয়া যায়নি । দ্বিতীয়ত, মুসলিম নারীর জীবনে শারিয়া আইনের প্রভাব নিয়ে গত চোদ্দশ' বছরে কোন উল্লেখযোগ্য গবেষণাই নেই । তৃতীয়ত, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, শারিয়াপন্থীরা কখনোই পশ্চিমা দেশের নারী-নির্যাতনের বাস্তবতার সাথে শারিয়া-রাষ্ট্রে নারী-নির্যাতনের বাস্তবতার তুলনা করেন না । তাঁরা ওদের বাস্তবতার সাথে নিজেদের তত্ত্বের তুলনা করেন । এটা অন্যায়, এবং খুব সূক্ষ্ম অন্যায় । ওদের তত্ত্বের সাথে শারিয়া-তত্ত্বের তুলনা করা দরকার, ওদের নারী-নির্যাতনের বাস্তবতার সাথে শারিয়া-রাষ্ট্রে নারী-নির্যাতনের বাস্তবতার তুলনা করা দরকার । তাহলেই দেখা যাবে ওদের দেশে নারী-নির্যাতন অপরাধ হিসেবে স্বীকৃত বলে এবং এর ওপরে গবেষণা হচ্ছে বলে প্রতিকার করাটা অপেক্ষাকৃত সহজ । কিন্তু শারিয়া-রাষ্ট্রে নারী-নির্যাতন ইসলামের নামে বৈধ বলে এবং গবেষণা তেমন হচ্ছে না বলে এর প্রতিকার অত্যন্ত কঠিন । ধর্মের নামে অত্যাচার হলে কয়েকটা ঘটনা ঘটে । প্রথমত, সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের মনে সেটা অত্যাচার হিসেবে ততটা উপলব্ধি হয় না । দ্বিতীয়ত, কেউ কেউ সেটা বুঝলেও প্রতিবাদ করতে ভয় পায় কারণ সেই প্রতিবাদ আবার খোদ ধর্মের বিরুদ্ধেই চলে যায় কিনা সে সংশয় ও ভয় থাকে । তাছাড়া, অত্যাচারীরা ধর্মের ধ্বজা ধরে থাকে বলে ধর্মের অঘোষিত মালিক বনে যায়, প্রতিবাদকারীর ওপরে নানারকম অত্যাচার করার ক্ষমতা রাখে । তৃতীয়ত, এজন্যই ধর্মের নামে যারা অত্যাচার করে তাদের শাস্তির আইন এখনো কার্যকরভাবে বানানো যায়নি । বরং ওরাই আইনের এবং শাস্তি দেবার মালিক বনে থাকে । তাই মানুষের ইতিহাসে ধর্মের নামে যারা অত্যাচার করে তাদের শাস্তির উদাহরণ খুবই

কম। চতুর্থত, ওদের শাস্তি হয় না বলে স্পর্ধা ও অত্যাচার আরো বেড়ে যায়। এটাই মানুষের ধর্মীয়-সামাজিক বিবর্তনের একটা বৈশিষ্ট্য।

শারিয়াপন্থীদের আর একটা মোক্ষম যুক্তি হল, 'পৃথিবীর প্রথম লিখিত গঠনতন্ত্র'। তাঁদের দাবি, এই গঠনতন্ত্রের ভিত্তিতে নবীজী রাষ্ট্র-পরিচালনা করেছিলেন বলে এটা ইসলামি ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গই শুধু নয়, এর ভিত্তিতে বিশ্ব-শারিয়ারাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাই হল বিশ্ব-মুসলিমের ওপরে আল্লাহ-রসুলের নির্দেশ। এ না করলে "আর কিভাবে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা যায় আমি জানি না" – মওলানা মওদুদি। এর ওপরে লেখক ডঃ হামিদুল্লাহর বিখ্যাত বই 'দ্য ফার্স্ট রিটন্ কন্সটিটিউশন ইন্ দ্য ওয়ার্ল্ড'। অর্থাৎ কিনা যাকে 'পৃথিবীর প্রথম লিখিত গঠনতন্ত্র' বলে দাবি করা হয়। দাবিটার ফাঁক ও ফাঁকি দেখানো হয়েছে "পৃথিবীর প্রথম লিখিত গঠনতন্ত্র" অধ্যায়ে ।

তাঁরা খেলাফত ফিরিয়ে আনতে চান। কিন্তু মুসলিম ইতিহাসের যে কোনো বই কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামি ইতিহাসের যে কোনো ছাত্রকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে চোদ্দশ' বছর ধরে বাস্তবে কি ঘটেছিল। মুসলিম খেলাফতে হাতে গোনা কয়েকজন জ্ঞানপিপাসু ন্যায়পরায়ণ খলিফা ছাড়া বাকি শতাব্দী ধরে জনগণের ওপরে মর্মান্তিক রক্তস্রোত বয়েছিল। ৬৬১ সালে হজরত আলী নিহত হবার পর থেকে মুসলমানের ইতিহাস ভারাক্রান্ত হয়ে আছে অসংখ্য গৃহযুদ্ধে, এর সাথে ইসলামের কোনো যোগ নেই শুধু নামের খোলস ছাড়া। আমরা শুধু যুদ্ধের কথাই পড়ি, কিন্তু খেয়াল করি না সেইসব কোটি-কোটি মৃতদেহ এবং সেই সাথে কোটি-কোটি আহতের আর্তনাদ, উজাড় বসতি ও বিধবা-এতিমের হাহাকার। ইতিহাসের প্রথম তিন শতাব্দী তুলে দিচ্ছি, এর পরের কাহিনীও একই রকম মর্মান্তিক।

<u>সাল</u>

৬৬১ – হজরত আলী নিহত – সিরিয়ার শাসক মাবিয়া উমাইয়া খেলাফত প্রতিষ্ঠা

৬৮০ – মাবিয়ার মৃত্যু, এজিদ খলিফা হল- কারবালায় নবীজীর প্রিয় নাতি হজরত হোসেন সহ ও-পরিবারের অনেকে নিহত

৬৮৪ – মক্কায় আবদুল্লা বিন জুবায়ের-এর খলিফা হবার ঘোষণা, মারজ রাহাত-এর যুদ্ধ

৬৮৭–৬৯২ – কুফা-য় মুখতার নিজেকে খলিফা ঘোষণা করলে মক্কায় জুবায়ের, কুফা-য় মুখতার ও সিরিয়ায় এজিদের বংশধর আবদুল মালিক, একসাথে এই তিন খেলাফতের উদ্ভব ও রক্তাক্ত যুদ্ধে মুখতার ও জুবায়ের নিহত। আবদুল মালিকের সেনাপতি হিসাবে ইতিহাসের কুখ্যাত নৃশংস হত্যাকারী হাজ্জাজ বিন ইউসুফের ক্রমাগত গণহত্যা। সাহাবী সহ লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে সে খুন করেছে

৬৯৫ – জাজিরা, আহয়াজ ও কারুন-এর তিনটে যুদ্ধ

৭০২ – ইরাকে আশাথ বিদ্রোহ, দায়রুল জামিরা'র যুদ্ধ

৭০২ থেকে ৭৩৭ পর্যন্ত মুসলিম সৈন্যদের বহু দেশ জয় ও ফ্রান্সের সীমানায় পরাজয় – আবার মুসলিমের গৃহযুদ্ধ শুরু

৭৪০ – (ক) ইরাবে শিয়া বিদ্রোহ। (খ) উত্তর আফ্রিকায় বারবার বিদ্রোহ

৭৪৩ – খোরাসানে শিয়া বিদ্রোহ

৭৪৪ – বিদ্রোহীদের অভ্যুত্থানে খলিফা ২য় ওয়ালিদ নিহত

৭৪৫ – খোরাসানে আবার শিয়া বিদ্রোহ – খারাজী দ্বারা কুয়া ও মসুল দখল

৭৪৬ – খোরাসানে আবু মুসলিমের বিদ্রোহ

৭৪৯ – ইস্পাহান ও নিহাওয়ান্দ-এর যুদ্ধ

৭৫০ – (ক) আব্বাসীয়-দের দ্বারা রক্তাক্ত গণহত্যায় উমাইয়া খেলাফতের অবসান। (খ) যাব-এর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ

৭৫৫ – খোরাসানে আবার বিদ্রোহ

৭৬২ – ইব্রাহিম ও নাফ্‌উজ জাকিয়া-র নেতৃত্বে শিয়া বিদ্রোহ

৭৬৭ – সিজিলমাসা-য় খারেজী শাসনের শুরু

৭৭২ – উত্তর আফ্রিকায় জানবি-র যুদ্ধ, মরক্কোতে বিদ্রোহী রুস্তমিদ খেলাফত শুরু

৭৮৮ – মগরেব-এ ইদ্রিসিদ খেলাফত শুরু

৭৯৯ – খাজার-দের বিদ্রোহ দমন

৮০০ – উত্তর আফ্রিকায় আঘলাবিদ খেলাফত শুরু

৮০৩ – ইমাম জাফর বারমকি-র খুন

৮১৪ – খলিফা হারুন রশীদের মৃত্যুতে দুই পুত্র আল্ আমিন ও আল্ মামুনের ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ। আল্ আমিন নিহত

৮১৫ – ইবনে তুবা-র নেতৃত্বে শিয়া বিদ্রোহ – কয়েক বছর যুদ্ধের পর সেনাপতি হুরমুজান নিহত

৮২০ – খোরাসান-এ তাহিরিদ খেলাফত শুরু

৮২৭ – মুতাজিলা-দের সাথে অন্যান্যদের বিরোধ শুরু

৮৩৭ – জাট (ভারতের নয়) বিদ্রোহ

৮৩৮ – আজারবাইজান-এ বাবেক বিদ্রোহ দমন

৮৪৩ – তাবারিস্তান-এ মাজাইর বিদ্রোহ

৮৬১ – বিদ্রোহী অভ্যুত্থানে খলিফা মুতাওয়াক্কিল নিহত

৮৬৪ – তাবারিস্তান-এ যায়দি খেলাফত শুরু

৮৬৬ – খলিফা মুতাসিম বিতাড়িত – নূতন খলিফা মুতা'জ

৮৬৭ – সিস্তান-এ সাফারিদ খেলাফত শুরু

৮৬৮ – মিশরে তুলুনিদ খেলাফত শুরু

৮৬৯ – খলিফা মুতা'জ বিতাড়িত – নূতন খলিফা দাসী-পুত্র আল্ মুহতাদি

৮৭০ – তুর্কী বিদ্রোহে আল্ মুহতাদি নিহত – নূতন খলিফা আল্ মুতামিদ
৮৭৩ – রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে তাহিরিদ খেলাফতের উচ্ছেদ
৮৭৪ – দক্ষিণ ইরাকে জাঞ্জ বিদ্রোহ
৮৯১ – কেন্দ্রীয় খেলাফত অস্বীকার করে বাহরায়েন-এ কামাতিয়ান শাসনে উদ্ভব
৮৯৭ – কামাতিয়ান দ্বারা বসরায় গণহত্যা
৯০৫ – মসুল ও জাজিরা-য় হামদানিদ খেলাফত শুরু – মিশরে তুলুনিদ খেলাফতের উচ্ছেদ
৯০৮ – সামানিদ খেলাফত দ্বারা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে সাফারিদ খেলাফতের অবসান

অন্যান্য সূত্র ও ইসলামিক ওয়েরসাইট ঃ–

http://www.muslimaccess.com/sunnah/historyofislam/centuries/century9.html
বিভিন্ন দলিলে সালের কিছু পার্থক্য দেখা যায়।

মুসলমানের হাতে মুসলমানের চোদ্দশ' বছরের গণহত্যা **১৯৭১** সালেও শেষ হয়নি ॥

ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম ধর্মহীনতা

ডিকশনারীতে লেখা আছে ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থাৎ সেকুলারিজম্-এর অর্থ হল এমন রাষ্ট্রব্যবস্থা যা ধর্মবিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করে। এর কারণও আছে। হাজার হাজার বছর ধরে ধর্মীয় রাষ্ট্রের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিতিবিরক্ত জনগণ ঘৃণা ও গণবিক্ষোভের দ্বারা ধর্মীয় রাষ্ট্র উৎখাত করে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেছিল। তাই স্বাভাবিকভাবেই বলা ছিল রাষ্ট্রযন্ত্রে ধর্মের স্থান নেই। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা প্রাচীনকাল থেকে বলেছেন ইবনে রুশ্‌দের মত দার্শনিকেরাও (উইকিপিডিয়া)। কিন্তু "নিরপেক্ষতা" শব্দের অর্থ যাঁরা বলেন "হীনতা" তাঁরা বলতে চান বিবেকহীন লোক আসলে বিবেক-নিরপেক্ষ লোক, প্রাণহীন দেহ আসলে প্রাণ-নিরপেক্ষ এবং বৃষ্টিহীন মরু আসলে বৃষ্টিনিরপেক্ষ মরুভূমি। কথাটা মতলবি তা ব্যাখ্যার দরকার হয় না।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে প্রত্যেকের মানবাধিকার সুরক্ষিত এবং আইনের চোখে সবাই হুবহু এক তা সে রাস্তা-পরিষ্কারকারী হোক বা দেশের প্রেসিডেন্ট হোক। অথচ ধর্মরাষ্ট্রে – "রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে আদালতী কার্যক্রম" ধারার উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ- (রাষ্ট্রপ্রধান) "হদ্দ-এর আওতাভুক্ত কোন্ অপরাধ করিলে (ডাকাতি, চুরি, মদ্যপান, মানুষ-খুন, যৌন-ব্যাভিচার ইত্যাদি – *লেখক*) তাহার বিরুদ্ধে আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করা যাইবে না" – বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ৩য় খণ্ড আইন নং ৯১৪ গ (উদ্ধৃতি শেষ) এবং হানাফি আইন হেদায়া পৃষ্ঠা ১৮৮। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে এরকম ভয়াবহ আইন হয় না। তওবা করলেই গণহত্যাকারীর শাস্তি মাফ – বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ১ম খণ্ড ধারা ১৩, – ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে এরকম ভয়াবহ আইনও হয় না। পাকিস্তান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের

প্রথম মহিলা গভর্নর ডঃ শামশাদ আখতার ব্যাংকের কিছু বিশেষ দলিলে সই করতে পারবেন না – এটাও ঘটে ধর্মীয় রাষ্ট্রেই, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে এটা কল্পনাও করা যায় না – দৈনিক ডন ২৯-০৯-২০০৮ – কেউ কেউ বলেন এসবের ব্যাখ্যা আছে। আমরা খুঁজে দেখেছি এসবের কোনোই গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা নেই, থাকতে পারে না। তাছাড়া দুনিয়ায় প্রতিটি ধর্মের আলাদা ধর্মীয়রাষ্ট্র হ'লে বিশ্ব-মানবসমাজ ধর্মের ভিত্তিতে টুকরো টুকরো হয়ে পারস্পরিক ঘৃণাভিত্তিক মারাত্মক হানাহানির মধ্যে পড়ে যাবে। এসব কারণ ছাড়াও ন্যায় ও যুক্তির আলোকে অসংখ্য মুসলিম কোরাণের ভিত্তিতে ও অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসীরা তাঁদের ধর্মগ্রন্থের ভিত্তিতে ধর্মে রাজনীতি এবং রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে ধর্ম মেশানোকে প্রচণ্ড ধর্ম-বিরোধী মনে করেন।

ধর্মীয় রাষ্ট্র হাজার হাজার বছর সময় পেয়েছিল নিজেদের যৌক্তিকতা প্রমাণ করার, এখনো পাচ্ছে কিছু দেশে। কিন্তু কিছু হাতেগোনা শাসকের সময় ছাড়া এর ইতিহাস ভারাক্রান্ত হয়ে আছে জনগণের দুর্ভোগে, মানবাধিকার লঙ্ঘনে, নারীর অশ্রু আর রক্তে। ভ্রান্তিময় মানুষ যখন ঐশী ধর্মের মালিক হবার অপচেষ্টা করে তখন এসব হতে বাধ্য। এক ধর্মের ধর্মরাষ্ট্র বানাবার চেষ্টা করলে দুনিয়ার প্রতিটি ধর্মের আলাদা রাষ্ট্রকে বৈধ ও উৎসাহিত করা হয়। ইউরোপ-অ্যামেরিকা-অষ্ট্রেলিয়ায় ওরা ঈহুদী-খ্রীষ্টান রাষ্ট্র বানিয়ে আমাদের ঘাড়ে ওদের শারিয়া চাপিয়ে দিলে কোটি কোটি মুসলমানের কি দুর্দশা হবে আর তার জন্য কে দায়ী থাকবে ? ভারতের মুসলমানদের জন্য কি সর্বনাশের কথা, মওদুদি ভারতে হিন্দু-রাষ্ট্র সমর্থন করেছেন "যদি সেখানে মুসলমানদের সাথে শূদ্র-র মত ব্যবহার করা হয় তবুও" (মুনির কমিশন রিপোর্ট)। এই কি মওদুদি'র বিশ্ব-মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ? কিংবা "যদি সেখানে মুসলমানদের অধিকার থাকে যেমন ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমদের আছে" (শাহ আবদুল হান্নান – আন্তর্জাল আলোচনা ফোরাম)। কথাটা ঠিক নয়। শারিয়া আইনগুলো পড়ে দেখুন, শারিয়া-রাষ্ট্রগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখুন, পাকিস্তান-ইরাণ-নাইজেরিয়ার অমুসলিমদেরকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখুন, ভারত ও ইসরাইলে মুসলিমদের জিজ্ঞেস ক'রে দেখুন তাদের সম্মান ও মানবাধিকার কি অন্যায় ও নিষ্ঠুরভাবে পদদলিত করা হয়েছে । এ হবেই কারণ এ না-হলে ধর্মরাষ্ট্রই হয় না। "শারিয়া আইনের উদাহরণ" পরিচ্ছেদে দেখিয়েছি অতীতের হিন্দু-রাষ্ট্রে (মূল নাম সনাতন ধর্ম) কত অন্যায় ও হিংস্র আইন প্রয়োগ করা হতো – আবার দিচ্ছি (সূত্র ঃ প্রাচীন ভারত, সমাজ ও সাহিত্য – ডঃ সুকুমারী ভট্টাচার্য্য) ঃ

- বিধবাকে মৃত স্বামীর সাথে পুড়িয়ে মারার আইন (অথর্ববেদ ১৮/৩/৩)।
- "পিতামাতার জন্য কন্যা অভিশাপ" (ঐত্তরীয় ব্রাহ্মণ ৬/৩/১৩)।
- "লাঠি দিয়ে স্ত্রীকে মেরে দুর্বল করা উচিত যাতে শরীরের ওপরে তার কোনো অধিকার না থাকে" (শতপথ ব্রাহ্মণ ৪/৪/২/১৩)।
- সর্বগুণান্বিতা নারীও অধমতম পুরুষের চেয়ে অধম" (তৈত্তরীয় সংহিতা ৬/৫/৮/২)।

- "পুত্র-কন্যার সামনে স্বামী উপপত্নী আনা বা বেশ্যাগমন করতে পারবে কিন্তু স্ত্রীর সামান্য পদস্খলনে সমাজ কঠোর দণ্ড দেবে" (মৈত্রায়নী-র বিভিন্ন আইন ও তৈত্তিরীয় সংহিতা ৬/৫/৮/২)।
- "কালো পাখি, শকুন, নেউল, ছুঁচো, কুকুর ও নারী হত্যার প্রায়শ্চিত্ত একই" (আপস্তম্ভ ধর্মসূত্র ১/৯/২৩/৪৫)।
- "নারীকে অবরুদ্ধ রাখো, নাহলে তার শক্তিক্ষয় হবে" (শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪/১/১/৩১)।
- একটি যজ্ঞে "সদ্যোজাত পুত্রকে ওপরে তুলে ধরা হয়, কন্যাকে মাটিতে শুইয়ে রাখা হয়" (তৈত্তরীয় সংহিতা ৬/৫/১০/৩)।
- "উত্তম নারী হল 'যে স্বামীকে সন্তুষ্ট করে, পুত্র-সন্তানের জন্ম দেয় ও স্বামীর কথার ওপরে কথা বলে না' " (ঐত্তরীয় ব্রাহ্মণ ৩/২৪/২৭)।
- "সন্তান না জন্মালে ১০ বছর পর ও পুত্র না জন্মালে ১২ বছর পর স্ত্রীকে ত্যাগ করা যাবে" (আপস্তম্ভ ধর্মসূত্র ১/১০-৫১-৫৩)।
- "যার স্ত্রীর চেয়ে পশুর সংখ্যা বেশি সে সৌভাগ্যবান" (শতপথ ব্রাহ্মণ ২/৩/২/৮)।

ভয়াবহ ব্যাপার, কল্পনা করলেও গা' শিউরে ওঠে। ইউরোপের গীর্জা-রাষ্ট্রের অত্যাচারও ছিল ভয়ংকর।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ঐতিহাসিক শক্তির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলে তবে তা জাতির দুর্ভাগ্য ও দুর্ভোগ বয়ে আনবে। মীর জাফর বা কুইসলিং নাম দু'টোর আদি অর্থ ভারী চমৎকার কিন্তু তা এখন এতই ঘৃণিত যে কোন বাঙালি বা নরওয়েবাসী তার ছেলের ও-নাম কোনদিনও রাখবে না। রাজাকার বা আল্ বদর শব্দেরও ওই দশা। বাস্তবে এখন সেকিউলারিজম-এর অর্থও বদলে গেছে আমূল। দুনিয়াময় ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলো এখন ধর্মের বিরোধী তো নয়ই বরং সাংবিধানিকভাবে সব ধর্মকে রক্ষা ও সহায়তা করে। আমাদের প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ সরকার বানিয়েছে বাংলাদেশ ইসলামি ফাউণ্ডেশন। বায়তুল মুকাররমের সমস্ত খরচ দেয় আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ সরকার। ইউরোপ-আমেরিকা-ক্যানাডা-অস্ট্রেলিয়ার ধর্মনিরপেক্ষ সরকারগুলোর অজস্র টাকা ও সহায়তায় মুসলিম ইমিগ্র্যান্ট, ইসলামি সংগঠন, মসজিদ-মাদ্রাসা, ওয়াজ-মহফিল, রেডিও-টিভি চ্যানেল, এমনকি শারিয়া-ব্যাঙ্ক, শারিয়া-মিউচুয়াল ফাণ্ড, শারিয়া-ইকুয়িটি ইত্যাদি গত কয় দশকে বেড়েছে কয়েক গুণ বললে ভুল হবে—বিস্ফোরিত হয়েছে কয়েকশ' গুণ। কোন ধর্মনিরপেক্ষ সরকার কোটি কোটি দিনার-দিরহামকে বাধা দেয়নি হাজার হাজার মসজিদ ও ইসলামি সংগঠন বানাতে। এমনকি জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে শারিয়া'র সমালোচনা নিষিদ্ধ করে ক্রমাগত প্রস্তাব গ্রহণ করেছে গত বছরগুলো থেকে। উদ্ধৃতি দিচ্ছি ধর্মনিরপেক্ষতার বিরোধী আমাদের দৈনিক থেকেও ঃ

"জার্মানীতেই বর্তমানে আড়াই হাজারের ওপর মসজিদ রয়েছে। সে-দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন তাঁর সরকার জার্মানীতে আরো মসজিদ তৈরি করবে। একই ঘোষণায় তিনি এ'ও জানান, জার্মানীর সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় জার্মান ভাষায় ইসলাম শিক্ষা দেয়া হবে ... এ বোধোদয় ফরাসী প্রেসিডেন্ট সারাকোজীর মধ্যেও এসেছে ... উদ্যোগ নিয়েছেন যাতে তিনি ফ্রান্সে ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনে অর্থ সহায়তা দিতে পারেন। বৃটেন ইতোমধ্যে মুসলমানদের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে অর্থ সাহায্য প্রদান করেছে ... ইতালীর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 'ইতালীয় ইসলামি সংহতকরণ' নামে ইতালীতে মুসলমানদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরকারের পক্ষ থেকে অনুদান চালু করেছেন। এভাবে ইউরোপের প্রায় সব দেশই রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামের পৃষ্ঠপোষকতায় নিজেদের সম্পৃক্ত করেছে" (ইউরোপ ও ইসলাম – দৈনিক নয়া দিগন্ত – ২৩শে জুলাই, ২০০৮)।

আমেরিকার ডলারে লেখা নেই "ইন্ গড উই ট্রাস্ট"? হ্যাঁ, লেখা আছে। আদালতগুলোতে বাদী-বিবাদীকে ধর্মীয় শপথ নিতে হয় না ? হয়। সাংসদ ও রাষ্ট্রপ্রধানকে ধর্মীয় শপথ নিতে হয় না ? হয়। ক্যানাডায় সাংবিধানিকভাবে ক্যাথলিক স্কুলে প্রচুর সরকারি টাকা যায় না ? যায়। সমস্ত ধর্মীয় স্কুলে সরকারি আর্থিক অনুদানের প্রস্তাব করেনি এক রাজনৈতিক দল ? করেছে। বিলেতের সরকার রাষ্ট্রীয় ট্রেজারি থেকে শারিয়া-বণ্ড বাজারে ছাড়েনি ? ছেড়েছে। আমেরিকার ট্রেজারী ইসলামি ব্যাঙ্কিং-এর অনুমোদন দেয়নি ? দিয়েছে। আমেরিকার সরকারি প্রতিষ্ঠান এ-আই-জি শারিয়া-ব্যাঙ্কিং অনুমোদন দেয়নি ? দিয়েছে। লণ্ডনের বিশাল মসজিদের জন্য দশ কোটি পাউণ্ড সরকারি অনুদানের প্রস্তাব ছিল না ? ছিল, সে ই-মেল আমরা পেয়েছি। জার্মানীর কোলন-এ বৈধভাবে সুবিশাল মসজিদ নির্মিত হচ্ছে না ? হচ্ছে। বিলেত ও জার্মানী তাদের আইনে মুসলিম নাগরিকদের জন্য বহুবিবাহের কিছু উপাদান গ্রহণ করেনি ? করেছে। লণ্ডনের টাওয়ার হ্যামলেট কাউন্সিল আটত্রিশ হাজার পাউণ্ড অনুদান দেয়নি কর্ডোভা ফাউণ্ডেশনকে ? দিয়েছে। সরকারগুলো পুলিশ দিয়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোর তত্ত্বাবধান করে না ? করে। বেলজিয়ামের ব্রাসেল্‌স্ শহরে সরকার শারিয়ার বিরুদ্ধে মিছিল নিষিদ্ধ করেনি ? করেছে। এক টরন্টো শহরেই রেজিস্টার্ড ইসলামি সংগঠন নেই একশ' একুশটা ? আছে। অনানুষ্ঠানিক আরো কয়শ'? আছে। ইংল্যাণ্ডে জার্মানীতে ফ্রান্সে প্রায় সাত হাজার বৈধ ইসলামি সংগঠন নেই ? আছে। ধর্মীয় উপাসনালয়গুলো সাধারণত বিশাল জমির ওপরে বিরাট দালান হয়, অনেক দেশে সাংবিধানিকভাবে সেগুলোর সম্পত্তি-কর ও পানি-বিজলির কর মওকুফ করা হয় না যার পরিমাণ বিপুল ? হয়। সরকারগুলোর ক্ষমতা নেই এগুলোর প্রত্যেকটি বন্ধ করার ? আছে, কিন্তু করেনি। এরই নাম ধর্মনিরপেক্ষ সরকার। কাজেই ধর্মনিরপেক্ষতাকে ধর্মহীন বা ধর্মবিরুদ্ধ বলাটা প্রতারণামূলক অকৃতজ্ঞতা।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থায় কিছু ত্রুটি অবশ্যই আছে যেমন এর ভেতর থেকেই বুশ-ব্লেয়ার-এর মত গণহত্যাকারী দানব উঠে এসেছে, কিংবা দুর্নীতি, অস্ত্র ও পেশীশক্তির কারণে অনেক

দেশে জনগণ ইচ্ছেমতো ভোট দিতে পারে না, ইত্যাদি । কিন্তু বহু দেশে এটা অত্যন্ত সফলও, সময়ের বিবর্তনে জনগণের শিক্ষা-সচেতনতায় ক্রটিগুলো কেটে যাবে ।

ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান ইহুদী-খ্রীষ্টানদের পাদ্রী-রাবাইরাও বানায়নি, গীর্জাতেও বানানো হয়নি । ওগুলো সংসদে বসে বানিয়েছেন সমাজবিজ্ঞানীরা যাঁরা আধুনিক বিষয়ে উচ্চশিক্ষিত, বাইবেল-এ নয় । সমাজ-বিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে সংবিধানকে সংসদে বসে পরিবর্তন করছেন জনগণের নির্বাচিত সাংসদেরাই, গীর্জার পাদ্রী-রাবাইরা নন । ঠিক যেমন বিজ্ঞানীরা ল্যাবরেটরিতে বহু কষ্টের গবেষণায় বানিয়েছে বহু ওষুধ যা আমাদের প্রাণ রক্ষা করে বা দালান-ব্রিজ-কারখানা ও শিল্পায়নের প্রযুক্তি দেয় । তাই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থা যদি "ইহুদী-খ্রীষ্টানদের শয়তানি ষড়যন্ত্র" ও "কুফরি আকিদা" হয় তবে ইহুদী-খ্রীষ্টানদের আবিষ্কৃত টুথব্রাশ চিরুণি থেকে শুরু করে বক্তৃতার মাইক বাস ট্রাক কাপড় হিটার এয়ারকণ্ডিশনার জুতো মাথাব্যথার ট্যাবলেট বুড়ো বাবা-মা'র ইনসুলিন কম্পিউটার রেডিও টিভি গাড়ি হাসপাতালের যন্ত্রপাতি হাজারো ওষুধ—সবই "ইহুদী-খ্রীষ্টানদের শয়তানি ষড়যন্ত্র" এবং "কুফরি আকিদা" হতে হয় ।

যেখানে মানুষের জীবন ঘিরে আছে হাজারো ধর্মনিরপেক্ষ উপাদান সেখানে রাষ্ট্রযন্ত্রে ধর্মনিরপেক্ষতাকে অস্বীকার করাটা অজ্ঞতা বা আত্মপ্রতারণা ছাড়া আর কি হতে পারে আমি জানি না । "নিরপেক্ষতা" শব্দের অর্থ "হীনতা" করলে মিথ্যাকে জায়েজ করা হয় । এই মিথ্যার সাথে যোগ হয়েছে, "কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাক্ষ্য গোপন করার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে"– বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ২৩১ । বলাই বাহুল্য, এই "কোনো কোনো ক্ষেত্র"-টা আসলে কি তার তালিকা দেয়া হয়নি । তাই এ-উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র-বিরোধী ষড়যন্ত্র, জঙ্গীতন্ত্র, বিদেশ থেকে গোপন অর্থ-সমাগম, গোপন অস্ত্রশিক্ষা, গোপন জঙ্গীসাহিত্য ইত্যাদি জানার পরেও "সাক্ষ্য গোপন রাখার উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে" । ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ওরকম আইন হয়না, – সেখানে হয় "তোমরা সাক্ষ্য গোপন করিও না"– বাকারা ২৮৩, মায়েদা ১০৬, ইমরাণ ১৬১ ইত্যাদি ।

এর সাথে এটাও দেখা দরকার –"যদি উদ্দেশ্যটি বাধ্যতামূলক হয় তবে মিথ্যা বলা বাধ্যতামুলক"– শাফি আইন নং আর.৮.২ ইত্যাদি । অর্থাৎ যিনি ধর্মীয় রাষ্ট্রকে বাধ্যতামূলক মনে করেন তাঁর জন্য এ উদ্দেশ্যে ধর্মনিরপেক্ষতাকে ধর্মহীনতা, এই মিথ্যা বলাও বাধ্যতামূলক ।

"মিথ্যা বলা বাধ্যতামুলক" আইনও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে হয় না । ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে হয় – "মিথ্যা বলা থেকে দূরে থাকো ... সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিও না"– সুরা হজ্ব ৩০ এবং বাকারা ৪২ ।

সে নির্দেশ লঙ্ঘন করলে কি হবে ?

"তাদের মিথ্যাচারের দরুণ তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে ভয়াবহ আজাব"– বাকারা ১০ ॥

আল্ কোরাণ

আপনি কি ভূগোলের বইতে ইতিহাস পান ? কিংবা অঙ্কের বইতে ইংরেজী ? ও-রকম করলে সেই বিখ্যাত আবু ভাই-এর মত ফেল করতে করতে স্কুলের এক ক্লাসেই জিন্দেগি কেটে যাবে, কলেজের মুখ আর দেখতে হবে না। ডাক্তারি কেতাবে অর্থনীতি খুঁজলে অনর্থ হবেই, অঙ্কের কেতাব থেকে রন্ধনপ্রণালী শিখলে জগাখিচুড়ি ছাড়া উপায় নেই। ইতিহাস বইতে কোন প্রাচীন গোত্রের অর্থনীতির বিবরণ থাকতে পারে কিন্তু তাতে সেটা অর্থনীতির বই হয়ে যায় না, বরং সেটা ওই ইতিহাসকেই প্রতিষ্ঠিত করে। কোরাণ আসলে কিসের কেতাব ? কোরাণে ইতিহাস আছে কিন্তু কোরাণ তো মূলতঃ ইতিহাসের কেতাব নয় ! কোরাণে ভূতত্ত্ব আছে কিন্তু কোরাণ মূলতঃ ভূগোলের কেতাব নয় ! কোরাণে গ্রহ-নক্ষত্র ও কাব্য আছে কিন্তু কোরাণ মূলতঃ নক্ষত্র-বিজ্ঞান বা কবিতার কেতাব নয়। এই একই হিসেবে কোরাণে কিছু সামাজিক আইনও আছে কিন্তু কোরাণ মূলতঃ আইনের বইও নয়। তাহলে কোরাণ কিসের কেতাব ? জবাবটা দিয়েছে খোদ কোরাণ নিজেই। সেই সাথে চলুন এটাও দেখি শারিয়াপন্থীরা কিভাবে কোরাণের নিজের সংজ্ঞাকে বিচার করেন। তাঁদের সুউচ্চ দার্শনিক নেতা মওলানা মওদুদি তাঁর বিশাল কেতাব তাফহিমুল কুরাণে প্রতিটি আয়াত ধরে ধরে কোরাণের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এখন দেখা যাক এই অতি গুরুত্বপূর্ণ আয়াতগুলোর ব্যাপারে তিনি কি বলেছেন। বইটা পাওয়া যাবে ইণ্টারনেটেও ঃ http://www.tafheem.net/main.html

সুরা ছোয়াদ ৬৭ এবং ৮৭ – "বলুন, এটি এক **মহা সুসংবাদ** – এটা তো বিশ্ববাসীর জন্য এক **উপদেশ** মাত্র।" মওলানা মওদুদি কোনো মন্তব্য না ক'রে নিঃশব্দে পরের আয়াতে চলে গেছেন।

মুজাম্মিল ১৯ – **"এটা উপদেশ**। অতএব যার ইচ্ছা সে তার পালনকর্তার দিকে পথ অবলম্বন করুক।" মওলানা মওদুদি কোন মন্তব্য না করে নিঃশব্দে পরের আয়াতে চলে গেছেন।

মুদাস্‌সির ৫৪ – **"এটা তো উপদেশ মাত্র**।" মওলানা মওদুদি কোন মন্তব্য না করে নিঃশব্দে পরের আয়াতে চলে গেছেন।

আশ শুরা ৫২ – "আপনি জানতেন না কোরাণ কি ও ইমান কি। কিন্তু আমি একে করেছি **নূর**।" মওলানা মওদুদি কোন মন্তব্য না করে নিঃশব্দে পরের আয়াতে চলে গেছেন।

সুরা ইমরাণ ১৮৪ – কোরাণ হলো "মুনীর" অর্থাৎ **"আলোকিত কিতাব।"** মওলানা মওদুদি কোন মন্তব্য না করে নিঃশব্দে পরের আয়াতে চলে গেছেন।

সুরা আনাম ৯০ – "এটি বিশ্বের জন্য **উপদেশ** মাত্র।" মওলানা মওদুদি কোনো মন্তব্য না করে নিঃশব্দে পরের আয়াতে চলে গেছেন।

সুরা আল্ ফুরকান ১ – "পরম করুণাময় তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি **ফয়সালার গ্রন্থ** অবতীর্ণ করেছেন।" মওদুদি বলেছেন আল্লাহ কোরাণ নাজিল করেছেন যাতে পয়গম্বর মানবজাতিকে উপদেশ দিতে পারেন – (so that he may admonish all mankind)। অর্থাৎ কোরাণ হল উপদেশেরই কেতাব।

সুরা হিজর ৯ – "আমি এই **উপদেশগ্রন্থ** নাজিল করেছি।" মওদুদি এখানে বলেছেন কোরাণ হল আল্লাহ'র "বাণী" (Word)।

সুরা হজ্ব ৮ – কোরাণ হল **"আলোকিত কিতাব।"** মওদুদি এখানে বলেছেন আলোকিত কেতাব হল বেহেশতি উৎস থেকে পাওয়া তথ্য। কিসের তথ্য তা তিনি বলেননি।

আল্ যুমার ২৩ – "আল্লাহ **উত্তম বাণী** তথা কিতাব নাজিল করেছেন যা সামঞ্জস্যপূর্ণ।" মওদুদি নিজেও ইংরেজি তরজমা করেছেন This is Allah's guidance অর্থাৎ "নৈতিক পথনির্দেশ।"

সুরা আবাসা ১১ – **"এটা উপদেশবাণী"**। মওদুদি বলেছেন "The allusion is to the Qur'an", অর্থাৎ "ইহা কোরাণ সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে।" অর্থাৎ তিনি স্বীকার করেছেন কোরাণ হলো উপদেশবাণী।

অর্থাৎ মওদুদির মত নেতাও এই অতি গুরুত্বপূর্ণ আয়াতগুলোকে হয় নিঃশব্দে পাশ কাটিয়ে চলে গেছেন, অথবা সমর্থন করতে বাধ্য হয়েছেন, নয়ত এমন ব্যাখ্যা করেছেন যা বিষয়ের সাথে মেলে না – কিন্তু বিরোধীতা কোথাও করতে পারেননি।

এই হলো সহজ সরল কোরাণ। এর বিপরীতে সারা কোরাণে এ-রকম সুস্পষ্ট কোনই আয়াতে নেই কোরাণ সামাজিক আইন বা রাষ্ট্র বানানোর কেতাব ! উপদেশ বা সুসংবাদ জোর করে চাপানোর জিনিস নয়। সামাজিক সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক সামরিক ইত্যাদি বিষয়ে রাষ্ট্র তার আইন জোর করে নাগরিকদের ওপরে চাপায় বলে সেটা আর লা ইকরাহা ফিদ্বীন (ধর্মে জোর জবরদস্তি নেই) থাকে না। কোরাণ যদি রাষ্ট্রীয় আইনের বই হত তবে এতে হাজার হাজার আইন থাকত যা জীবনে দরকার। অথচ কোরাণে সামাজিক আইন আছে মাত্র পাঁচ-সাতটা। এ পাঁচ-সাতটা ঘটনা বাস্তবে ঘটেছিল বলেই আইনগুলো এসেছিল। যে অপরাধ তখন ঘটেনি অথচ পরে ঘটেছে সে সম্বন্ধে কোরাণ নীরব। এমনকি কোরাণের শেষ

আয়াতগুলো যেখানে কোরাণ বলেছে ইসলামই হল আল্লাহ্‌'র মনোনীত ধর্ম, সে আয়াতগুলোতেও কোনো রাষ্ট্রীয় আইনের কথা নেই, আছে শুধু উপদেশ আর মূল্যবোধের নির্দেশ। কোরাণ কিসের কেতাব তা বলেছেন স্বয়ং নবীজী ঃ "ইহা আল্লাহ্‌'র কেতাব যাহাতে রহিয়াছে নূর ও সঠিক পথনির্দেশ" – সহি মুসলিম হাদিস ৫৯২০। একই কথা বলেছেন যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম বুখারী ঃ "কোরাণ কোন আইনের কেতাব নহে" – এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা – ১৯৮৩। এ-কথা বলার সাথে সাথে খলীফা তাঁকে জনগণ থেকে সরিয়ে সমরখন্দে নির্বাসনে পাঠান, সেখানেই তিনি মারা যান।
এখন দেখা যাক ইসলাম কি আর মুসলিম কে ॥

ইসলাম কি, মুসলমান কে

যে কোনো কিছু নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই সেটা কাকে বলে তা ঠিক করতে হয়। তাতে আলোচনার সুবিধে হয়। ইসলাম কি আর মুসলমান কে তা ঠিক করতে পাকিস্তানে ১৯৫৩ সালে মুনির কমিশন মওলানা মওদুদি সহ দেশের সর্বোচ্চ ৭ জন মওলানার সাথে আলোচনা করেছিলেন দীর্ঘ দু'বছর ধরে। শেষ পর্যায়ে এসে কমিশন রিপোর্ট দিয়েছিল, (সারাংশ) মুসলমান কাকে বলে সে-ব্যাপারে প্রত্যেক মওলানার মতামত এতই আলাদা যে এঁদের কেউ কোন ইসলামি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হলে বাকি সবাইকে মুরতাদ হিসেবে কল্লা কেটে ফেলবেন (মুনির কমিশনের রিপোর্ট পৃষ্ঠা ২১৬, লিগ্যাল সাইজ)। অর্থাৎ কে মুসলমান সেটাই ঠিক করা গেল না কিন্তু কে মুসলমান নয় সেই হুঙ্কারে চোদ্দশ' বছর ধরে রক্তস্রোতে কেঁপেছে মুসলিম-বিশ্ব, কাঁপছে বাংলাদেশ।

কিন্তু মওলানারা যা জানতেন না বা নিজেরা জানলেও জাতিকে জানাতে চাননি তা বিখ্যাত জিব্রাইলের হাদিসে বলে গেছেন পয়গম্বর (সাঃ) নিজে - (উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত) – "একদিন হজরত জিব্রাইল মানুষের বেশে নবীজীর কাছে আসিলেন এবং বলিলেন, হে নবী। ইসলাম কাহাকে বলে ?" তিনি বলিলেন, "ইসলাম হইল, তুমি আল্লাহ্‌'র ইবাদত করিবে এবং কাহাকেও শরিক করিবে না, নামাজ প্রতিষ্ঠা করিবে, জাকাতকে ফরজ হিসাবে পালন করিবে" (সহি বুখারি ও মুসলিম, ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৭৩৩, নোট ১, এবং মিশকাতুল মাসাবিহ্‌ ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ২৩-২৫, নং ২(১)-এর সূত্রে বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৪৯৮)। একই প্রমাণ দেখুন হাদিস কুদসি থেকে ঃ আন্‌ নাবাবীর

ফর্টি হাদিস –

HADITH 2

Also on the athority of 'Umar (may Allah be pleased with him), who said :
One day while we were sitting with the Messenger of Allah (may the blessings and peace of Allah be upon him) there appeared before us a man whose clothes were exceedingly white and whose hair was exceedingly black; no signs of journeying were to be seen on him and none of us knew him. He walked up and sat down by the Prophet (may the blessings and peace of Allah be upon him). Resting his knees against his and placing the palms of his hands on his thighs, he said: O Muhammad, tell me about Islam. The Messenger of Allah (may the blessings and peace of Allah be upon him) said: Islam is to testify that there is no god but Allah and Muhammad is the Messenger of Allah, to perform the prayers, to pay the zakat, to fast in Ramadan, and to make the pilgrimigate to the House if you are able to do so. He said: You have spoken rightly, and we were amazed at him asking him and saying that he had spoken rightly.

এবারে দেখা যাক আবদুল করিম খান সম্পাদিত হাফেজ আবদুল জলিলের বাংলা অনুবাদ, পৃষ্ঠা ৩৯ হাদিস নম্বর ১২। লম্বা হাদিস, মাঝখান থেকে তুলে দিচ্ছি ঃ "আবদুল্লা কায়েস নামক গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল ... আরজ করিল – ইয়া রসুলুল্লাহ্‌ ! ... আপনি আমাদিগকে কয়েকটি স্পষ্ট উপদেশ ও আদেশ নিষেধ বলিয়া দিন যাহা অনুসরণ করিয়া আমরা সকলে বেহেশ্‌ত লাভের উপযুক্ত হইতে পারি। ... রসুলুল্লাহ্‌ (দঃ) প্রথমতঃ তাহাদিগকে চারিটি কর্তব্যের আদেশ করিলেন। (১) ... কায়মনোবাক্যে এই অঙ্গীকার ও স্বীকারোক্তি করা যে একমাত্র আল্লাহ্‌ই মা'বুদ, আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই এবং মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ্‌'র রসুল। (২) নামাজ উত্তমরূপে আদায় করা, (৩) জাকাত দান করা, (৪) রমজান মাসে রোজা রাখা এবং গণিমতের মালের এক পঞ্চমাংশ দেওয়া। রসুলুল্লাহ্‌ (দঃ) তাহাদিগকে চারিটি বস্তু (পাত্র) ব্যবহার করিতে নিষেধ করিলেন। রসুলুল্লাহ্‌ (দঃ) তাহাদিগকে ইহাও বলিলেন, এই সব আদেশ নিষেধকে তোমরা ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইবে এবং দেশে গিয়া সকলকে ইহা জানাইয়া দিবে।"

এই হলো ইসলাম, - বেহেশ্‌ত লাভের উপযুক্ত, এর মধ্যে না আছে ফতোয়া, না আছে শারিয়া-আইন বা রাষ্ট্র। এরই সমর্থন আমরা দেখতে পাই কোরাণে, নবীজীর জীবনীতে, আমাদের ইমামদের মধ্যে আর ইসলাম প্রচারকদের মধ্যে। নবীজী কেন বলেছিলেন যারা অনুপস্থিত তাদের "সকলকে ইহা জানাইয়া দিবে ?" কারণ, ওটাই হল ইসলাম। এ-নির্দেশ চিরকালের মুসলিমের জন্যও, আমাদের জন্যও। সমাজ চালানোর জন্য তাঁকে যে-সব সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল সেগুলোকে কিন্তু তিনি কখনোই বলেননি "সকলকে ইহা জানাইয়া দিবে।" এভাবেই তিনি এ-সত্যকে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন যে, কোন একসময়ের কোন একসমাজের শাসন-ব্যবস্থা ইসলামি ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গ নয়। এর সাথে চমৎকার মিল রেখে আল্লাহ্‌ পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন তাঁর রসুলদেরকে –

"সুসংবাদ দাতা ও ভীতিপ্রদর্শক ব্যতীত (অন্য কোন কাজে) আমি পয়গম্বর প্রেরণ করি না" (আল আনা'ম, আয়াত ৪৮)। এর সাথে আমাদের এ-দাবিও মিলে যায়, হজরত আদম থেকে নবীজী পর্যন্ত ইসলাম আগাগোড়া ধারাবাহিক অবিচ্ছিন্ন একই ধর্ম কারণ কোরাণ সব নবীদের হুবহু একই দায়িত্ব দিয়েছে সুস্পষ্ট ভাষায়। সেটা হল – সুসংবাদ দাতা ও ভীতিপ্রদর্শক। এমনকি হজ্বের মতো ফরজ ইবাদতের ক্ষেত্রেও আল্লাহ সুস্পষ্ট ভাষায় হজরত ইব্রাহীমকে বলেছেন "তোমার দায়িত্ব শুধু ঘোষণা করা, আমার দায়িত্ব দুনিয়াময় পৌছানো" বাংলা কোরাণ, মুহিউদ্দিন খান, পৃষ্ঠা ৮৯৯।

আমাদের নবীজীর এই একই দায়িত্ব দেখে নিন সৌদি আরব থেকে প্রকাশিত মওলানা মুহিউদ্দীনের কোরাণের বাংলা অনুবাদ থেকে। সেই সাথে আমরা এ'ও দেখব মওলানা মওদুদি তাঁর বিশাল কেতাব তাফহিমুল কুরাণে প্রতিটি আয়াত ধরে ধরে কোরাণের ব্যাখ্যা দিলেও এই অতি গুরুত্বপূর্ণ আয়াতগুলোর ব্যাপারে কি বলেছেন।

১। আল আনা'ম ৪৮। "সুসংবাদ দাতা ও ভীতিপ্রদর্শক ব্যতীত (অন্য কোন কাজে) আমি পয়গম্বর প্রেরণ করি না।" কোন মন্তব্য না করে মওলানা মওদুদি নিঃশব্দে পরের আয়াতে চলে গেছেন।

২। আল গাসিয়াহ ২১ ও ২২। "অতএব, আপনি উপদেশ দিন, আপনি তো কেবল একজন উপদেশ দাতা, আপনি তাহাদের শাসক নহেন।" কোন মন্তব্য না করে নিঃশব্দে মওদুদি পরের আয়াতে চলে গেছেন।

৩। ইউনুস ১০৮। "বলিয়া দাও, হে মানবকুল, সত্য তোমাদের নিকট পৌছাইয়া গিয়াছে তোমাদের পরওয়ারদিগারের তরফ হইতে। এখন যে কেহ পথে আসে সে পথ প্রাপ্ত হয় স্বীয় মঙ্গলের জন্য। আর যে বিভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরিতে থাকে সে স্বীয় অমঙ্গলের জন্য বিভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরিতে থাকিবে। অনন্তর আমি তোমাদের উপর অধিকারী নহি।" কোন মন্তব্য না করে মওদুদি নিঃশব্দে পরের আয়াতে চলে গেছেন।

৪। আল্-মায়েদাহ্ ৯২ এবং ৯৯। "কিন্তু যদি তোমরা বিমুখ হও, তবে জানিয়া রাখ, আমার রসুলের দায়িত্ব প্রকাশ্য প্রচার ছাড়া কিছু নহে" ... "রসুলের দায়িত্ব শুধু পৌছাইয়া দেওয়া।" কোন মন্তব্য না করে মওদুদি নিঃশব্দে পরের আয়াতে চলে গেছেন।

৫। নাহল ৩৫। "রসুলের দায়িত্ব তো শুধুমাত্র সুস্পষ্ট বাণী পৌছিয়ে দেয়া।" কোন মন্তব্য না করে মওদুদি নিঃশব্দে পরের আয়াতে চলে গেছেন।

৬। আশ শুরা ৪৮। "যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে আপনাকে আমি তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি। আপনার কর্তব্য কেবল প্রচার করা।" কোন মন্তব্য না করে মওদুদি নিঃশব্দে পরের আয়াতে চলে গেছেন।

৭। হিজর্ ৮৯। "বলুন, আমি প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শক।" কোন মন্তব্য না করে মওদুদি নিঃশব্দে পরের আয়াতে চলে গেছেন।

৮। আরাফ ১৮৪। "তিনি তো ভীতি প্রদর্শনকারী প্রকৃষ্টভাবে।" কোন মন্তব্য না করে মওদুদি নিঃশব্দে পরের আয়াতে চলে গেছেন।

৯। নাহল ৮২। "অতঃপর তাহারা যদি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, তবে আপনার কাজ হইল সুস্পষ্টভাবে পৌছাইয়া দেওয়া।" মওদুদি কিছুই না বলে পরের আয়াত ৮৩-এর ব্যাখ্যায় চলে গেছেন।

১০। কাহ্ফ ৫৬। "আমি রসুলদিগকে সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী রূপেই প্রেরণ করি।" মওদুদি বলেছেন – "বিচারের আগে আত্মসমর্পণের কল্যাণ ও অবাধ্যতার অকল্যাণ সম্বন্ধে লোকদিগকে আগে হইতে হুঁশিয়ার করার জন্য (forewarn) আমি আমার রসুলদিগকে প্রেরণ করি।"

১১। আল আহযাব ৪৫। "হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদ-দাতা এবং সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি।" লম্বা মারিফতি ব্যাখ্যা দিয়েছেন মওদুদি, কোন আইন-কানুন বা রাষ্ট্রের কথা নেই।

১২। আল আনাম ১০৭। "আমি আপনাকে তাহাদের সংরক্ষক করি নাই এবং আপনি তাহাদের কার্য্যনির্বাহী নহেন।" মওদুদি বলেন – "নবী (দঃ)-এর কাজ ছিল শুধুমাত্র সত্য প্রচার করা এবং মানুষকে ইহা গ্রহণে আহ্বান করা। ইহাতেই তাঁহার দায়িত্ব শেষ হইয়া যায় কারণ তিনি আর যাহা হৌক মানুষের শাসক (Warden) নহেন।" তাহলে ? ইসলামী রাষ্ট্রতত্ত্ব কি করে ইসলামী ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গ হল ?

১৩। কাহ্ফ ২৯। "বলুন, সত্য তোমাদের পালনকর্তা হইতে আগত। অতএব, যাহার ইচ্ছা বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যাহার ইচ্ছা অমান্য করুক।" মওদুদি লম্বা ব্যাখ্যা দিয়েছেন – কোন আইন-কানুন বা রাষ্ট্রের কথা বলেননি।

১৪। আল-আহ্ক্বাফ ৯। "বলুন,...আমি স্পষ্ট সতর্ককারী ব্যতীত আর কিছুই নহি।" মওদুদি বলেছেন – **"নবীজীর একমাত্র দায়িত্ব** হইল মানুষের সামনে সত্যপথ তুলিয়া ধরা ও যাহারা তাহা প্রত্যাখ্যান করে তাহাদিগকে সাবধান করা।" তাহলে? ইসলামী রাষ্ট্রতত্ব কি করে ইসলামী ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গ হলো ?

১৫। নিসা ৮০। "আর যে লোক বিমুখ হইল, আমি আপনাকে (হে মুহম্মদ! তাহাদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করি নাই।" মওদুদি বলেছেন – "নবীজীর **একমাত্র দায়িত্ব** হইল আল্লাহ্'র আদেশ-নির্দেশকে মানুষের কাছে পৌছাইয়া দেওয়া, মানুষকে সত্যপথে বাধ্য করা তাঁহার দায়িত্ব নহে।"

১৬। সুরা তওবা ৫১। "তিনি (আল্লাহ্) আমাদের কার্যনির্বাহক।" লম্বা ব্যাখ্যা দিয়েছেন মওদুদি – কিন্তু কোন আইন-কানুন বা রাষ্ট্রের কথা নেই।

১৭। বাকারা ১১৯। "নিশ্চয় আমি আপনাকে সত্য ধর্মসহ সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শনকারী রূপে পাঠিয়েছি।" মওদুদি এখানে স্থানীয় অমুসলিমদের দাবীর কথা টেনে এনেছেন, – সম্পূর্ণ অন্য বিষয়ে।

১৮। বাকারা ২৭২। "তাদেরকে সৎপথে আনার দায় তোমার নয়।" কথাটা তো

বলা হয়েছে স্বয়ং নবীজীকেই, সাধারণ মুসলমানদেরকে নয়। কিন্তু মওদুদি বলেন – "এই আয়াতের অর্থ হইল মুসলমানেরা অন্যদিগকে সত্য পথের নির্দেশ জোর করিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য করিবে না।" জোর করার কথাটা কোত্থেকে এল ?

১৯। নিসা ১৬৫। "সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শনকারী রসুলগণকে পাঠিয়েছি।" মওদুদি একই কথা বলেন।

২০। আনাম ৫২। "তাদের হিসাব বিন্দুমাত্র আপনার দায়িত্বে নয়।" মওদুদি একই কথা বলেন।

২১। আনাম ৬৬। "আপনি বলে দিন, আমি তোমাদের উপর নিয়োজিত নই।" মওদুদি বলেন – **"নবীর কর্তব্য হইল শুধুমাত্র সত্য হইতে মিথ্যাকে স্পষ্টভাবে পৃথক করিয়া ঘোষণা দেওয়া।"**

২২। রা'দ ৪০। "আপনার দায়িত্ব তো পৌঁছে দেয়া, আমার দায়িত্ব হিসাব নেয়া।" মওদুদি এখানে স্থানীয় অমুসলিমদের দাবীর কথা টেনে এনেছেন, যেটা সম্পূর্ণ অন্য বিষয়।

২৩। ছোয়াদ ৬৫। নবীজী বলছেন – "আমি একজন সতর্ককারী মাত্র।" **মওদুদি একই কথা বলে একে সমর্থন করেছেন।**

২৪। ছোয়াদ ৭০। নবীজী বলছেন – "আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।" **মওদুদি একই কথা বলে একে সমর্থন করেছেন।**

২৫। ফাতির ২৩ ও ২৪। "আপনি তো কেবল একজন সতর্ককারী। আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে।" মওদুদি বলেছেন – **"আপনার একমাত্র কর্তব্য হইল লোকসকলকে সতর্ক করা। ইহার পরে কেউ না বুঝিয়া বিপথগামী হইলে সেজন্য দায়ী নহেন কারণ অন্ধকে দেখাইবার বধিরকে শুনাইবার দায়িত্ব আপনাকে দেওয়া হয় নাই।"**

২৬। ফুরকান ৫৬। "আমি আপনাকে সুসংবাদ ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করেছি।" মওদুদি বলেছেন ঃ **"বাণী পৌঁছাইবার পর তাঁহার কর্তব্য ও দায়িত্ব শেষ হইয়া যায়, ইহার পর সবকিছু তোমাদের ও তাঁহার (আল্লাহ'র – লেখক) মধ্যেকার বিষয়।"**

২৭। বাকারা ২৫৩-এর ব্যাখ্যাতে তিনি বলেছেন ঃ **"মানুষকে জোর করিয়া বিশ্বাসী ও অনুগত করিবার জন্য আল্লাহ নবী-রসুলকে পুলিশ করিয়া পাঠান নাই। বরং তিনি তাঁহাদিগকে পাঠাইয়াছেন মানুষকে যুক্তিসঙ্গত কথা ও সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়া সঠিক পথে আনিতে।"**

অর্থাৎ মওদুদির মত নেতাও এই অতি গুরুত্বপূর্ণ আয়াতগুলোকে হয় নিঃশব্দে পাশ কাটিয়ে চলে গেছেন, অথবা সমর্থন করতে বাধ্য হয়েছেন, নয়ত এমন ব্যাখ্যা করেছেন যা বিষয়ের সাথে মেলে না – কিন্তু বিরোধীতা কোথাও করতে পারেননি। হজরত নূহ, হজরত হুদ, হজরত সালেহ ও হজরত শোয়েব-এর প্রতি এই একই দায়িত্ব দেখে নিন সুরা আল আরাফ, আয়াত ৬১, ৬২, ৬৭, ৬৮, ৭৯ ও ৯৩ থেকে। এঁরা কেউ কোন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেননি। হজরত সুলায়মান (আঃ) বংশগতভাবে নবী ছিলেন, হজরত ইউসুফ (আঃ)-কে মিশরের রাজা সিংহাসন দিয়েছিলেন, এবং হজরত দাউদকে বনি ইসরাইলদের রাজা তালুত কন্যা ও রাজ্য দিয়েছিলেন (কাসাসুল আম্বিয়া ২য় খণ্ড)। বহু নবী ব্যাপকভাবে সমাজের বিচার-আচারও করেননি, যেমন হজরত ইয়াকুব (আঃ), হজরত জাকারিয়া (আঃ), হজরত ইউনুস (আঃ), হজরত ইয়াহিয়া (আঃ), হজরত লূত (আঃ), হজরত শোয়েব (আঃ), হজরত নূহ (আঃ), হজরত ঈসা (আঃ), ইত্যাদি। কিন্তু তাই বলে তাঁরা কি নবী ছিলেন না ? অবশ্যই ছিলেন।

এই হল সহজ সরল ইসলাম। অথচ তারপরেও মওদুদি বলেছেন ঃ "ইসলামের নীতি ও শিক্ষাভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন না করা পর্যন্ত আমাদের শাহাদা (কলমা পড়া) পূর্ণ হইবে না" – 'উইটনেস টু ম্যানকাইণ্ড' পৃষ্ঠা ৩২। কেন হইবে না ? তাঁর মতে না মিললে সে মুসলমানই নয় ? এর সাথে তাঁর নারী-বিরোধী শারিয়া আইনের প্রতি সমর্থন, দাসপ্রথা-সমর্থন (সুরা মুহম্মদ আয়াত ৪-এর ব্যাখ্যা), ভারতে হিন্দু-রাষ্ট্রের প্রতি সমর্থন (মুনির কমিশন রিপোর্ট) ও বন্দিনী-ধর্ষণের প্রতি সমর্থন যোগ করলে আমরা শারিয়া-রাষ্ট্রের ভয়ঙ্কর চিত্র পাই। এতে বহু মওলানা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁর বিরোধীতা করেছেন ও তাঁকে কাফের ও দজ্জালও বলেছেন। আপনারা ভারত-বিখ্যাত মওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নাদভী (লক্ষ্ণৌ শহরের) লিখিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ বই "আছর-ই হাজির মে দ্বীন কি তাহফিম-ও-তাশরিহ" (বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মের উপলব্ধি ও ব্যাখ্যা) বইটা দেখতে পারেন। মওদুদির প্রতি তাঁদের আলোচনার প্রস্তাবে মওদুদি কখনো রাজি হননি।

এখানে একটা অত্যন্ত দরকারি কথা এসে যায়। "ইসলামি বিশেষজ্ঞ" আমরা কাকে বলব ? বহু কেতাব পড়লেই কি তা হওয়া যায় ? অনেকের স্মরণশক্তি খুব ভালো, তাঁরা বহু কেতাবের বহু কিছু মনে রাখতেও পারেন, গড়গড় করে বলতেও পারেন। অনেকে অনেক ইসলামি ডিগ্রীও হাসিল করতে পারেন। কিন্তু ওগুলো হলেই কি ইসলামি বিশেষজ্ঞ হওয়া যায় ? মোটেই নয়। যেমন, যারা আণবিক শক্তি দিয়ে ভয়াবহ ধ্বংসকারী বোমা আবিষ্কার করেছে তারা কি বৈজ্ঞানিক ? মোটেই নয়। বরং বৈজ্ঞানিক তাঁরাই যাঁরা আণবিক শক্তি দিয়ে ইলেক্ট্রিসিটি, বন্যা-নিরোধক বাঁধ, ওষুধ, পরিবেশ-রক্ষাকারী মেশিন ইত্যাদি আবিষ্কার করে মানুষের কল্যাণ করেন। যারা অর্থনীতির বিশ্ব-পুঁজিবাদ আবিষ্কার করে মানুষকে শোষণ করে কষ্ট বাড়ায় তারা কি অর্থনীতিবিদ ? মোটেই নয়। অর্থনীতিবিদ তাঁরাই যাঁরা বহু পড়াশুনা

করে পরিশ্রম করে মানব-কল্যাণের উপযোগী অর্থনৈতিক পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। ধর্মের ক্ষেত্রেও এ-কথা সত্যি। ইসলামি বিশেষজ্ঞ শুধুমাত্র তাঁরাই যাঁরা প্রচুর পড়াশুনা করে মেধা দিয়ে ইসলাম থেকে মানুষের মঙ্গল তুলে আনেন। যার ধর্মব্যাখ্যায় মানুষের মঙ্গল না হয়ে কষ্ট বেড়ে যায় সে ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ তো দূরের কথা বরং ধর্মের শত্রু, তা সে যতই বিখ্যাত হোক, যতই পড়ুক-লিখুক বা যত ডিগ্রিই থাকুক।

অর্থাৎ আমরা দেখলাম শারিয়া-ইসলামের প্রধান প্রবক্তাদের শীর্ষস্থানীয় নেতা মওলানা মওদুদি পর্যন্ত বারবার স্বীকার করেছেন নবীদের দায়িত্ব হল শুধুমাত্র প্রচার করা।

পয়গম্বর কথাটাই তো এসেছে পয়গাম অর্থাৎ সংবাদ শব্দ থেকে। নবীজী কি কখনো বলেছিলেন 'আমি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই' বা 'আমি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম প্রচার করতে চাই ?' খেয়াল করুন, খেয়াল করুন, আছে কোন দলিল ? নেই। বিদায় হজ্বে তাঁর শেষ বক্তৃতায়ও নেই, মৃত্যুশয্যায় শেষ বৃহস্পতিবারে দেয়া (তিনি সোমবারে দেহত্যাগ করেন) তাঁর তিনটে সর্বশেষ নির্দেশেও নেই।

আমাদের বুঝতে হবে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা নবীদের নবীত্বের কোন শর্তই নয়। ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠিত হোক বা না হোক, আমাদের নবীজী কখনোই অর্ধেক বা এক চতুর্থাংশ নবী ছিলেন না। পরিপূর্ণ নবী তিনি হেরা পর্বতে প্রথম ওহি নাজিলের মুহূর্তে একা, তারপর মুসলিম সমাজ-ব্যবস্থা ছাড়াই মক্কায় অত্যাচারিত হবার তেরো বছর, তায়েফে ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত সময়ে একা, মদীনায় মুসলিম সমাজ কায়েম করে সমাজ চালানোর সময়, ১৯২৪ সালে মুসলিম খেলাফত ভেঙ্গে যাবার পরে এখনও। এবং তিনি পরিপূর্ণ নবী চিরকাল, ওটাই তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়। এমনকি "আদমের দেহে আত্মা সঞ্চারের পূর্বেই আমি নবী ছিলাম" (পৃষ্ঠা ১৮৪ বাংলা কোরাণ মওলানা মুহিউদ্দিন)। তাহলে সামাজিক শাসন কিংবা বিচার-আচার কেন তাঁর নবীত্বের কিংবা ইসলামের ধর্মবিশ্বাসের শর্ত হবে ?

নবীজী এ-ও বলেছেন, "কোন সমস্যা সমাধানে তোমরা দুইজন ঐকমত্যে পৌঁছিলে আমি উহাতে মতানৈক্য করিব না" (বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ৩য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৮১৫)। "রসুলুল্লাহ (স) তাঁহার সাহাবীগণের সহিত যত অধিক পরামর্শ করিতেন অপর কাহাকেও তাহার তুলনায় অধিক পরামর্শ করিতে দেখি নাই" (২য় খণ্ডের ২৪১ পৃষ্ঠা)। নবীজী প্রায়ই বলতেন, "আমাকে পরামর্শ দাও। কারণ যে-সব বিষয়ে আমার উপর ওহী নাজিল হয় নাই সে-সব বিষয়ে আমি তোমাদের মতই" (ঐ – পৃষ্ঠা ২৪১)। এতগুলো তথ্য এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত করে যে, দেশ চালানোর পদ্ধতি ইসলামি ধর্মবিশ্বাসের অংশ নয় কারণ নবী-রসুলগণ সাধারণ মানুষের সাথে পরামর্শ করে ধর্ম ঠিক করেন না। অথচ নবীজীর প্রতিটি ব্যক্তিগত কাজ-কর্মকে সুন্নতের নামে ইসলামি ধর্ম-বিশ্বাসের অঙ্গ বলে বিশ্ব-মুসলিমকে বিশ্বাস করানো হয়েছে। এতে তাঁর হাঁচি-কাশি, উটে চড়া, স্ত্রীকে ঘাড়ে চড়িয়ে খেলা দেখানো, যুদ্ধ করা, হাজারো হাসি-ঠাট্টা, পঙ্গপাল খাওয়া ও উটের মূত্র-পানের নির্দেশ পর্যন্ত সবকিছু ইসলামি ধর্ম-বিশ্বাসের অঙ্গ হয়ে বসে আছে।

আইন ও রাষ্ট্র যদি ইসলামি ধর্ম-বিশ্বাসের অঙ্গ হত তবে আমাদের হাদিস ও শারিয়া ইমামেরা রাজনীতি করতেন, ইসলামি রাজপ্রাসাদে যোগ দিতেন। কিন্তু রাজাদের অনুরোধ ও চাপের পরও তাঁরা প্রত্যেকে রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে শতহস্ত দূরে থেকেছেন। এ-ব্যাপারে পরে আলোচনা করা হল। এবার সেই শান্তি-কপোতগুলোর দিকে তাকানো যাক, যাঁরা এই বাংলার মাটিতেই যুদ্ধ করেছিলেন, জিতেছিলেন, এবং শতকরা একশ'জন অমুসলমানের মধ্যে বসবাস করে শুধু শান্তি বাণী দিয়েই শতকরা ষাট-সত্তরজনকে মুসলমান বানিয়ে ছেড়েছিলেন। তাঁদের অনেকেই ছিলেন দুর্মুখ যোদ্ধা। অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে জনগণের নালিশের পরিপ্রেক্ষিতে লড়াইয়ে বিজয়ী হয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই। বিজয়ী হবার পরে অবশ্যই তাঁরা রাজা হয়ে বসে ইসলাম প্রচার করতে পারতেন। রাষ্ট্র-ক্ষমতায় বসলে ধর্ম-প্রচারে তাঁদের সবদিক দিয়ে অনেক সুবিধেই হত। কিন্তু তবু তাঁরা সুযোগ পেয়েও কখনোই রাষ্ট্র-ক্ষমতা হাতে তুলে নেননি, সারাজীবন ধরে জনগণের মধ্যে বসেই জীবনপাত করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। কেন ? কারণ তাঁরা ঠিকই বুঝেছিলেন, ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতার সাথে রাষ্ট্র-ক্ষমতার সাঙ্ঘাতিক একটা মৌলিক বিরোধ আছে। নামের আগে হজরত পড়ে নেবেন, মাত্র কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি।

১। শাহ জালাল – পরাজিত করেছিলেন – গৌর গোবিন্দকে – সিলেট।
২। শাহ মাহমুদ – পরাজিত করেছিলেন – বিক্রমকেশরীকে – ?
৩। জাফর খাঁ গাজী – পরাজিত করেছিলেন – মান-নৃপতিকে – দিনাজপুর।
৪। পীর বদরুদ্দীন – পরাজিত করেছিলেন – রাজা মহেশকে – দিনাজপুর।
৫। শাহ বদরুদ্দীন – পরাজিত করেছিলেন – মগ দস্যুদের – চট্টগ্রাম।
৬। সুলতান বলখী – পরাজিত করেছিলেন – রাজা বলরামকে – হরিরামপুর।
সুলতান বলখী – পরাজিত করেছিলেন – পরশুরামকে – বগুড়া।
৭। কাত্তাল পীর – পরাজিত করেছিলেন – মগ দস্যুদের – চট্টগ্রাম।
৮। বড়খাঁ গাজী – পরাজিত করেছিলেন – মুকুট রায়কে – যশোহর।
৯। শাহ নেকমর্দান – পরাজিত করেছিলেন – ভীমরাজকে – দিনাজপুর।

এঁদের মধ্যে কে রাজা হয়ে বসেছিলেন ? কেউ না, এ-ক-জ-ন-ও না। রাষ্ট্রের গদিতে বসা-ই যদি ইসলাম প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় হয় তাহলে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ ইন্দোনেশিয়াতে কে রাজনীতির ষড়যন্ত্র করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছে ? কোন্ সে খ্রীষ্টান রাজ্যের মহাসম্রাট হয়ে সুউচ্চ তখ্‌তে বসেছিলেন যীশুখ্রীষ্ট ? কোন্ সে ইহুদী রাজ্যের মহাসম্রাট হয়ে সুউচ্চ তখ্‌তে বসেছিলেন হজরত মুসা ? কোন্ সে বৌদ্ধ-সাম্রাজ্যের মহাসম্রাট হিসেবে সুউচ্চ সিংহাসনে বসেছিলেন গৌতম বুদ্ধ ? কোন্ সে শিখ-সাম্রাজ্যের স্বর্ণসিংহাসনে বসেছিলেন গুরু নানক ?

কেন, দুনিয়া জুড়ে প্রতিষ্ঠা হয়নি ইহুদী-খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধ ধর্ম ? প্রতিষ্ঠিত হয়নি শিখ ধর্ম ? আমাদের বাংলায় কে এসে রাজত্ব করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছে ? শুধু বাংলা কেন, মাত্র একটা উদাহরণ দেখান পৃথিবীর ইতিহাস থেকে যেখানে কোন ধর্ম-প্রচারককে শুধু ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য সিংহাসনে বসতে হয়েছে। দেখাতে পারবেন না, কোন ধর্ম-প্রচারকই তা করেননি। ইতিহাসের শিক্ষা বরং তার উল্টো। সুবিশাল ভারতবর্ষের পরাক্রমশালী বাদশাহ আকবরের দ্বীন-এ-এলাহী উড়ে গেছে কালের হাওয়ায়, কিন্তু গ্রামের পথে পথে খালি পায়ে ঘোরা শ্রী চৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম ঠিকই টিকে আছে, টিকে আছে পাবনার অনুকূল ঠাকুরের এত ছোট সৎসঙ্গ ধর্মও। জমিদারের ছেলে গৌতম বুদ্ধ আর মহাবীর রাজপ্রাসাদ ছেড়ে পথে নেমেছিলেন বলেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম।

আমেরিকার ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ষিয়ান ইসলামি বিশেষজ্ঞ ডঃ আবদুল আজিয সাচেদিনার মধ্যে হয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষার রাখিবন্ধন। তাঁকে আমি চিঠিতে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ইসলামি রাষ্ট্র ইসলামের ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গ কি না। জবাবে তিনি লিখেছেন ঃ

প্রিয় হাসান,
সালাম। না, ইসলামি "রাষ্ট্র"-এর তত্ত্ব ইসলামি ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গ নয়। ইমানের দাবি হল, জনগণের জন্য ন্যায় ও সাম্যের জন্য কাজ করা। দারুল ইসলাম ও দারুল হর্ব-এর তত্ত্ব আমরা জানি। এ-দু'টোর কোনটাই কোরাণ-হাদিসে নেই, এগুলো ফিক্হ্-এর অংশ। তাক্ওয়া নিয়ে বাঁচা এবং পৃথিবীর যে কোন জায়গায় ন্যায়বিচারের জন্য কাজ করাই হল ইসলাম। — আ. এস.। এই একই কথা বলেছেন অতীত-বর্তমানের শত শত ইসলামি বিশেষজ্ঞও ।

ইসলাম কি তা আমরা কোরাণ-রসুল থেকে পেয়েছি। এখন দেখা যাক কে মুসলমান। আজকাল বহু ইসলামি নেতার মুখে শোনা যায় এ কাফের ও কাফের। আপনি যে-ই হোন না কেন কোনো না কোনো মওলানার মতে আপনি কাফের হবেনই। এই মওলানারা বোঝেন না যে তিনি অন্য মুসলমানকে কাফের বলছেন, তাঁকে কাফের বলারও মওলানা আছে। তাঁদের বোঝা দরকার মুসলমান হওয়াটা জীবনে বিশাল ব্যাপার। নিজের ব্যাপারে এই বিশাল ব্যাপারের সিদ্ধান্ত নিজেকেই নিতে হয়, সে অধিকার কোনো মানুষের হাতে দেয়া যায় না কারণ মানুষ ভ্রান্তিময়। যে ভ্রান্তিময় আমরা আজ মরলে কাল আমাদের শরীর মাটির নীচে পোকায় খাবে সেই আমাদের এই স্পর্ধা শোভা যায় না। সে-জন্যই কোরাণ-রসুল কঠিনভাবে সে অধিকার আমাদের হাতে তুলে নিতে নিষেধ করেছেন। সুরা নিসা আয়াত ৯৪-তে কোরাণ সুস্পষ্ট ঘোষণা করেছে, যে ইসলামী পদ্ধতিতে সালাম দেবে তাকে কেউ যেন অমুসলিম না বলে। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কি সুন্দর কি কার্যকর নির্দেশ সেটা যা শারিয়াপন্থীরা বিভিন্ন ব্যাখ্যার

প্যাঁচ ক'ষে লঙ্ঘন করেন। কিন্তু সে-নির্দেশ আমাদের হজরত শাহ্ জালাল শাহ্ মখদুমের দল পদে পদে মেনে চলেছেন। বাংলার হাজার বছরে কোথাও একটা উদাহরণ নেই তাঁরা কাউকে কাফের বলে গালি দিয়েছেন। অথচ রাজনৈতিক মওলানারা ঐ আয়াতটার পটভূমির বাহানায় ওটাকে চিরন্তন না বলে তাৎক্ষণিক বলার চেষ্টা করেন। কিন্তু কোরাণের ক'টা নির্দেশ শাশ্বত ? দাস-প্রথা, বহুবিবাহ, নারীর অর্ধেক উত্তরাধিকার, অর্ধেক সাক্ষ্যের মতো বহু নির্দেশই তো তাৎক্ষণিক ! তাঁরা ওগুলো শাশ্বত করেছেন কারণ ওতে নারী-নিপীড়ন করা যায়, পুরুষতন্ত্রের স্বার্থরক্ষা হয়।

কে মুসলিম তা আমরা কোরাণ থেকে পেলাম। এ-ব্যাপারে রসুল কি বলেছেন ? কি করেছেন ? পড়ে দেখুন 'কে মুরতাদ' অধ্যায়ে। সেই সাথে খুলে দেখুন মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ মুহসিন খানের অনুদিত সহি বুখারি ৪র্থ খণ্ড, হাদিস ২৯৩ ও ২৯৪। সাহাবীদের প্রতি নবীজীর স্পষ্ট নির্দেশ—উদ্ধৃতি দিচ্ছি—"**যাহারা নিজদিগকে মুসলমান বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে** তাহাদের তালিকা বানাও।" সাহাবীরা তা বানিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই দু'একজন হলেও মুনাফেক ছিল যারা ইসলাম-বিরোধীতা করার জন্যই প্রকাশ্যে মুসলমানিত্ব ঘোষণা করতো। এমন উদাহরণ ইতিহাসে আছে। নবীজী সেটা জানতেন না তা হতেই পারে না। কিন্তু তিনি কোনো প্রশ্ন না ক'রে তালিকার প্রত্যেকের মুসলমানিত্ব গ্রহণ করেছিলেন, কাউকেই বলেননি তার দাবী মিথ্যা, সে মুসলমান নয়। মানবচরিত্র তাঁর জানা ছিল, তিনি জানতেন তিনি যদি ঘোষণার পরেও কারো মুসলমানিত্ব অস্বীকার করেন তবে তার সুযোগ নিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত নষ্ট মানুষেরা অন্য মুসলমানদের অমুসলিম বলবে, কাফের-মুরতাদ বলবে। তাঁর সেই দিব্যদৃষ্টি ব্যর্থ করেছি আমরা পরস্পরকে 'কাফের' বলেছি। ইমাম হানিফা, শাফি, মালিক, হানবল সহ আমাদের ইমাম, দার্শনিক বৈজ্ঞানিক, যাঁদের নিয়ে আমরা গর্ব করি, তাঁদের প্রায় প্রত্যেকে ঐ ইসলাম-বিরোধী আঘাতের শিকার হয়েছেন। তাঁদের বলা হয়েছে তুমি মুসলমান নও, গালাগালি থেকে দেশান্তর, এমনকি হত্যাও করা হয়েছে। এভাবেই রসুলের আলোকিত উদাহরণ না মেনে আমরা নিজের পায়ে কুড়ুল মেরেছি, নিজেদের শক্তিক্ষয় করেছি। হতে পারে অনেকে ইসলামের অনেক কিছুই পালন করে না কিংবা যেভাবে পালন করে তা অন্যের সাথে মেলে না কিন্তু মূল ঈমানটা তো আছে। কাজেই কে মুসলিম কে নয় সেই গুরুভার বিচার করার মালিক আছেন মাথার ওপরে, ভ্রান্তিময় মানুষ সেই গুরু দায়িত্ব হাতে তুলে নেবার ক্ষমতা রাখে না ॥

শারিয়া-ইসলাম

রাজনৈতিক ইসলাম বা শারিয়া-ইসলামে বিশ্বাসীরা শারিয়া-ভিত্তিক ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চান এবং এটাকে ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ মনে করেন। এঁরা রাষ্ট্র বানিয়ে দুনিয়ার সব মুসলমানের ওপরে নিজেদের ব্যাখ্যা চাপিয়ে দিতে চান এবং সেই ব্যাখ্যার বাইরে সবাইকে অমুসলমান বলেন। প্রমাণ হল ঃ – "এই সভ্যতা-সংস্কৃতির মূলনীতির উপর (অর্থাৎ ইসলাম সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যার ওপরে – *লেখক*) যাহারা ইমান রাখে শুধু তাহাদিগকে বলে মুসলমান" (মওলানা মওদুদি, ১৯৩৮ সালে বানানো দারুল ইসলাম-এর গঠনতন্ত্র)। এ-কারণেই বাংলাদেশ জামাতে ইসলামির নেতা মতিউর রহমান নিজামী দাবী করতে পেরেছেন যে জামাতের বিরুদ্ধে কথা বলা নাকি খোদ ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র (দ্য ডেইলি স্টার, ১লা এপ্রিল ২০০৫)। এটা একটা সাজ্ঘাতিক ইসলাম-বিরোধী অপরাধ। ইসলামের মালিকানা হাতানোর এই অপচেষ্টা চোদ্দশ' বছরের পুরোন এবং সরাসরি কোরাণ-বিরোধী। আমি মওলানা মওদুদির ব্যক্তিগত সমালোচনা করব না কিন্তু শারিয়া-ইসলাম বুঝতে হলে তাঁর ব্যাখ্যাগুলো দেখতেই হবে। কারণ ১৯২২-১৯২৮ সালে মিশরের হাসান বান্না ও তার পরে সায়িদ কুতুবের পর আধুনিক কালে তিনিই প্রথম শারিয়া-ভিত্তিক ইসলামি রাষ্ট্রের তত্ত্বকে দৃশ্যগ্রাহ্য ও আপাত গ্রহণযোগ্য কাঠামো দান করেন। সেই রাষ্ট্রের রূপরেখা বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন আমার বাংলা ওয়েব সাইট BanglarIslam.com ; এখানে সংক্ষেপে বলছি তাঁর (১) জিহাদ ইন ইসলাম, (২) হিউম্যান রাইট্স্ ইন ইসলাম, (৩) ইসলামিক ল' অ্যাণ্ড কন্স্টিটিউশন, (৪) এ শর্ট হিস্ট্রি অফ দ্য রিভাইভালিস্ট মুভমেন্ট ইন ইসলাম, (৫) দ্য প্রসেস অফ ইসলামি রেভল্যুশন, (৬) দি ইসলামিক মুভমেন্ট, (৭) ডায়নামিক্স

অফ ভ্যালুজ্, পাওয়ার অ্যাণ্ড চেঞ্জ, (৮) কল্ টু জিহাদ, (৯) মে ১০, ১৯৪৭ তারিখে পাঠানকোটে দেয়া বক্তৃতা ইত্যাদির বিভিন্ন পৃষ্ঠা থেকে। এগুলো বিচ্ছিন্ন উদ্ধৃতি নয়, এই কথাগুলোতে ফুটে উঠেছে শারিয়া-ইসলামের মূল চেহারা, চরিত্র ও পরিকল্পনা।

"ইসলামি নয় এমন সরকারের কর্তৃত্বের আওতায় মুসলমানের পক্ষে ইসলামি জীবন যাপন অসম্ভব ... একজন মুসলমান যতক্ষণ মুক্ত থাকে ততক্ষণই ইসলামি জীবন যাপন করিতে পারে। প্রথমেই একটি সার্বভৌম ইসলামি রাষ্ট্র প্রয়োজন, যাহাতে তাহারা ইসলামি আইন প্রয়োগ ও নিজেদের জীবনকে স্রষ্টার আদেশ অনুযায়ী পালন করিতে পারে ... যদিও ইসলামি রাষ্ট্র পৃথিবীর যে কোন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে, কিন্তু মানবাধিকার ও সুবিধাগুলিকে ইসলাম শুধু ইহার সীমানার ভিতরেই সীমাবদ্ধ রাখিতে রাজি নহে , 'পার্টি' শব্দটার জন্য কোরাণ যে শব্দ ব্যবহার করিয়াছে তাহা হইল 'উম্মা' ... জামাত আসলে কোন মিশনারী নহে, ইহা হইল আল্লার কাজ করার 'পার্টি' ... ইসলাম দেশ-জাতি নির্বিশেষে ইসলামের দর্শন ও কর্মপদ্ধতির পরিপন্থী সকল রাষ্ট্র ও সরকারকে পৃথিবী হইতে ধ্বংস করিতে চায় ... মুসলিম পার্টি অবশ্যই অন্য দেশের লোকদের প্রতি ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাইবে। ইহা ছাড়াও যদি মুসলিম পার্টির হাতে যথেষ্ট শক্তি থাকে তবে সে (দুনিয়ার) অমুসলিম সরকারগুলিকে উচ্ছেদ করিবে এবং সেস্থলে ইসলামি সরকার স্থাপন করিবে ... নবীজী ইসলাম গ্রহণের জন্য আশেপাশের দেশগুলিতে আমন্ত্রণ পাঠান। যখন ওই দেশগুলির শাসকগণ এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল, নবীজী তখন তাহাদের বিরুদ্ধে সামরিক আক্রমণের ব্যবস্থা করিলেন ... ইসলামি জিহাদ রাষ্ট্র-পরিচালনায় অমুসলিমদের অধিকারকে স্বীকার করে না ... এই লোকগুলি (অর্থাৎ শারিয়াপন্থীরা) যাহারা ধর্মের বিস্তারকারী, তাহারা ধর্ম-প্রচারকারী বা মিশনারি নহে। তাহারা বরং আল্লাহ্'র কার্যনির্বাহী (functionaries)। তাহাদের দায়িত্ব হইল শক্তির দ্বারা দুনিয়া হইতে অত্যাচার, নষ্টামি, সজ্ঘর্ষ, অনৈতিকতা, স্বৈরাচারী এবং শোষণ উচ্ছেদ করা ... রাজনৈতিক দর্শনের দৃষ্টিতে ইসলাম (ধর্মীয় স্বৈরতন্ত্র theocracy হিসেবে) ধর্মনিরপেক্ষ পশ্চিমা গণতন্ত্রের বিরোধী তত্ত্ব ... জিম্মিরা (অমুসলিম নাগরিকরা) দেশরক্ষা বাহিনীতে যোগ দিতে পারিবে না ... ইসলামি সরকারে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের বিশেষ কোন জায়গা নাই ... নাচ, গান এবং চিত্রাঙ্কন চরম অনৈসলামিক ও কুৎসিত শিল্প ... শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ বলিয়াছেন যে পরিস্থিতি চাহিলে তিনি অস্ত্র দ্বারা সমাজ পরিবর্তন করিবেন ... মানুষ যে একটি স্বাধীন সত্ত্বা এবং তাহার ইচ্ছা এবং চিন্তাশক্তি অনুযায়ী স্বাধীনভাবে চলিতে সক্ষম, ইহা মূর্খের অভিমত মাত্র ... এই লক্ষ্য (সামাজিক মূল্যবোধ) ততদিন অর্জিত হইবে না যতদিন সমাজের ক্ষমতা অবিশ্বাসী শাসকের হাতে থাকিবে, অথবা যতদিন ইসলামের অনুসারীরা আরাধনার আনুষ্ঠানিকতায় আবদ্ধ থাকিবেন যেইগুলি ওই (অবিশ্বাসী) শাসকদের ইচ্ছামাফিক অনুমোদন ও

সমর্থনের উপর নির্ভরশীল ... ন্যায়পরায়ণ লোকের হাতে (রাষ্ট্র)-ক্ষমতা অর্জন এতই গুরুত্বপূর্ণ যে এই কর্তব্যে অবহেলা করিয়া আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার কোনই উপায় নাই ... তিন-তাগুত (বাতিল) হইল (১) ধর্মনিরপেক্ষতা, কারণ উহা ধর্মহীনতা, (২) আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ, এবং (৩) (পশ্চিমা) গণতন্ত্র – পরের দুইটি শির্‌ক্ ... এই সরকারের কার্যপ্রণালী এমন যে ইহাতে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের বিশেষ অবকাশ নাই ... রাজনৈতিক দর্শনের দৃষ্টিতে ইসলাম পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী। ইসলামে পশ্চিমা গণতন্ত্রের লেশমাত্র নাই ..." ইত্যাদি।

অনেক ইসলামি দার্শনিকের চোখে তাঁর দর্শনের ভিত্তিহীনতা, অন্তর্নিহিত দুর্বলতা, অমানবিকতা এবং ভবিষ্যতের ভয়াবহ সর্বনাশা কুফল ঠিকই ধরা পড়েছিল। আধ্যাত্মিকতার সাথে রাজনীতির মিশ্রণে এ ক্ষতি যে শুধু মুসলমানদেরই নয় বরং সমস্ত মানবজাতির, সেটাও তাঁরা বুঝেছিলেন এবং তাঁরা সেটা বলেছিলেনও। সে কথাগুলো জনগণের কানে পৌঁছায়নি তার একটা প্রধান কারণ হল তাঁদের কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। এদিকে মওলানা মওদুদি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে ১৯৪১ সালে জামায়াত-এ ইসলামি প্রতিষ্ঠা করেন। সৌদি বাদশাহ তাঁকে এক বিশেষ পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন। এতে তাঁর অনেক অনুসারী ক্ষুব্ধ হন এজন্যে যে, রাজত্ব ইসলামে নিষেধ হবার পরও নবীজীর খেলাফকারীর হাত থেকে মওদুদি কি করে এ পুরস্কার নিলেন। আসলে শারিয়া-ইসলাম সৌদি রাজত্বকে শক্তিশালী করে বলে সৌদি বাদশাহেরা শারিয়া-ইসলামে অজস্র টাকা ঢেলেছে। ফলে বিশ্বে শারিয়া-ইসলাম বিভিন্ন নামে ও চেহারায় বহুগুণে বেড়ে উঠেছে। আজ এই এত বছর পরেও শারিয়া-ইসলামকে ইসলামি দর্শনের ভিত্তিতে প্রতিহত করার তেমন কোন সংগঠন নেই। অথচ যে কোন দর্শনের অগ্রগতিতে পাল্টা, বিপ্রতীপ এবং সমান্তরাল সংগঠন দু'দলের জন্যই দরকার। এতে সবারই ভুল-ভ্রান্তি ধরা পড়ে এবং সার্বিক অগ্রগতিতে মানবসমাজের সুবিধে হয়। সে বিরোধিতার বাস্তব সুবিধে শারিয়া-ইসলাম বিশেষ পায়নি বা নেয়নি কোনদিনই।

ইসলামি রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা কিভাবে হবে, এবং তারপর কেউ মনে মনে মুরতাদ হয়ে গেলে ইসলামি রাষ্ট্রের কি হাল হবে এ নিয়ে মওদুদি মহা দুশ্চিন্তায় ছিলেন। অনেক ভেবেচিন্তে তিনি এই উদ্ভট ও হিংস্র সমাধান দিয়েছেন ঃ "ইসলামি বিপ্লবের পর জনগণকে নোটিস দেওয়া হইবে যাহারা বিশ্বাসে-কর্মে ইসলাম ছাড়িয়াছে ও সেভাবেই থাকিতে চায় তাহারা প্রকাশ্যে অমুসলিম পরিচিতি প্রকাশ করিয়া এক বছরের মধ্যে দেশত্যাগ করুক। তারপর যাহারা জন্মাইবে তাহারা হইবে মুসলিম। ইসলামি আইন প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে ধর্মীয় কাজকর্ম ও দায়িত্ব পালনে বাধ্য করা হইবে। তারপর কেউ ইসলাম ছাড়িয়া দিলে তাহাকে খুন করা হইবে" (দ্য পানিশমেণ্ট অব্ দি অ্যাপোস্টেট অ্যাকর্ডিং টু ইসলামিক ল')। এখন আপনারাই বলুন, কত উদগ্র ও নিষ্ঠুর হলে মানুষের ওপর এই ভয়াবহ অত্যাচারের প্রস্তাব করতে পারে কোনো নেতা ! কোটি কোটি লোক বাপ-দাদার ভিটেমাটি ছেড়ে ঘরবাড়ি ব্যবসাপাতে ছেড়ে বৌ-বাচ্চা নিয়ে কোথায় যাবে ? কেন যাবে ? কোন্ দেশ তাদের রেসিডেন্সী ভিসা দেবে ? কেনই বা দেবে ? এই হিংস্র অত্যাচারের দায়িত্ব শারিয়াপন্থীরা নেবেন ? এঁদের উদ্দেশ্য করেই কি কোরাণ-রসুল আদেশ দিয়েছেন — ধর্মে বাড়াবাড়ি করো না ? (নিসা ১৭১, মায়েদা ৭৭ ও বিদায় হজ্বের ভাষণ) ॥

ইসলামে নারী-অধিকার ও "সুস্পষ্ট নির্দেশ"

নারী-অধিকার ইসলামে কেন্দ্রীয় বিষয়। সে-অধিকার কমবেশি লঙ্ঘিত হয়েছে এটা শারিয়াপন্থীরাও স্বীকার করেন। তাঁরা বলেন শারিয়া আইনগুলো ঠিকই আছে, শুধু প্রয়োগটা ঠিকমতো হচ্ছে না বলেই যত সমস্যা। আমরা বলি শারিয়া আইনের মধ্যে এত বেশি সমস্যা আছে যে এটাকে সংশোধন করা সম্ভব নয়। তাঁদের ও আমাদের মধ্যে তফাৎ শুধু এটুকুই কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়। শেষ কথা হলো ইসলামের ভেতরে থেকেই নারী-অধিকার লঙ্ঘন থেকে বেরিয়ে আসার যে ইসলামি পদ্ধতি বিশেষজ্ঞরা দেখিয়েছেন তা জানা, জানানো ও সমাজে প্রতিষ্ঠা করা।

ইসলামে নারী-অধিকারের প্রধান বিষয়গুলো হলো ঃ (১) দাসী-প্রথা, (২) অনিয়ন্ত্রিত বহুবিবাহ, (৩) স্বামীর তাৎক্ষণিক তালাকের অধিকার, (৪) নারী-নেত্রীত্ব, (৫) বিয়ে-তালাকে সাক্ষ্যে উত্তরাধিকারে পুরুষের চেয়ে কম অধিকার, (৬) তালাকের পর ভরণপোষণ, (৭) তালাকের পর বাচ্চা পাবার অধিকার, (৮) নারীর বাধ্যতামূলক হিজাব, (৯) স্বামীর স্ত্রী-প্রহারের অধিকার ইত্যাদি। এগুলো নিয়ে মুসলিম-অমুসলিমে তো বটেই, মুসলিম-মুসলিমেও তর্ক-বিতর্কের শেষ নেই। তাঁরা একই বিষয়ে বিভিন্ন আলেমের বিভিন্ন মতামত যুগে যুগে দেশে দেশে বিভিন্ন আইনের রূপে প্রয়োগ করেছেন বলে ইসলামের হরেকরকম চেহারা ফুটে উঠেছে। এর মধ্যে আসল ইসলাম কোন্টা তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই দুনিয়ার মুসলিম-অমুসলিম সবাই বেজায় গোলকধাঁধায় পড়ে গেছে। হিজাবের কথাই ধরুন, এতেও মওলানাদের কতই না ভিন্নমত ঃ (১) দু'চোখে দু'টো জালের মতো ঘুলঘুলি রেখে আপাদমস্তক ঢাকা, (২) চেহারা খোলা রেখে আপাদমস্তক ঢাকা, (৩) শুধু মাথায় স্কার্ফ দিয়ে চুল ঢাকা, (৪) হিজাব মোটেই বাধ্যতামূলক নয়, ওটা সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রথা (আল্ আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলার

ডঃ তানতাওয়ি), (৫) হিজাব এসেছে ইরাণ-বিজয়ের পরে ইরাণের অভিজাত নারীদের সংস্কৃতি থেকে, ইত্যাদি। সবাই নিজের পক্ষে কোরাণ-হাদিস দেখান এবং সবাই অন্যকে ইসলাম-বিরোধী বলেন।

অনেক শারিয়া আইনে নারীরা নির্যাতিতা, অপমানিতা ও অসহায় বোধ করলেও কিছু বলেন না কারণ তাঁরা মনে করেন তাহলে ইসলামের বিরুদ্ধে যেতে হয়। কাজেই বিভিন্ন বাহানা বা যুক্তিতে নিজেদেরকে বুঝ দিয়ে তাঁরা এ-সব আইন মেনে নেবার চেষ্টা করেন। এটাই দেখা গেছে ২১ মে ২০০৮ (মুক্তিসন ৩৮) তারিখে দৈনিক ইনকিলাবে সুলতানা পারভীনের নিবন্ধে ঃ "সৃষ্টিকর্তা নারীকে পুরুষের উপর নির্ভরশীল করে সৃষ্টি করে তাকে দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছেন। এ-নির্ভরশীলতাকে মেনে নিতে কষ্ট হলেও এ-থেকে মুক্তির কোন উপায় নেই। যেমন মানুষ মরতে না চাইলেও মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তির কোন উপায় নেই। স্রষ্টার উপর সৃষ্টির যখন কোন হাত নেই তখন স্রষ্টার ইচ্ছা ও কাজকে খুশি মনে মেনে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। তাছাড়া সৃষ্টিজগতে প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপর নির্ভরশীল। শিশু তার পিতামাতার উপর, পিতামাতা সন্তানের উপর, রোগী তার ডাক্তার-নার্স এবং ওষুধের উপর, ক্রেতা বিক্রেতার উপর, বিক্রেতা ক্রেতার উপর, যাত্রী চালকের উপর, চালক যাত্রীর উপর, কৃষক জনগণের উপর, জনগণ কৃষকের উপর নির্ভরশীল। তাই পুরুষের স্বাধীনতা আর নারীর অধীনতাকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে না দেখে কার কি দায়িত্ব সেদিকে নজর দেয়া জরুরি।"

ভেবে দেখুন "এ-নির্ভরশীলতাকে মেনে নিতে কষ্ট হলেও এ-থেকে মুক্তির কোন উপায় নেই...পুরুষের স্বাধীনতা নারীর অধীনতা ... স্রষ্টার উপর সৃষ্টির কোন হাত নেই তখন স্রষ্টার ইচ্ছাকে খুশি মনে মেনে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ"– এ-বিশ্বাস নিয়ে কিন্তু সুলতানা পারভীনরা জন্মায়নি। এ-ধরনের মিষ্টি অপব্যাখ্যা দিয়ে নারীর কাছেই নারী-নির্যাতন বৈধ করা হয়েছিল হিন্দু ও ইহুদি ধর্মেও। তাঁরা জানেনও না এই বিশ্বাসে তাঁদেরকে বিশ্বাসী করে তোলার জন্য ছোটবেলা থেকেই ইসলামের এই বিশেষ ব্যাখ্যাকে দেখানো-পড়ানো হয়েছে, অন্য ব্যাখ্যাগুলোকে পড়ানো হয়নি। ফলে বন্দি নিজেই কারাগারকে পাহারা দিয়েছে, মনস্তত্ত্বে একে বলে স্টকহোম সিণ্ড্রোম। এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো অধীনতাই ইসলামে বৈধ নয় এটা উপলব্ধি করার ক্ষমতা তাঁদের কেড়ে নেয়া হয়। নাহলে তাঁরা দেখতে পেতেন পেশাগত নির্ভরশীলতা ও মানবাধিকারের নির্ভরশীলতা এক নয়। তাঁরা এ'ও দেখতে পেতেন তাঁর অসংখ্য সৃষ্টির কোন নারীকেই আল্লাহ্ পুরুষের ওপর নির্ভরশীল করে পয়দা করেননি, মানুষের তো নয়ই। বরং উল্টোটা আছে। কোন কোন প্রজাতির নারী অনেক বেশি ক্ষমতা ও মর্যাদাসম্পন্ন যেমন রাণী-মৌমাছি কিংবা রাণী-পিঁপড়ে। বহু প্রাচীন ও বর্তমান গোত্র নারী-প্রধান এবং তাতে তাদের কোনই সর্বনাশ হয়ে

যায়নি। যেহেতু সুলতানা পারভীনের নিবন্ধটা নারীর অর্ধেক উত্তরাধিকার নিয়ে তাই উত্তরাধিকারের পটভূমিতেই আমরা ইসলামে নারীর সার্বিক অধিকার আলোচনা করব।

জাতীয় নারী-উন্নয়ন নীতিমালা ২০০৮-এর অধীনে 'সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের সমান অধিকার' প্রস্তাব বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার অনুমোদন করেছেন ২৪শে ফেব্রুয়ারী ২০০৮। এই সুযোগে হঠাৎ আবার নরনারীর সমান উত্তরাধিকারের আইন পাশ হয়ে যায় কিনা সেই দুশ্চিন্তায় মহা-উদ্বিগ্ন শারিয়াপন্থী দলগুলো প্রবল প্রতিবাদে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, কেউ কেউ এমনও বলেছেন সরকার নাকি ইসলাম থেকেই খারিজ হয়ে গেছে। শারিয়াপন্থীদের যুক্তি হল নারীর অর্ধেক উত্তরাধিকার কোরাণের সুস্পষ্ট নির্দেশ – "একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর সমান"– নিসা ১১ ও ১৭৬।

কোরাণ-হাদিসের সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে অসংখ্য। এবারে চলুন আমরা তার কয়েকটা দেখি। এর কোন্‌টা তাঁরা চাইলেও মানতে পারবেন না এবং কোন্‌টা মানতে পারলেও ইচ্ছে করেই মানবেন না সেটা আমি তাঁদের ওপরেই ছেড়ে দিচ্ছি। বলা বাহুল্য, নিচের কিছু হাদিস আমরা সত্যি বলে মানি না, শুধু আপনাদের অবগতির জন্য দেখাচ্ছি।

- উটের মূত্র পান করা – সহি বোখারী ৮ম খণ্ড হাদিস নং ৭৯৭।
- "শনিবারে সীমা লঙ্ঘন করো না" – নাহল ১২৪, আল্ আরাফ ১৬৩, নিসা ১৫৪।
- কাফেরদের সাথে সন্ধি না করে ক্রমাগত সামরিক যুদ্ধে তাদের আঘাত করা – সুরা মুহাম্মদ ৪, ৩৫ ; আনফাল ১২ ; সুরা তওবা ২৯, ৭৩, ইত্যাদি।
- কাফেরদের জোড়ায় জোড়ায় কাটা – আনফাল ১২।
- গণিমতের মাল হিসেবে পরাজিত শত্রুদের সম্পত্তি ও নারী-শিশুরা বিজয়ী সৈন্যদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হবে – বহু হাদিস ও সুরা আনফাল ১, ৬৯, ইত্যাদি।
- নিষিদ্ধ মাস পার হলে যেখানেই পাওয়া যায় মুশরিকদের খুন করা যতক্ষণ তারা মুসলমান না হচ্ছে – তওবা ৫, ২৯, ইত্যাদি।
- সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করা – বাকারা ২১৭।
- দাসপ্রথা চালু করা ও বহু-দাসীর সাথে শোয়া (সর্বোচ্চ সৌদি শিক্ষাবিদ ডঃ ফওজান এ-প্রথাকে ইসলামি প্রথা বলেছেন) – মুমিনূন ৫, ৬ ; আহযাব ৫০, ইত্যাদি।
- প্রমাণ ছাড়াই স্ত্রীর ওপরে চরিত্রহীনতার অভিযোগ এনে তাৎক্ষণিক তালাক দেয়া – নূর ৬, ৭।
- যুদ্ধবন্দীদের ধর্ষণ করা – বোখারি ৩য় খণ্ড হাদিস ৭১৮ ও ৫ম খণ্ড হাদিস ৬৩৭ ও ৪৫৯ ; আবু দাউদ ২১৫০ ; মুসলিম ৩৪৩২।
- কাউকে ইসলামের শত্রু মনে হলে তাকে খুন করা ও খুন করার জন্য মিথ্যা কথা বলা – বোখারি ৫ম খণ্ড হাদিস ৩৬৯।
- হিন্দুদের সব মন্দির ধ্বংস করে জ্বালিয়ে দেয়া – বাংলা বোখারি – আবদুল জলিল, হাদিস ২৭০।
- চাকরি-ব্যবসা-ক্ষেতখামার সব বাদ দিয়ে "তলোয়ার দিয়ে জীবিকা নির্বাহ" করা – বোখারি ৪র্থ খণ্ড, অধ্যায় ৮৮, পৃঃ ১০৪।
- জুম্মার নামাজে না গেলে তার ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিতে চাই – বোখারি ১ম খণ্ড হাদিস ৬১৭।
- নবীজীর সাথে উঁচু গলায় কথা বলবে না – সুরা হুজরাত ২।

তাহলে আমরা দেখছি, কোরাণ-হাদিসের বহু 'সুনির্দিষ্ট বিধান' আমরা ইচ্ছে করলেও মানতে পারছি না। নবীজীর সাথে সামনাসামনি কথা বলা সম্ভব নয়। ক্রীতদাস-প্রথাকে কেউ আর ফিরিয়ে আনবে না। কোরাণে সুরা তওবা বা সুরা মুহম্মদ-এ অমুসলিম-হত্যার কথা স্পষ্ট লেখা থাকার পরও মওলানারা কথাটা বলেন ওগুলোর সুনির্দিষ্ট পটভূমি আছে যা এখন প্রযোজ্য নয়। কথাটা আসলেই সত্যি যেমন –"মুসলমানরা চিরকাল অমুসলমানকে ধরে মারবে-কাটবে" এ-কথা বলা পাগলামি ছাড়া কিছুই নয় – (বিশ্ববিখ্যাত শারিয়া-সমর্থক পণ্ডিত ডঃ জামাল বাদাওয়ি – টরন্টো শহরে বক্তৃতা)। কোরাণের "শনিবারের সীমা লঙ্ঘন করা" বা সম্মানিত মাস ও নিষিদ্ধ মাসও শুধুমাত্র যুদ্ধের ব্যাপারে আরবদের প্রাচীন সংস্কৃতি, এখন ওগুলো আর ইচ্ছে করলেও পালন করা সম্ভব নয়।

সুস্পষ্ট নির্দেশেরও স্থান-কাল-পাত্রের সীমাবদ্ধতা থাকে তাই নির্দেশ সুস্পষ্ট হলেও সেটা চিরকালের না'ও হতে পারে। ইমাম শাফি'ই তাঁর বিখ্যাত কেতাব রিসালা-তেও চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন কোরাণের বহু আয়াত বিভিন্ন মানুষের জন্য – পৃঃ ৩৫, ৯৭, ২০০, ইত্যাদি। বাংলাদেশ জামাত-এর তত্ত্বগুরু শাহ আবদুল হান্নানও লিখেছেন ঃ "জিজিয়ার বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট। ইহা কেবল বিশেষ পরিস্থিতিতেই প্রযোজ্য। যদি সেই পরিস্থিতি না থাকে তবে ইহা প্রয়োগের প্রয়োজন নাই। ইহা দাসপ্রথার মতোই। যেহেতু দাসপ্রথা নাই, তাই কোরাণ-সুন্নাহ-এ ইহার আইনগুলিও এখন প্রযোজ্য নহে" (খবর ইয়াহুগ্রুপ, ১লা মে, ২০০৮)। সামাজিক বিধানের নির্দিষ্ট পটভূমি অস্বীকার করে সেটাকে চিরকালের জন্য প্রয়োগ করলে আমরা কঠিন চোরাবালিতে ডুবে যাব। যদি কোন ইসলাম-বিদ্বেষী আপনাকে বলে বাকারা ২২৩ অত্যন্ত কুৎসিৎ আয়াত, তবে তার সামনে আপনি তুলে ধরবেন সহি আবু দাউদ হাদিস ২১৫৯। ওখানে আয়াতটার পটভূমিতে দেখানো আছে ওটা কুৎসিৎ তো নয়ই বরং প্রয়োজনীয়।

কোরাণে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে অমুসলিমদের কাছ থেকে জিজিয়া কর নেবার, চোরের হাত কেটে দেবার, আর আছে ইহুদি-খ্রীষ্টান নারীকে বিয়ে করার অনুমতি (সুরা মায়েদা, আয়াত ৫ ও ৩৮)। কিন্তু হজরত ওমর (রাঃ) বিভিন্ন কারণে কিছু বিশেষ ব্যক্তি এবং আল্ জুরাজিমাহ গোত্র ও ইরাণের এক গোত্রের কাছ থেকে জিজিয়া কর নেননি। আরো দেখুন মুহিউদ্দিন

খানের অনূদিত বাংলা-কোরাণ পৃষ্ঠা ৫৬৭। অন্যান্য সূত্রে আমরা দেখি এমনকি এক মুসলিম গোত্রের কাছ থেকেও তিনি জিজিয়া কর নিয়েছেন। সুরা তওবা আয়াত ৬০-এর ভিত্তিতে মুয়াল্লাফা গোত্র নবীজী (দঃ)-এর সময় থেকে যে জাকাত পেত সেটা, দুর্ভিক্ষের সময়ে চোরের হাত কাটা এবং বিশেষ ক্ষেত্রে ইহুদি-খ্রীষ্টান নারীকে বিয়ে করা তিনি বন্ধ করেছেন (প্রিন্সিপল্স্ অব্ ইসলামিক জুরিস্প্রুডেন্স – ডঃ হাশিম কামালী, পৃঃ ৩২৫)। অথচ এর প্রতিটিই কোরাণের সুস্পষ্ট নির্দেশ। শুধু কোরাণেই নয়, হাদিসেরও উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ – "আলী ইবনে আবু তালিব বলিয়াছেন ঃ মদ্যপানের জন্য আল্লাহ'র রসুল (সাঃ) এবং আবু বকর চল্লিশ বেত্রাঘাত দিয়াছেন এবং ওমরা তাহা আশি করেন" – সহি আবু দাউদ হাদিস নং ৪৪৬৬ – http://www.usc.edu/schools/college/crcc/engagement/resources/texts/muslim/hadith/abudawud/038.sat.html

খেয়াল করুন - "হজরত ওমর (রাঃ) বাকী সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে হাদিস ২০৩ বলবৎ করেন ও হাদিস ২০৪, ২০৫ ও ২০৬-কে রহিত করেন।" নবীজীর সময়ের তামাত্তু হজ্বের পদ্ধতিও তিনি বদল করেছেন। একটু খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে আপাতদৃষ্টিতে কোরাণের অক্ষর লঙ্ঘন করলেও তিনি অনুসরণ করেছেন কোরাণের মূল্যবোধ যা কোরাণ নিজেই এবং স্বয়ং নবীজী তাঁর সুন্নতে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। এই সুন্নত মেনে খলীফা মামুনও এক গীর্জা থেকে জিজিয়া কর নেননি (সূত্র সহি বুখারি ২য় খণ্ড হাদিস ৬৩৪ ও ৬৪২, প্রিন্সিপল্স্ অব্ ইসলামি জুরিস্প্রুডেন্স – ডঃ হাশিম কামালি, আজিজুল হক সাহেবের অনুদিত সহি বুখারীতেও থাকার কথা – ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ১৯৭, ইত্যাদি)।

আরো দেখুন ঃ "সামরিক চাকরি হইতে রেহাই দিবার জন্য সক্ষম মুসলিম পুরুষদের উপর জিজিয়া ধার্য করা হইয়াছিল...খ্রীষ্টান গোত্র আল্ জুরাজিমাহ-কে এই চুক্তিতে জিজিয়া হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছিল যে তাহারা মুসলিমদিগের সহিত যোগ দিয়া (শত্রুর বিরুদ্ধে – *লেখক*) যুদ্ধ করিবে ও গণিমতের মালের অংশীদার হইবে" – "ইসলামে দ্য মিস্আণ্ডারস্টুড রিলিজিয়ান" – বিশ্ববিখ্যাত শারিয়া-নেতা সৈয়দ কুতুব http://www.islambasics.com/view.php?bkID=157&chapter=15#_ftn1.

আমরা জানি নবীজী পরের নেতা ঠিক করে যাননি, জনগণের ইচ্ছের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। অথচ হজরত আবু বকর রসুলের অনুকরণ না করে নেতৃত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন হজরত ওমরকে। এবং হজরত ওমরও রসুলের অনুকরণ না করে ছয় জনের এক কমিটি বানিয়ে তার ওপর ভার দিয়ে গিয়েছিলেন ঐ কমিটির ভেতর থেকেই পরের খলিফা ঠিক করতে। এ থেকে কি প্রমাণ হয় ? প্রমাণ হয় যা তাঁরা ঠিকই জানতেন, নবীজীর হাজার হাজার সুন্নতের সবগুলোই ইসলামি ধর্মবিশ্বাসের অংশ নয়। আমাদের আলেমদেরও তা জানতে হবে ও জাতিকে জানাতে হবে। সামাজিক পটভূমির ওপরে নবীজীর সুন্নত পরিবর্তনের কঠিন সুন্নত আছে।

কি সেই সুন্নত, কোরাণের কি সেই পদ্ধতি যা সর্বকালের মওলানাদের জন্য অবশ্য পালনীয় ?

খেয়াল করুন। নবীজী (দঃ) অনেক কিছু বদলেছেন যেমন ঃ (১) বহু বছর চালু রাখার পরে মু'তা বিবাহ (সাময়িক অস্থায়ী বিয়ে) নিষিদ্ধ করেছেন ; (২) প্রথমদিকের দু'ওয়াক্ত নামাজ মেরাজের পর পাঁচ ওয়াক্ত করেছেন ; (৩) সিদ্ধান্ত বদলেছেন কবর-জিয়ারত বা কোরবাণির মাংস সংরক্ষণের ব্যাপারে, এবং (৪) অন্যান্য বহু বিষয়ে। এ-থেকে আমরা কি পাচ্ছি ? চিন্তা করে দেখুন। স্বয়ং নবীজীর সামনেই কোরাণে-সুন্নতে পরিবর্তন করা হয়েছে। কেন করা হয়েছে ? ডঃ কামালি বলছেন ঃ "নবী (দঃ)-এর সময়েই কোরাণ ও সুন্নাহ-তে কিছু সম্পূর্ণ ও কিছু আংশিক পরিবর্তন করা হয়। পরিস্থিতির পরিবর্তনই ইহার মূল কারণ।"

স্বয়ং কোরাণ বলছে ঃ "আমি কোন আয়াত রহিত করিলে বা ভুলাইয়া দিলে তাহা অপেক্ষা উত্তম বা সমপর্যায়ের আয়াত আনি" (বাকারা ১০৬) এবং "যখন আমি এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত আনি এবং আল্লাহ যা নাজিল করেন তা তিনিই ভালো জানেন" (নাহ্ল আয়াত ১০১)। একে বলে নস্খ্। কোরাণও বিভিন্ন বিধান বহু বছর চালু রাখার পরে বদলেছে, যেমন ঃ (১) আল্লাহ'র কাছে সুপারিশ করার পদ্ধতি বদল করেছে আন্ নাবা ৩৮ ; বাকারা ৪৮, ১২৩, ২৫৪ ; নিসা ১২৩ ; আনাম ৫১, ৭০ ; আল্ যুমার ১৯, ইত্যাদিতে। (২) জেরুজালেমের দিকে মুখ করে নামাজ পড়ার নির্দেশ ১৪ বছর চালু রাখার পরে বদলিয়ে কাবা'র দিকে করেছে (বাকারা ১৪২ – ১৪৪ ; সহি বুখারী হাদিস নং ৪১৯ ও ৪২০, হাফেজ আবদুল জলিল)। (৩) বিধবার এক বছরের ইদ্দত বহু বছর চালু রাখার পরে বাতিল করে চার মাস দশ দিন করেছে (বাকারা ২৪০ ও ২৩৪)। (৪) একসাথে দু'বোনকে বিয়ের প্রথা বহু বছর চালু রাখার পরে নিষিদ্ধ করেছে (নিসা ২৩)। (৫) অনিয়ন্ত্রিত বহুবিবাহকে বহু বছর চালু রাখার পরে সর্বোচ্চ চার স্ত্রী করেছে (নিসা ৪)। (৬) পিতামাতা ও আত্মীয়দের উত্তরাধিকার বহু বছর চালু রাখার পর পরিবর্তন করেছে (বাকারা ১৮০, নিসা ১১)। (৭) বহু বছর চালু রাখার পরে যিহার বাতিল করেছে (সুরা সেজদাহ ৪)। (৮) আরও উদাহরণ দেখুন মওলানা মুহিউদ্দীনের অনুদিত কোরাণ পৃষ্ঠা ৫৩, ১২৫৫ ও ১৩৪৭। (৯) বুখারীতে আছে ঃ "ইবনে উমর এই আয়াত পড়িত – 'তাহাদের সুযোগ ছিল রোজা রাখা অথবা কোন দরিদ্রকে প্রতিদিন খাওয়ানো' এবং বলিয়াছে এই আয়াতের আদেশ রহিত করা হয় (৩য় খণ্ড হাদিস ১৭০) এবং "বার্ মাউনাতে যাহারা নিহত হইয়াছিল তাহাদের উপর নাজেলকৃত আয়াতটি আমরা পড়িতাম কিন্তু পরে তাহা বাতিল করা হয়" (৪র্থ খণ্ড হাদিস ৬৯)। নবীজীর সাথে একান্তে কথা বলতে হলে কিছু সদকা দিতে হবে এ-আয়াতও আল্লাহ নাজিল করে পরে নিজেই রহিত করেন (মুহিউদ্দিন খানের অনুদিত বাংলা-কোরাণ পৃষ্ঠা ১৩৪৭)। আল্লাহ নিজেরই সুস্পষ্ট নির্দেশ বাতিল ও রহিত করেছিলেন তার নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে এটা "সুস্পষ্ট নির্দেশ'-এর প্রবক্তারা কি করে অস্বীকার করবেন ?

একদিকে আমরা স্পষ্ট দেখছি আল্লাহ ও নবীজী একের পর এক নূতন সামাজিক বিধান চালু করছেন, অনেক পরে তার কোনোটা বদলাচ্ছেন কিংবা বাতিল করছেন। আবার অন্যদিকে দেখছি আল্লাহ বলছেন ঃ "আপনি কখনো পরিবর্তন পাবেন না আল্লাহ'র সুন্নাহ-এ" (সুন্নাহ – অর্থাৎ রীতিনীতি, প্রতিষ্ঠিত নিয়ম, চালু বিধান ইত্যাদি – সুরা আহযাব ৬২)। একটু খুঁটিয়ে দেখলেই দেখা যাবে যেটাতে "কখনো পরিবর্তন পাবেন না" তা হল মূল্যবোধ ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, আর যেটাতে পরিবর্তন পাবেন তা হল সামাজিক বিধানের প্রণয়ন, পরিবর্তন ও বাতিল। মনে আছে ছোটবেলায় মা আপনাকে বলেছিলেন "যাও গোসল কর ?" আবার একদিন এ'ও বলেছিলেন "গোসল করো না।" দু'টোই দলিলে ধরা আছে বলে আমি কি বলতে পারি আপনার মা হয় নির্বোধ কিংবা থুক্কু করে আগের ভুলটা শুধরেছেন ? মোটেই তা নয়। "যাও গোসল কর" তিনি বলেছিলেন যেদিন আপনি খেলা শেষে ধুলোমাখা দেহে ঘরে ফিরেছিলেন, এবং "গোসল করো না" বলেছিলেন যেদিন আপনার জ্বর হয়েছিল। আপনার কল্যাণ হল তাঁর মূল্যবোধ, ওটা ঠিক রাখার জন্যই নির্দেশ বদল। চিন্তা করুন, যদি তিনি 'সুস্পষ্ট নির্দেশ" না বদলিয়ে জ্বরের দিনেও বলতেন "যাও গোসল কর" তবে আপনার কি অবস্থা দাঁড়াতো ?

ইসলামেও তাই। কোরাণে দেয়া মানবকল্যাণের মূল্যবোধ বজায় রেখে সামাজিক বিধান বদলানো ইসলামের অপরিহার্য শর্ত। এজন্যই কোরাণ-রসুলের নস্‌খ্‌। ডঃ কামালি বলছেন ঃ "মানুষের উপকারের জন্য সমাজের বিদ্যমান পটভূমি ও আইনের সমন্বয় করার প্রয়োজনে নস্‌খ্‌ আসিয়াছে...কোরাণ ও হাদিসে নস্‌খ্‌-এর সর্বপ্রধান কারণ হইল স্থান-কালের বিষয়টি।" এই সমন্বয় কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা ইসলামের এক সমালোচনার জবাবে বলেছেন মওলানা মওদুদি'ও ঃ "তৎকালীন (অতীতের) বিদ্যমান পরিস্থিতি উপেক্ষা করিয়া ওই সময়ের ঘটনাকে বর্তমানের আলোকে দেখিবার জন্যই এই ভুল হইয়াছে"– ইসলামিক ল' অ্যাণ্ড কন্সটিটিউশন পৃষ্ঠা ২৩৬। ইউরোপের বিখ্যাত শারিয়া-সমর্থক বিলাল ফিলিপ বলেছেন ঃ "আল্লাহ কখনো কোনো তাৎক্ষণিক কারণে মানুষের উপযোগী আইন দেন। কিন্তু পরে ইহার উদ্দেশ্যে হাসিল হইয়া ইহার উপকারিতা লোপ পায়। এই পরিস্থিতিতে আর ইহার অস্তিত্ব থাকে না"– দি এভোল্যুশন অব্‌ ফিক্‌হ্‌ পৃষ্ঠা ২০। মওলানা মুহিউদ্দিনের কোরাণেও এই একই কথা আছে ৩৩৪ পৃষ্ঠায় ঃ "নাসিখ ও মনসুখের অবস্থা একজন বিজ্ঞ হাকিম ও ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রের মত...ডাক্তার যখন পূর্ববর্তী ব্যবস্থাপত্র রহিত করে নূতন ব্যবস্থাপত্র দেন তখন এরূপ বলা ঠিক নয় যে পূর্বের ব্যবস্থাপত্রটি ভুল ছিল ... বরং আসল সত্য হচ্ছে এই যে, বিগত দিনগুলোতে সে ব্যবস্থাপত্রই নির্ভুল ও জরুরি ছিল এবং পরবর্তী পরিবর্তিত এ-ব্যবস্থাপত্রই নির্ভুল ও জরুরী।" তিনি ৫৩ পৃষ্ঠাতেও ওই একই কথা বলেছেন। এমনকি মওদুদী যে মওদুদী. সেই তিনিও স্বীকার করেছেন ঃ "কোরাণ-সুন্নাহ'র সুস্পষ্ট নির্দেশ বদলাইবার অধিকার কাহারো নাই। অন্যদিকে আমি ইহাও বলিয়াছি, ভিন্ন পরিস্থিতিতে ইজতিহাদ প্রয়োগ করিয়া সময়ের দাবীর ভিত্তিতে ঐগুলি পরিবর্তনকে বৈধ করা যাইতে পারে" (ইসলামিক ল' অ্যাণ্ড কন্সটিটিউশন, পৃঃ ৯৩)।

কি আশ্চর্য – আমরাও তো হুবহু এই একই কথা বলছি ! চোদ্দশ' বছরে সামাজিক-পারিবারিক পরিবর্তনের বাস্তবতাকে স্বীকার করাটাই তো ইসলাম। বিভিন্ন দেশে শারিয়াপন্থীরা এটা তো স্বীকার করে নিচ্ছেনও, বিধান তো বদলাচ্ছেনও যেমন বাতিল করছেন তাৎক্ষণিক তালাক, মুরতাদ-হত্যা, জিজিয়া কর এবং অনুমোদন করছেন নারী নেত্রীত্ব, নারীর বিচারক হওয়া, ইত্যাদি। এটা ভালো লক্ষণ। এভাবেই তাঁরা একদিন পারিবারিক আইনগুলোও বদলাবেন তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

এবারে আমি আবারো মওলানা মওদুদি'র প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করব, বিশেষ করে শারিয়াপন্থীদের। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন ঃ "বিভিন্ন পয়গম্বরের প্রচারিত ধর্মীয় আইনগুলিতে ভিন্নতা আছে কেন ? (differ in matters of detail)...বিভিন্ন পয়গম্বরের প্রচারিত বেহেশতি কেতাবে নির্দেশিত ইবাদতের পদ্ধতিতে, হালাল-হারামের বিধানগুলিতে ও সামাজিক আইনগুলির বিস্তারিত কাঠামোতে (detailed legal regulations) ভিন্নতা আছে কেন ?...(কারণ) স্বয়ং আল্লাহ বিভিন্ন সময়ের, বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াইবার জন্য আইনের ধারা (legal prescriptions) বদলাইয়াছেন"– তাঁর তাফহিমুল কুরাণে মায়েদা ৪৮-এর ব্যাখ্যা – http;//www.tafheem.net/main.html।

কি আশ্চর্য – আমরাও তো হুবহু এই একই কথা বলছি ! কোরাণের এই বাস্তব বিধানটা মেনে নিলেই তো হল ! এই মূল্যবোধ মেনেই তো রসুল, খলিফা এবং মওলানারা অনেক বিধান বদলেছেন। যেমন হজ্বের সময় পাথর মারার পদ্ধতি, মহাশূন্যে এবং উত্তর গোলার্ধে নামাজ-রোজার সময়, বেশকিছু মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে সমান উত্তরাধিকার ইত্যাদি, যেমন মরক্কো, সিনেগাল ও তিউনিসিয়া (তিউনিসিয়ায় মুসলমান শতকরা ৯৯%)। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কিরগিজস্তানে দ্বিতীয় বিয়ে করলে সটান দু'বছরের কারাদণ্ড – কোনো খাতির নেই। এমনকি গত ফেব্রুয়ারীতে ইরাণের গ্র্যাণ্ড আয়াতুল্লাহ সানে'ই বিধবার উত্তরাধিকার পরিবর্তনের ফতোয়া দিয়েছেন। এঁদের কাউকেই তো কেউ মুরতাদ বলেনি ! উনারা যদি পারেন, আমাদের মওলানারাও পারেন। উনারা যেভাবে পারেন, আমাদের মওলানারাও সেভাবে পারেন। দরকার শুধু উপলব্ধির ও নিয়তের। কিন্তু ইসলামের এই গতিময়তা না বুঝার ফলে আমাদের আলেম সমাজের ভাবমূর্তি নারী-বিরোধী হয়ে পড়েছে যা সমাজের জন্য মোটেই ভালো নয়।

এ বিষয়ে দৈনিকগুলোত অসংখ্য নিবন্ধে কোরাণে নারীর উত্তরাধিকারের সব আয়াতের সমষ্টি দেখিয়ে দাবি করা হচ্ছে যে উত্তরাধিকার অর্ধেক হলেও নারীর

উপার্জন, দেনমোহর-ভরণপোষণ সব মিলিয়ে নারী পুরুষের বেশিই পায়। তত্ত্ব হিসেবে কথাটা সত্যি কিন্তু বাস্তবে কথাটা সত্যি নয়। দৈনিক ইনকিলাব ২৫ মে ২০০৮ তারিখে জনাব মোহাম্মদ আবদুল অদুদ 'ইনসাফ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা' নিবন্ধে চমৎকার বাক্যে লিখেছেন – "আল্লাহ প্রদত্ত মুসলিম পারিবারিক আইন একটি অঙ্কের শিকল। এর কোথাও বিচ্যুতি ঘটলে, পুরোটাতেই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে।" আমরা নিরীক্ষা করে দেখেছি আসলেই তাই, অঙ্কটা মেলে চমৎকার। কিন্তু শারিয়াপন্থীরা যা খেয়াল করেন না তা হলো অঙ্কটা মেলে চোদ্দশ' বছর আগের সমাজের আর্থ-পারিবারিক-সামাজিক কাঠামোর সাথেই। চোদ্দশ' বছরের বিবর্তনে শিকলটার কিছু অংশ খসে পড়ে পৃথিবী থেকে উধাও হয়ে নূতন অংশ ঢুকেছে বলে বর্তমানে ওই শিকল প্রয়োগ করা অসম্ভব। তা করতে গেলে বিশ্বকে সেই চোদ্দশ' বছর আগের আর্থ-পারিবারিক-সামাজিক অবস্থায় নিয়ে যেতে হবে যা অবাস্তব ও অসম্ভব। তাই বুঝি 'বাস্তববাদী' বলে বিখ্যাত ইমাম তাইমিয়া বলেছেন "মুসলিম বিশ্বে কোন চিরন্তন শাসনব্যবস্থা বাস্তবভিত্তিকও নহে, সম্ভবও নহে"– পলিটিক্যাল থট্ অব্ ইবনে তাইমিয়া, পৃঃ ১০৬। সেই সমাজে গোত্র তার প্রতিটি সদস্য ও নারীকে প্রাণপণে সবদিক দিয়ে রক্ষা করত। এতে গোত্রের সম্মান ও শক্তি বজায় থাকত। কিন্তু নারীর সে রক্ষাকবচটা আজ নেই, জনসংখ্যা ও সম্পদের সেই ভারসাম্যও নেই। এখন ছোট্ট একক পরিবারে বাবা-মা, ভাইবোন বা রাষ্ট্র কেউই কাউকে সবদিক দিয়ে রক্ষা করতে পারে না। তাই বহু পরিত্যক্ত নারীর শেষ উপায় দাঁড়ায় ভিক্ষাবৃত্তি বা পতিতাবৃত্তি। পতিতালয়ের অনেক রিপোর্টে এর বাস্তব প্রমাণ আছে।

আমাদের বুঝতে হবে কোরাণ হঠাৎ একদিন এ-সব সামাজিক বিধান দিয়ে শূন্য থেকে নূতন সমাজ সৃষ্টি করেনি। কোরাণ সেই প্রাচীন সমাজের নারী-বিরোধীতায় কিছুটা ভারসাম্য এসে ভবিষ্যতের সমান অধিকারের পথ দেখিয়ে গেছে। এ দু'য়ে যে আকাশ-পাতাল তফাৎ সেটা না বুঝলে আমরা কোনদিনই ইসলামে মানবকল্যাণের মর্মবাণী বুঝব না। সেই সমাজে নারীকে পুরুষের চেয়ে কম অধিকার দেয়ার কারণ হল নারীর দায়িত্ব নেবার অক্ষমতা। কিন্তু তার জন্য নারী দায়ী নয়, দায়ী সেই সমাজব্যবস্থা। তাছাড়া এখন যে বাংলাদেশে প্রায়ই নীরব দুর্ভিক্ষ, মারাত্মক কর্মহীনতা, ভয়াবহ সিডর আর মঙ্গায় মরে যায় কোটি মানুষ আর রাস্তায় পড়ে থাকে হাড্ডিসার লাশ, লেগে থাকে বন্যা-খরা-ঝড়ের ধ্বংস, কোটি মানুষ অর্ধাহারে সে দেশে দেনমোহর বা স্বামীর ভরণপোষণের দায়িত্বের যুক্তি নিষ্ঠুর পরিহাস মাত্র। যাঁরা বলেন দেনমোহর হল নারীর রক্ষাবকচ তাঁদের জানা উচিত নারীর সারাজীবনের খরচ হবার মত দেনমোহর কখনোই ধার্য করা হয় না। তাছাড়া দেনমোহর হতে পারে একজোড়া জুতো বা কোরাণ থেকে কিছু তেলাওয়াত (শারিয়া দি ইসলামিক ল' পৃষ্ঠা ১৬৩, ১৬৪ ও বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ৩য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৯৭৬ সহি বুখারী ৭ম খণ্ড ২৪ ও সহি তিরমিজি ৯৫১)। স্বামীর ভরণেপোষণের দায়িত্বের যুক্তি যাঁরা দেখান তাঁদের জানা উচিত সেই দায়িত্ব হল ঃ "স্বামী খাবার, বাসা ও পোশাক দিবে বাধ্য স্ত্রীকে, অবাধ্য স্ত্রীকে নহে। বাচ্চা হইবার সময় ব্যতীত অন্য সময়ে ডাক্তার-ওষুধের খরচ বা সাবান-প্রসাধন দিতে স্বামী বাধ্য নহে" (হানাফি আইন হেদায়া পৃষ্ঠা ১৪০ ও শাফি' আইন এম-১১-৪)। বলাই বাহুল্য, কে বাধ্য আর কে অবাধ্য স্ত্রী তা কিন্তু ঠিক করবে ঐ স্বামীই। হানাফি-শাফি' কেতাব হাতের কাছে না থাকলে দেখে নিন মুহিউদ্দিন খান অনুদিত বাংলা কোরাণ পৃষ্ঠা ৮৫৭ ঃ "স্ত্রীর যে প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করা স্বামীর যিম্মায় ওয়াজিব তা চারটি বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ – আহার, পানীয়, বস্ত্র ও বাসস্থান। স্বামী এর বেশি কিছু স্ত্রীকে দিলে অথবা ব্যয় করলে তা হবে অনুগ্রহ, অপরিহার্য নয়।" এসব অত্যন্ত নির্লজ্জ আইন। স্বামী তালাক দিলে স্ত্রী খোরপোষ পাবে মাত্র তিন মাস। আর তাৎক্ষণিক তালাকে তো খোরপোষের কোনো বালাই-ই নেই। তারপর সে স্ত্রী কি খাবে কি পরবে তার কোনো হদিস নেই। কাজেই নারীকে আর্থিক দিক দিয়ে শক্তিশালী করার দরকার আছে।

শারিয়াপন্থীরা সর্বদাই বলেন আয়াতের পটভূমি থেকে নির্দেশ নিতে। কথাটা ঠিক, কারণ কোরাণের কি কি নির্দেশ তখনকার জন্য আর কি কি নির্দেশ শাশ্বত তা পটভূমি থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁরা নারীর ওপরে অত্যাচার করার জন্য ঐ পটভূমিই লঙ্ঘন করেন। উত্তরাধিকারের বেলায়ও কথাটা সত্যি। সুরা নিসা আয়াত ১১ ও ১৭৬-তে নারীর অর্ধেক উত্তরাধিকারের প্রত্যক্ষ নির্দেশ আছে। আয়াত ১৭৬-এর পটভূমি পাওয়া যায়নি, কেউ জানালে বাধিত হব। আয়াত ১১ নাজিল হয়েছিল এক বিশেষ পটভূমিতে। আউস বিন্ সাবেত নামে এক ধনী আনসারের মৃত্যু হলে তখনকার আর্থ-সামাজিক ঐতিহ্য অনুযায়ী আউসের চাচাতো ভাই এসে তার স্ত্রী, দুই বালেগ মেয়ে ও এক নাবালেগ ছেলেকে বঞ্চিত ক'রে সব সম্পত্তি গ্রাস ক'রে ফেলে (কোরাণের বাংলা অনুবাদ – মুহিউদ্দিন খান, পৃষ্ঠা ২৩৪, এবং ডঃ মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ, – দ্য মুসলিম উইমেন)। কোরাণ সেই নাবালেগ পুত্রের আর্থিক নিরাপত্তার জন্য বালেগ বোনের দ্বিগুণ সম্পত্তি দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে। অর্থাৎ এই আয়াত শাশ্বত নয় বরং তাৎক্ষণিক বিশেষ পরিস্থিতির সমাধান। আজ যদি কোরাণ মেনে ঐ আয়াত প্রয়োগ করতে হয় তবে শুধুমাত্র নাবালেগ পুত্র এবং বালেগ বোনদের ক্ষেত্রেই সেটা প্রয়োগ করা যেতে পারে। সেই বিশেষ পরিস্থিতি না হলে ঐ সুরা নিসা আয়াত ১২ মোতাবেকই নর-নারীর সমান উত্তরাধিকার হতেই হবে। সেখানে মৃতের ভাই-বোনের সমান উত্তরাধিকারের যে নির্দেশ দেয়া আছে সেটা কোথায় গেল ? মৃতের ভাই-বোন সমান পেলে তার ছেলেমেয়েরা অবশ্যই সমান পাবে।

আসল কথা হলো, নিয়ত ও বাস্তবের উপলব্ধি। আমাদের ইসলামী নেতৃত্ব যদি কোরাণ-রসুলের দেয়া পদ্ধতি অনুসারে মূল্যবোধ বজায় রেখে বাস্তব বদলের সাথে নারী-অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চান তবে তার সমর্থন কোরাণ-রসুল থেকেই পাবেন।

বাংলাদেশ জামাতে ইসলামি বলেন তাঁরা তাঁদের হারাম নারী-নেত্রীত্ব হালাল করেছেন পরিস্থিতির কারণে। তাঁদের বুঝা উচিত নারীর সমান-উত্তরাধিকারও হওয়া প্রয়োজন ওই পরিস্থিতির কারণেই। আমার সাথে ভয়েস্ অব্ আমেরিকা রেডিও-বিতর্কে এক উঁচুস্তরের শারিয়া-নেতা আমাকে বলেছেন নারী ত্রিশ কেজি ওজন তুলতে পারে না কিন্তু পুরুষ পারে। রেডিওতে দুনিয়ার সামনে আমি তাঁকে অসম্মান করতে চাইনি কিন্তু এ-যুক্তি সত্যি হলে মানুষ নয় বরং হাতি বা গণ্ডার হওয়া উচিত আশরাফুল মাখলুকাত। "কলসি কাঁখে ঘাটে যায় কোন্ রূপসী" গানটা শুনতে ভালো কিন্তু দু'কলসি পানি মাথায় নিয়ে আধ-মাইল হাঁটলে তালপাতার সেপাই অনেক পুরুষেরই ঘাড়ের হাড় নড়ে যাবে। অথচ বহু জায়গায়, বিশেষত ভারতের মধ্যপ্রদেশে নারীরা মাথায় ক'রে দু'কলসী পানি বয় মাইল ধরে, প্রতিদিন। ক'জন পুরুষ পারবে তা ? একটানা তিন ঘণ্টা কুলো ঝাড়লে কিংবা ঢেঁকি পাড় দিলে বহু পুরুষই বুঝবে নারীর শক্তি ও ধৈর্য কত অসাধারণ, তা'ও আবার হাসিমুখে। সেজন্যই বলি, নারীকে কোনই সাহায্য করতে হবে না – শুধু ওদের বাধা না দিলেই ওরা অসাধ্য সাধন করে দেখাবে। নারীকে অক্ষম ও দুর্বল ইসলাম করেনি, করেছি আমরা।

অসীম কোরাণ দু'হাত ভরে দিতে চায় কিন্তু সসীম মানুষ দু'হাতের ওপরে দু'মুঠোর বেশি নিতে পারে না। আমাদের বুঝতে হবে মদ্যপানের মতো অভিশাপ কোরাণ হুকুম দিয়ে একদিনে দূর করতে পারত কিন্তু কেন ধীরে ধীরে তিনটে পদক্ষেপ নিল। দাসপ্রথার মতো অভিশাপ কোরাণ এক হুকুমে দূর করতে পারত কিন্তু কেন একটু একটু করে এগিয়ে বহু বছর পর উচ্ছেদ করল (সুরা মুহম্মদ ৪)। পুরুষের ইচ্ছেমতো বহুবিবাহ আর তালাক, স্ত্রী-প্রহার, প্রতিটি নারী সম্পত্তিহীন, তার চাক্ষুষ সাক্ষ্য আদালতে অচল ইত্যাদি শুধু আরবেই নয় বরং মানুষের সামগ্রিক ইতিহাসের চিরন্তন কুপ্রথা। সেগুলোকেও কোরাণ এক হুকুমে দূর করতে পারত। কিন্তু কোরাণ জানে, কোনো ভাল বিধানও মানুষ যদি না উপলব্ধি করে তবে জোর করে চাপিয়ে দিলে আখেরে সমাজের সর্বনাশ হতে বাধ্য। তাই আমরা দেখি কোরাণ অতি সতর্কভাবে একটু একটু করে ততটুকুই প্রতিষ্ঠিত করেছে যতটুকু মানুষ নিতে পারত, যতটুকু সেই সমাজে সম্ভব ছিল। সে-জন্যই কোরাণ প্রাথমিকভাবে প্রতিটি নারী-অত্যাচারের ওপরে বিভিন্ন শর্ত দিয়ে প্রচণ্ড বাধা সৃষ্টি করেছে, অর্ধেক হলেও নারী-সাক্ষ্য ও নারী-উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু সেটাই মঞ্জিলে-মকসুদ নয়। এ-সমস্যারও শেকড় এত গভীরে ছিল যে দাসপ্রথার মতো এটাও পুরো করা নবীজীর সময়ে সম্ভব হয়নি। তাই কোরাণ দিয়ে রেখেছে গন্তব্যের নির্দেশ – দাসপ্রথা উচ্ছেদ কর এবং নরনারী পরস্পরের পোশাক, পরস্পরের ওলী। পোশাক বা ওলী পরস্পরের অর্ধেক হয় না, তাদের মধ্যে মারপিটও হয় না।

আর, কোরাণ লঙ্ঘন ? তার বহু উদাহরণ তো আমাদের চোখের সামনেই আছে। দেখুন বি-বি-সি'র খবর ঃ "১৯৯৭ সালে গৃহীত 'নারী উন্নয়ন নীতি-৯৭'-এ নারীর ক্ষমতায়ন ও অধিকার বিষয়ে ৭.১ ধারায় বর্ণিত 'সমান অধিকার' শব্দ দু'টি বাদ দিয়ে করা হয়েছে 'সংবিধান-সম্মত অধিকার'। ৭.২ ধারার 'সম্পদ, বাসস্থান, অংশীদারিত্ব, উত্তরাধিকার-সম্পদ, ভূমির ওপর অধিকার আইন' ইত্যাদি লাইন ও শব্দ বাদ দেয়া হয়েছে। ৭.৩ ধারায় 'নারীর সর্বাত্মক কর্মসংস্থান' বদলে করা হয়েছে 'যথোপযুক্ত'। ধারা ৮ থেকে রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের পুরোটাই এবং মন্ত্রীপরিষদ, সংসদ ও বিদেশে বাংলাদেশ মিশনে নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত কয়েকটি অংশ সম্পূর্ণভাবেই বাদ দেয়া হয়েছে।"

বলাই বাহুল্য ওই 'যথোপযুক্ত' ও 'সংবিধান-সম্মত' অধিকারগুলো কি তা কিন্তু তাঁরাই ঠিক করবেন। এগুলো চালাকি ছাড়া আর কিছু নয় এবং চালাকি দিয়ে সমাজের মঙ্গল করা যায় না। দেখুন ইসলামি ফাউণ্ডেশনের প্রকাশিত বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ১ম খণ্ড আইন নং ৩৪৪ – "(স্বামীর জন্য) তালাক সজ্ঘটিত হওয়ার জন্য সাক্ষী শর্ত নহে।" এবারে দেখুন সুরা ত্বালাক ২, স্ত্রী-তালাকের সময় – 'তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন নির্ভরযোগ্য লোককে সাক্ষী রাখিবে।' এই হলো কোরাণ লঙ্ঘন। হদ্দ বা হুদুদ হলো জ্বেনা, জ্বেনার অপবাদ, চুরি, ডাকাতি, মদ্যপান, রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও ইসলাম ত্যাগ। দেখুন বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ৩য় খণ্ড ৯১৪ গ – "হদ্দ-এর আওতাভুক্ত কোন অপরাধ করিলে ইসলামি রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করা যাইবে না।" হানাফি আইন হেদায়া-তেও এ-আইন আছে ১৮৮ পৃষ্ঠায়। এই হলো কোরাণ-লঙ্ঘন, এরকম বহু শারিয়া আইন আছে।

সরকার সহ সবাইকে বুঝতে হবে সাম্য ও সমান অধিকার এক নয়। কিন্তু সেই বাহানায় নারী-অত্যাচারও ইসলাম-সম্মত নয়। নারীর সমান উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে ধর্ম ছাড়াও আর্থ-পারিবারিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বহু জটিল সুতোয় টান পড়বে। কারণ নর ও নারীর জীবন, আশা-আকাঙ্ক্ষা, শরীর-মন, মানসিকতা, স্বপ্ন, চাহিদা, সমস্যা ও সমাধান শুধু আলাদাই নয় বরং কখনো কখনো পরস্পর-বিরোধীও হয়ে ওঠে। তাই সমান উত্তরাধিকার কেন ইসলাম-বিরোধী নয় সেটা জনগণকে পরিষ্কারভাবে বুঝানোর কোনই বিকল্প নেই। রেডিও-টেলিভিশনে খবরের কাগজে ক্রমাগত নিবন্ধ, বই ও বিশ্ববিখ্যাত প্রগতিশীল ইসলামি বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকার দিয়ে জনগণকে জানাতে হবে। যাঁরা সমান উত্তরাধিকারের বিরুদ্ধে তাঁদের সাথেও দলিলভিত্তিক উন্মুক্ত আলোচনা হওয়া দরকার।

কেউ যদি কারো কথা না মানেন তবুও লা আকরাহা ফিদ্বীন—ধর্মে জবরদস্তি নেই—এটা মানতে হবে। ইসলামে মানুষ ও আল্লাহ'র মধ্যে কোনো দালাল নেই এটা মানতে হবে, নারীরা কারো চেয়ে কম মুসলিম নন এটাও মানতে হবে। এ-জন্যই এ-বিষয়ে নারীদের মতামতের জরিপ জরুরি। এবং সবচেয়ে জরুরি হল অন্যান্য দেশের নারীদের মতো নিজেদের ইসলামি নারী-সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে অধিকারের সংগ্রাম করা। এর কোনই বিকল্প নেই।

ইসলাম নিয়ে এ কালখেলার শেষ হোক। বিশ্ব-মুসলিম আল্ কোরাণের শান্তিবাণী বুকে নিয়ে অমিতগর্বে উঠে দাঁড়াক অতীতের সামরিক শক্তিতে নয়, ক্ষমতার লড়াইয়ের ষড়যন্ত্রে নয়, মেধা এবং প্রেম-ভালবাসা-ক্ষমার শক্তিতে, ন্যায়বিচার ও নর-নারীর সমান অধিকারের শক্তিতে। আবারো বলছি, ইসলামের বহু ব্যাখ্যা সম্ভব কিন্তু যে ব্যাখ্যায় মানবাধিকার রক্ষা হয় সেটাই প্রকৃত ইসলাম। আমরা সবাই একসাথে চেষ্টা করলে আল্লাহ্ তায়ালা'র ওয়াদা আছে আমাদের সাহায্য করার এবং নেয়ামত ফিরিয়ে নেয়ার যদি আমরা চেষ্টা না করি – সুরা রা'দ ১১ , আনফাল ৫৩।

এর চেয়ে কথা স্পষ্ট হয় না। আমরা শুধু মনে মনে চাইব কিন্তু কাজে কিছুই করব না অথচ আল্লাহ্ আমাদের উন্নতি করে দেবেন তা হয় না ॥

সংবিধান ও ধর্মীয় রাজনীতি

কথা উঠেছে ১৯৭২-এর সংবিধানে ফিরে গিয়ে ধর্মীয় রাজনীতি বন্ধ করা নিয়ে। কথাটা ধর্মীয় রাজনীতি বলা হলেও বিষয়টা ইসলামের নামে রাজনীতি, যাকে অনেকে মৌদুদিবাদও বলেন। সাইডলাইনে দাঁড়িয়ে আছে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ও সংবিধানে বিসমিল্লাহ। আমরা জানি বাহাত্তরে অবৈধ হবার পরেও পঁচাত্তরের খিড়কি দরজা দিয়ে ধর্মীয় রাজনীতি আবার ফিরে এসেছে। সেই খিড়কি বন্ধ না ক'রে আমরা বাহাত্তরের প্রধান ফটক বন্ধ করবো কোন্ ভরসায় ? মৌদুদিবাদের কৌশল বিশ্লেষণ করে পাল্টা কৌশল উদ্ভাবন না ক'রে রাজনৈতিক ঘাঁটাঘাঁটি করলে লাভ হবে না। তার প্রাথমিক কৌশল রাজনীতি-নিরপেক্ষ। সরকারে সে না থাকলেও, নির্বাচনে না জিতলেও, এমনকি সাংবিধানিকভাবে সে অবৈধ হলেও তার অসংখ্য মাদ্রাসা থেকে গত কয়েক দশকে অসংখ্য সমর্থক বেরিয়ে রাষ্ট্রযন্ত্রে, সামরিক বাহিনীতে, সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ও স্ট্রীটপাওয়ারে তাকে শক্তিশালী করেছে, ভবিষ্যতে আরো করবে। সাথে আছে অজস্র পেট্রোডলারে গড়া ইসলামী লেবেল লাগানো মৌদুদিবাদী সংগঠনগুলো, অজস্র বইপত্র ও দেশে কামানো অঢেল টাকার শক্তি। আরো সাথে আছে মধ্যপ্রাচ্য-প্রবাসী বাংলাদেশীরা (৩০ লক্ষ?) যাঁরা প্রায় সবাই মৌদুদিবাদে বিশ্বাসী। এঁরা আর্থিক প্রতিপত্তিতে এবং আরো বহু হাজার মাদ্রাসা গড়ে নিজেদের অঞ্চলকে সেই তত্ত্বে প্রভাবিত করেছেন। এসব শক্তিতে বহু বছর ধরে মৌদুদিবাদই আসল ইসলাম হিসেবে জাতির চোখের সামনে বড় করে ধরা আছে। কিন্তু তার মুখোশ খুলে ইসলামের শান্তিময় ব্যাখ্যা প্রচারের কোনো সংগঠন নেই বা থাকলেও দুর্বল।

তার কৌশলের ওপর বিস্তারিত লেখার সুযোগ এখানে নেই, কিন্তু বলা দরকার সে বড়ই সুদক্ষ খেলোয়াড়। আপাততঃ সে একটু কাদায় পড়লেও তাকে ছোট ক'রে দেখাটা আমাদের জন্য হবে মারাত্মক আত্মঘাতী। অন্যের ব্যর্থতার ফসল ঘরে তুলতে এবং অন্যের দ্বারা নিজের মতলব উদ্ধারে সে ওস্তাদ। দেশে বিএনপি'র ঘাড়ে চড়ে স্বার্থ উদ্ধার ছাড়াও পাকিস্তান শারিয়া-রাষ্ট্র হওয়া, আমাদের সংবিধানে "বিসমিল্লাহ" বা "রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম" যোগ করা এসব গণবিচ্ছিন্ন সিদ্ধান্তও নির্বাচিত সাংসদরা আলাপ-আলোচনা বা বিতর্ক করে নেননি, নিয়েছে সামরিক স্বৈরশাসকরা। তুর্কিস্থানে কামাল পাশা, বাহাত্তরে শেখ মুজিব, ও মিসরের নাসের সাংবিধানিকভাবে তাকে নিষিদ্ধ করার পরেও ঐ প্রতিটি দেশে সে ফিরে এসেছে প্রবলতর শক্তিতে। মুসলিম বিশ্বের বৃহৎ অংশ গ্রাস করার পর এখন সে জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার কমিশনকে পুরোটাই, এবং ইউরোপের কিছুটা, নিয়ন্ত্রণ করছে। পশ্চিমা সিস্টেমের সাহায্যে সে কিছু নাদান পশ্চিমাদেরই সহায়তায় ক্রমাগত পশ্চিমা সিস্টেম ভাঙছে। তাছাড়া প্রাকৃতিক অনেক কারণেই আওয়ামী লীগ চিরদিন ক্ষমতায় থাকবে না, প্রতিপক্ষ একদিন ক্ষমতায় আসবেই। এসেই তারা তড়িৎ গতিতে আবার মৌদুদিবাদকে সাংবিধানিক বৈধতা দেবে। এটা ঠিক, জাতি একাত্তরের অভিজ্ঞতা ও মরমীয়া ইসলামের উপলব্ধি দিয়ে মৌদুদিবাদকে এখনো ঠেকিয়ে চলেছে। এটাও ঠিক, আমাদের সাংস্কৃতিক শক্তি, নূতন প্রজন্মের প্রবল আধুনিকায়ন ও উদীয়মান নারীশক্তিও তার প্রবল প্রতিপক্ষ। কিন্তু প্রধান প্রবেশদ্বার নিষিদ্ধ হলেও বিভিন্ন কৌশলে খিড়কি দরজা ব্যবহারে সে অভিজ্ঞ ও দক্ষ। পাকিস্তানের মতো তার ধূর্ত কৌশলে ধীরে ধীরে ইসলামের শান্তিময় ব্যাখ্যায় ঘুণ ধরিয়ে ধর্মীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করার সম্ভাবনা থেকেই যায়।

তার মনোবল ভেঙে দেবার জন্য তাকে সাংবিধানিকভাবে অবৈধ করাটা শর্ট-টার্ম টাস্ক হতে পারে, লং-টার্ম নয়। তার সমস্ত প্রতারণা ও হিংস্রতা যে উৎস থেকে ওঠে তা হলো তার অপদর্শন। সেই অপদর্শনের দলিল সম্বন্ধে গণসচেতনতাই তার ফিরে আসার পথ স্থায়ীভাবে বন্ধ করতে পারে। দরকার শুধু ইসলাম ও মৌদুদিবাদের দলিলগুলো থেকে জাতিকে দেখানো কিভাবে সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে কোরাণ, রসুল, ন্যায়বিচার ও নারী অধিকারের সাথে, কোরাণ-রসুল ও ইসলামকে সে যতটা অপমান করেছে আর কেউ তা করেনি। যেমন, তার আইনে আছে তওবা করলে

গণহত্যা, গণধর্ষণ, সম্পত্তি লুণ্ঠনকারীদের শাস্তি হবে না – বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ১ম খণ্ড, ধারা ১৩। অর্থাৎ বাংলাদেশ শারিয়া-রাষ্ট্র হলে মুক্তিযুদ্ধের যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি হবে না কারণ তারা "তওবা" করবে। আরেকটা উদাহরণ – শারিয়া আইন মোতাবেক শারিয়া-রাষ্ট্রে খুনজখম, চুরি, ডাকাতি, পরকীয়া ইত্যাদি অপরাধে সবার শাস্তি হবে কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধানের শাস্তি হবে না (বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন ৩য় খণ্ড, ধারা ৯১৪গ)। খুন, জখম, চুরি, ডাকাতি, মদ্যপান, পরকীয়া মামলায় নারী-সাক্ষী অবৈধ (বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন ১ম খণ্ড, ধারা ১৩৩ ও ২য় খণ্ড, ধারা ৫৭৬।

এ দলিলগুলো মৌদুদিবাদের মৃত্যুবাণ। কারণ এই শারিয়া কেতাব তাদেরই লেখা এবং বাংলাদেশ ইসলামী ফাউণ্ডেশনের প্রকাশিত। এরকম অজস্র দলিল আছে যা দেখালে যাঁরা অন্ধবিশ্বাসে তার ইসলাম-বিরোধী অপতত্ত্বের খপ্পরে পড়েছিলেন তাঁদের অন্ততঃ বড় একটা অংশ শুধু সরেই আসবেন না বরং তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন। তেমন অনেককে আমি চিনি। এগুলো স্কুল-কলেজের সিলেবাসেও অন্তর্ভুক্ত করা দরকার যাতে ভবিষ্যতের প্রজন্ম ইসলামী জ্ঞানের শক্তিতে তাকে উচ্ছেদ করতে পারে। ক'মাস আগে দেয়া আদালতের এ-পরামর্শ সরকারের গ্রহণ করা উচিত। তাতারস্থানে ইসলামি নেতৃত্ব জনগণকে মৌদুদিবাদের ভয়াবহতা শিখিয়েছেন, জনগণই মৌদুদিবাদের বিরুদ্ধে হিমালয় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই একই বীজ আমাদের ইসলাম প্রচারকেরাও আমাদের আকাশে-বাতাসে মাটিতে-পানিতে দিয়ে গেছেন, বীজটাতে দলিলের মাধ্যমে গণসচেতনতার পানি ঢালা দরকার।

দু'টো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের কোনই ব্যাখ্যা দেয়নি সরকার। (১) ধর্মীয় রাজনীতি বন্ধ করার কারণ কি ? মুক্তিযুদ্ধে এক জামাতের হিংস্র কর্মকাণ্ডের কারণে বাকী সবার ধর্মীয় রাজনীতি বন্ধ হবার যুক্তি ধোপে টেকে কি ? (২) জামাতি ও জামাত-সমর্থক দৈনিকগুলো তারস্বরে যে যুক্তি দেখাচ্ছে, বহু দেশে এমনকি ভারত-ইউরোপ-আমেরিকাতে ধর্মীয় রাজনৈতিক দল আছে। বাংলাদেশে কেন নিষিদ্ধ হবে, এ দাবী ভিত্তিহীন কেন ?

বিষয়টা আসলে একাত্তরও নয়, জামাত বা মুক্তিযুদ্ধও নয়, এবং ইসলামও নয়। বিষয়টা হলো ধর্মের নামে রাজনীতি ক'রে রাষ্ট্রক্ষমতা কুক্ষিগত করাকে নিষিদ্ধ করা। রাষ্ট্রক্ষমতা হলো চূড়ান্ত ক্ষমতা। বহুজাতিক বহুমাত্রিক বহুধারণার বিশ্বে সেই চূড়ান্ত ক্ষমতা কোনো বিশেষ ধর্মের একমাত্রিক ধ্বজাধারীদের হাতে তুলে দেয়া যায় না। এই একমাত্রিকতার কারণেই ধর্মীয় রাষ্ট্রগুলো হাজার হাজার বছর সময় পাবার পরেও তাদের বৈধতা প্রমাণে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ধর্মব্যবসায়ীরা তদের স্রষ্টাকে তুষ্ট করতে যত সর্বগ্রাসীভাবে ও যত উল্লাসের সাথে মানুষের ওপর অত্যাচার করেছে ততটা আর কোনো কারণে করেনি – প্যাস্কেল। অতীতে হিন্দুরাষ্ট্রে নরবলি-সতীদাহ সহ নারী ও অচ্ছুৎদের ওপরে এবং খ্রীষ্টান রাষ্ট্রে ডাইন-পেড়ানো, দার্শনিক বিজ্ঞানীদের অত্যাচার-হত্যা ছাড়াও ইন্‌কুইজিশন অর্থাৎ ভিন্নমতের ওপরে ভয়াবহ গণহত্যা ও অত্যাচার হয়েছে। সেজন্যই জনতা ভৈরব গর্জনে ধর্মীয় রাষ্ট্র উচ্ছেদ করে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থা বানিয়েছিল। কিন্তু ব্যতিক্রম বাদ দিলে মুসলিম-খেলাফতও বিশ-বাইশটি "আমিরুল মু'মেনীন" বংশের গৃহযুদ্ধ, বিদ্রোহ, পাল্টা বিদ্রোহ, গুপ্তহত্যা, সুফি ও দার্শনিক বিজ্ঞানীদের ওপরে অত্যাচার-হত্যা সব মিলিয়ে সাধারণ মানুষের রক্তে রক্তাক্ত। শেয়াল কুমিরকে তার বাচ্চা দেখানোর মতো ইসলাম-ব্যবসায়ীরা ঐ ব্যতিক্রমগুলোকেই বারবার জাতির সামনে তুলে ধরেন।

ধর্মীয় রাষ্ট্র বলতে বিশ্বে এখন শুধু কিছু শারিয়া-রাষ্ট্র আছে এবং তারাও মানবাধিকারের দিক দিয়ে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র যেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘনকে ক্রাইম হিসেবেই দেখে এবং শাস্তির ব্যবস্থা করে সেখানে ধর্মীয় রাষ্ট্র সেটাকে ধর্মের নামে বৈধ করে। হিন্দুরাষ্ট্রে মনু'র, খ্রীষ্টান রাষ্ট্রের ক্যানন ল', এবং শারিয়া-রাষ্ট্রে শারিয়া আইনগুলো তার প্রমাণ। এর সাথে গত কয়েক দশকে যোগ হয়েছে "শারিয়া-পুলিশ" যার অত্যাচারে বিশেষ করে নারীদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। এদের কাজ হলো পিস্তল হাতে ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়ানো কোন নারী একটু টাইট পোশাক পরলো, কার একটু চুল বেরিয়ে আছে হিজাব থেকে, কে কার সাথে কোথায় যাচ্ছে, কে নামাজ পড়ছে না, কে রোজা রাখছে না, ইত্যাদি। এমনিতেই পিস্তল হাতে পড়লে মানুষের অহংবোধ বেড়ে যায়, তার ওপরে ধর্মের মালিকানা পেলে তো কথাই নেই। দেশে দেশে এদের অত্যাচারের কাহিনী ভয়ঙ্কর—একটা বলছি। ক'বছর আগে সৌদী আরবে মেয়েদের স্কুলে ব্যাপক আগুন লাগলে মেয়েরা হুড়োহুড়ি ক'রে বেরিয়ে আসে, তাতে তাদের মাথা থেকে স্কার্ফ পড়ে যায়। এই কারণে শারিয়া-পুলিশ তাদেরকে পেটাতে পেটাতে আবার জ্বলন্ত স্কুলে ঢুকিয়ে দেয়। যারা বাইরে থেকে সাহায্য করতে ছুটে এসেছিল তাদেরকেও পিটিয়ে সরিয়ে দেয়। ফলে অনেক মেয়ে আগুনে পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। ধর্মীয় রাষ্ট্রে ধর্মীয় উগ্রতা এমন উদগ্রই হয়ে থাকে।

যেহেতু বাংলাদেশে ধর্মীয় রাজনীতি বলতে ইসলামের নামে রাজনীতি বোঝায়, এবং যেহেতু সে-ক্ষেত্রে জামাতের নামই আসে প্রথম তাই জামাতের দর্শন সম্বন্ধে জাতির জানা প্রয়োজন। যাঁর অপদর্শনের ভিত্তিতে বাংলাদেশে জামাত গঠিত হয়েছে (ইন্ট্রোডিউসিং জামাতে ইসলামি বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা ৫) সেই মওলানা মৌদুদি শান্তিময় ধর্ম ইসলামকে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে পরিণত করেছেন, হেদায়েতের কেতাব কোরাণকে আইনের বই করেছেন, রসুলকে প্রেসিডেন্ট আর সেনাপতি করেছেন, এবং আল্লাহ-রসুল-কোরাণের নামে সন্ত্রাসকে বৈধ করেছেন। প্রচুর উদাহরণ আছে, একটা দিচ্ছি তাঁর তাফহিমুল কুরাণ গ্রন্থে সুরা নিসা'র আয়াত ২৪-এর ব্যাখ্যার সারাংশ ঃ "যুদ্ধবন্দিনীরা বৈধ কেননা তাদের বিবাহ বাতিল হইয়া যায়। সরকার কোনো

সৈন্যকে যেই বন্দিনী দিবে শুধুমাত্র তাহার সাথেই যৌন সম্পর্ক করিতে পারিবে, সে নারীর ধর্ম যাহাই হোক না কেন। দাসীর সংখ্যার কোনো নির্দিষ্ট সীমা নাই, বাচ্চা হইলে সেই বন্দিনীকে বিক্রয় করা যাইবে না" – www.islamicstudies.info/tafheem.php?sura=4&verse=23&to=25.

অর্থাৎ বাচ্চা না হলে বা হবার আগে পর্যন্ত তাকে বিক্রী করা যাবে। এগুলো বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, এগুলোই মৌদুদিবাদ। যুদ্ধবন্দিনীদের বিবাহ বাতিল হইয়া যায় এটা শারিয়া আইনেও আছে— উমদাত আল্ সালিক আইন নং **o.9.13**। প্রশ্ন হলো, ওরা ওদের ধর্মীয় বিধানে বিয়ে করেছে, সেই বিয়ে বাতিল করার তুমি কে ? মতলবটা পরিষ্কার ধরা আছে তথাকথিত "সহি" হাদিসে, সুনান আবু দাউদ হাদিস নং ২১৫০। মুসলিম সৈন্যরা বন্দিনীদেরকে ধর্ষণ করতো, কখনো কখনো তাদের স্বামীদের সামনেই এবং "কোনো কোনো সৈন্য তাহা পছন্দ করিত না।" বুখারী ৩য় খণ্ড ৭১৮, মুসলিম ৩৪৩২ ইত্যাদিতেও বন্দিনী-ধর্ষণের কথা আছে। এসব হাদিস ইসলামের ওপরে কলঙ্ক ছাড়া আর কিছু নয়, আমাদের মঙ্গলের জন্যই এসব বাদ দিয়ে শুধু ভালোগুলো রাখতে হবে। যাঁরা এগুলো জেনে বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হবেন তাঁদের প্রতি আবেদন জানাই, এগুলো আমাদেরই কেতাব, এগুলোর মুখোমুখি হতেই হবে আমাদের। ইসলামি রাজনীতির ভিত্তিই হলো ঐধরনের হাদিস আর শারিয়া আইনগুলো । সমর্থন করার আগে ওগুলো পড়ে দেখুন। এধরনের অপতত্ত্বকে দেশ পরিচালনার ভার দেয়া যায় না।

জাতিকে বুঝতে হবে জামাত ঠিক কি কারণে আমাদের ওপরে গণহত্যা-গণধর্ষণে পাকিস্তানকে সক্রিয় সমর্থন দিয়েছে। কারণটা হলো, ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে যে কোনো বাধাকে যে কোনো উপায়ে সরিয়ে দেয়াটা তাদের জন্য বাধ্যতামূলক, এটা তাদের ইবাদতের মধ্যে পড়ে। মিথ্যা বলাও তার মধ্যে পড়ে, তাদের পরিভাষায় এর নাম "তাক্কিয়া"। তাদের শারিয়া আইনেও আছে ঃ "যদি উদ্দেশ্যটি বাধ্যতামূলক হয় তবে সেই উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলা বাধ্যতামূলক" – শাফি আইন নং **r.8.2**। ইসলামী রাজনীতির উদ্দেশ্য পরিষ্কার, শারিয়া-ভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। কাজেই তারা যে দিনরাত মিথ্যা কথা বলে যা দেখে জাতি অভ্যস্ত, তার শেকড়ই ওখানে। অথচ আল্ কোরাণে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে – "মিথ্যা হইতে দূরে থাকো" – সুরা হজ্জ, আয়াত ৩০।

এক ধর্মের রাষ্ট্র অন্য ধর্মের রাষ্ট্রকে বৈধতা দেয় ও উৎসাহিত করে। পাকিস্তান শারিয়া-রাষ্ট্র ভারতে ব্রাহ্মণবাদী মৌলবাদকে ও ইসরাইলে ইহুদী-রাষ্ট্রকে (যদিও সাংবিধানিকভাবে সেটা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র) বৈধতা ও উৎসাহ দেয়। আমরা বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে ইসলামী রাষ্ট্র বানাবো অথচ ওদের দেশে করতে দেবো না এ-দাবী অন্যায় ও অবৈধ। তথাকথিত ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আছে বলেই তার প্রতিপক্ষ হিসেবে ইউরোপ আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়াতে খ্রীষ্টান-রাষ্ট্রতত্ত্বের জনপ্রিয়তা বাড়বার সম্ভাবনা রয়েছে। তেমন হলে এসব দেশে কোটি কোটি মুসলমানের ওপরে কি কেয়ামত নেমে আসবে তা বুঝতে আইনস্টাইন হতে হয় না। ধর্মীয় রাজনীতিকে অবৈধ না করলে অসংখ্য ধর্মের অসংখ্য রাষ্ট্রে বিভক্ত পৃথিবীতে অনন্তকাল ধরে মানুষে মানুষে হানহানিকে অন্ততঃ তাত্ত্বিকভাবে বৈধ করা হয়। এসব কারণে এবং কোরাণ-রসুল মোতাবেক ইসলাম প্রচারকেরা ও অসংখ্য মুসলমান ইসলামে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি মেশানোর তীব্র বিরোধীতা করেছেন ও করেন।

এবারে আমরা দেখব আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ইউরোপের কিছু দেশ ও ভারত সহ বিশ্বে অনেক দেশে ধর্মীয় রাজনীতি সাংবিধানিকভাবে বৈধ হলেও আমাদের মতো মুসলিম-প্রধান দেশে কেন তা নিষিদ্ধ করা দরকার। কথাটা আপাতদৃষ্টিতে যতটা স্ববিরোধী মনে হয় আসলে ততটাই সহজ। দুনিয়ায় বহু দেশে খ্রীষ্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজনৈতিক দল আছে। ওরাও এদের, অর্থাৎ ইসলাম-ভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর, মতই নির্বাচন ক'রে ক্ষমতায় যেতে চায়। এদের মতো ইহুদীরাও দাবী করে ওদের ধর্মবিশ্বাস আসলে "সামগ্রিক জীবনবিধান", হিন্দুদেরও অন্যকিছু মনে করার কারণ নেই। দু'পক্ষের অমিলও আছে। যেমন, ওদের আইনগুলো (হিন্দুদের মনু-আইন কিংবা ইহুদীদের হালাখা আইন) এদের শারিয়া আইনের মতো অতটা বিধিবদ্ধ (codified) নয়, ধর্মীয় আইন না মানলে "মুরতাদ" হুংকারে হত্যার উসকানী ওদের নেই কিন্তু এদের আছে ; জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার কমিশনের নিয়ন্ত্রণ সহ বিশ্বময় অসংখ্য সংগঠনের রাজনৈতিক চাপ ওদের নেই কিন্তু এদের আছে ; রাষ্ট্রীয়ভাবে কোনো দেশে ওদের আইন চালু নেই কিন্তু এদের আছে (পাকিস্তান, ইরাণ, মধ্যপ্রাচ্য, আফগানিস্তান, ইত্যাদি) ; ছাপান্নটা মুসলিম-প্রধান দেশের কেন্দ্রীয় সংগঠন ও-আই-সি'র আন্তর্জাতিক চাপের শক্তি ওদের নেই কিন্তু এদের আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমাদের প্রধান বিষয় হলো ক্ষমতায় গিয়ে কে কি করবে কারণ ওর ওপরেই জনগণের ভালোমন্দ নির্ভর করে। বাস্তবে আমরা দেখি পশ্চিমা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ প্রবলভাবে রাষ্ট্র ও ধর্মের পৃথকীকরণের পক্ষপাতী, রাষ্ট্রযন্ত্রে ধর্মের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ তারা মোটেই পছন্দ করে না। সেজন্য ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলো কখনো তেমন ভোট পায় না। এমনকি ক্যানাডায় এক ধর্মনিরপেক্ষ দল যখন নির্বাচনে ঘোষণা করেছিল তারা সরকার গঠন করলে সব ধর্মের স্কুলে সরকারী অনুদান দেবে তখন বিশ্বাসী ইহুদী-খ্রীষ্টানদের বড় অংশ তার প্রবল বিরোধীতা করেছিল। যদিও বহু আগে থেকে ক্যাথলিক স্কুলে সরকারী অনুদান দেয়াটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে (এটাও অনেকে পছন্দ করে না), তারপরেও নির্বাচনে শুধু সেই দলই হারেনি তার দলীয় প্রধানও হেরেছিল, এবং পরে তারা এ-ভুল স্বীকারও করেছিল। অর্থাৎ, পশ্চিমা দেশে ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলোর বিরুদ্ধে গণসচেতনতার হিমালয় দাঁড়িয়ে আছে, সাংবিধানিকভাবে নিষিদ্ধ না হলেও এখানে ইহুদি বা খ্রীষ্টান রাষ্ট্রের

সম্ভাবনা নেই এ-কথা বলা যায়। ধর্মীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা ওদের ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গ নয় বলে সে-ব্যাপারে ওদের ওপরে বিশ্বাসের চাপটাও নেই। কিন্তু মুসলিম-প্রধান দেশে সে-কথা বলা যায় না, সেখানে এ-ব্যাপারে গণসচেতনতা নেই, বিশ্বাসের চাপটাও অনেকেরই আছে। কাজেই দু'অঞ্চলের দু'রকম পদ্ধতি হওয়া দরকার। বলাই বাহুল্য, শারিয়া-ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ইসলামের অঙ্গ এ-তত্ত্বে অসংখ্য মুসলমান বিশ্বাস করেন না। তাঁরা ইসলামকে রাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত করার ঘোর বিরোধী।

তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নিই ওরা যদি কখনো ক্ষমতায় আসে তবে সেক্ষেত্রে কি হতে পারে। সেক্ষেত্রে তাই হবে যা ভারতে চণ্ড ব্রাহ্মণবাদী দল বি.জে.পি. ক্ষমতায় এলে হয়েছিল । তারা দেশকে হিন্দু-আইনভিত্তিক ধর্মীয় রাষ্ট্র বানায়নি, ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান বদলায়নি। ওটা ইহুদী-খ্রীষ্টান ধর্মীয় রাজনৈতিক দল বা বি.জে.পি. কারোই উদ্দেশ্যে নয়। এখানেই তাদের সাথে ইসলামী রাজনীতির মৌলিক পার্থক্য। ইহুদী-খ্রীষ্টান বি.জে.পি. দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে ধ্বংস করতে নয়। অন্যদিকে ইসলামী রাজনীতি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে ধ্বংস করার জন্যই। ইসলামী রাজনীতি যখনই ক্ষমতা পেয়েছে অবিলম্বে ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রকে ধ্বংস ক'রে ধর্মীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে। করেছে কারণ ওটাই ওদের ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গ এবং সমস্ত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য। সেইসব তথাকথিত ইসলামী দেশের অভিজ্ঞতা আমাদের কি শেখায় ? এই শেখায়, ব্যতিক্রমহীনভাবে প্রতিটি দেশের নারীরা ও অমুসলিমেরা নির্যাতিত হয়েছেন, ইসলামের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে, এবং বিশ্ব-মুসলিমের অগ্রগতি ব্যহত হয়েছে।

ধর্মীয় রাজনীতি কি গণতান্ত্রিক হতে পারে ? না, পারে না। "জামাত কি গণতান্ত্রিক ?" এই বিষয়ে জামাতের বর্তমান তত্ত্বগুরু জনাব শাহ্ আবদুল হান্নানের সাথে আমার বিতর্ক হয়েছিল। উনি এক মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন সেক্রেটারী এবং বাংলাদেশ ইসলামী ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান ছিলেন। আমাদের ইসলামী ফাউণ্ডেশনের প্রকাশিত তিন খণ্ডের শারিয়া বই "বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন"-এর লেখক কমিটির একজন সম্মানিত সদস্য উনি। উনি দাবী করছিলেন জামাত গণতান্ত্রিক দল কারণ তারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি পালন করে এবং নির্বাচনে অংশ নেয়। আমার দাবী ছিল জামাত গণতন্ত্রের প্রধান শত্রু, তারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি পালন করে এবং নির্বাচনে অংশ নেয় শুধু গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্যই। আমি একের পর এক দলিল দেখাচ্ছিলাম জামাতের দলিল থেকেই, আর উনি শুধু অভিমত পেশ করছিলেন। আলোচনাটা এখানে পাওয়া যাবে ঃ
http://www.mukto-mona.com/Articles/fatemolla/debate_hannan/hannan1.htm

এ নিবন্ধে যা বলেছি দলিল-প্রমাণ দিয়ে বলেছি। কিন্তু ধর্মবিশ্বাসভিত্তিক সামাজিক বিবর্তনে কারো কথাই শেষ কথা নয়। অনেকে অন্যরকম ভাববেন সেটাই স্বাভাবিক। অহংবোধ বা অন্ধবিশ্বাসের নয়, হিংস্র-সজ্ঞাতের তো নয়ই বরং চিন্তার সজ্ঞাতই সামাজিক অগ্রগতির চালিকাশক্তি ॥

আমেরিকায় গ্রাউণ্ড জিরো মস্ক ও শান্তির মূল্য

২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরে নিউ ইয়র্কের টুইন টাওয়ারের ধ্বংসযজ্ঞ দেখে শিউরে উঠেছিল বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ, শান্তিকামী মুসলমান। জায়গাটাকে "গ্রাউণ্ড জিরো" বলা হয়, ওটার কাছে শরীফ জামাল-এর ব্যক্তিগত জায়গায় বিশাল মসজিদ ও কমিউনিটি সেন্টার বানানোর চেষ্টা করছেন শারিয়া আইনের সমর্থক ইমাম রউফ ও তাঁর স্ত্রী। সে আইনী-অধিকার তাঁদের আছে কিন্তু তারপরেও এর পক্ষে বিপক্ষে সারা আমেরিকায় হুলুস্থুল পড়ে গেছে। এর সাথে বহুকিছু জড়িয়ে গেছে কিন্তু আমি অন্য কথা বলবো। তার আগে বলে নিই "গ্রাউণ্ড জিরো মস্ক" শব্দটাই ভুল। দু'ব্লক দূরে বলা হলেও জায়গাটা গ্রাউণ্ড জিরো'র কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে, ওখান থেকে গ্রাউণ্ড জিরো দেখাও যাবে না কারণ মাঝে বড়ো একটা দালান আছে। বরং সেন্ট পল চ্যাপেল এবং চার্চ অব্ সেন্ট পিটার তার অনেক কাছাকাছি কিন্তু ওগুলোকে "গ্রাউণ্ড চ্যাপেল" বা "গ্রাউণ্ড চার্চ" বলছে না কেউ।

যাই হোক, অসংখ্য ধর্মবিশ্বাসী-অধ্যুষিত দুনিয়ায় ব্যক্তিগত শান্তির পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক শান্তির প্রয়োজন অসামান্য তা সবাই স্বীকার করবেন। কিন্তু সেটা মুফত আসে না, তার মূল্য দিতে হয়। ইতিহাসের শিক্ষা নিয়ে দেখা যাক আমাদের নবীজী সহ সে-মূল্য কারা কিভাবে দিয়েছেন এবং তাতে মানুষের কি লাভ হয়েছে।

১। **৬২৮ সাল**। হজ্ব করার জন্য এক হাজার (দলিলভেদে ৭০০ থেকে ১৪০০) মুসলিম সাথে নিয়ে মক্কা'র উপকণ্ঠে এসে তাঁবু গেড়েছেন বিশ্বনবী। মক্কাবাসীরা তাঁকে ঢুকতে দেবে না, যুদ্ধ হয় হয় ভাব। তখন মক্কাবাসী ও তাঁর মধ্যে এক শান্তি চুক্তি হয় যা হোদায়বিয়া চুক্তি নামে বিখ্যাত। সেটা লিখছিলেন হজরত আলী, শুরু করেছিলেন "বিসমিল্লাহের রহমানের রাহীম" দিয়ে। কোরেশ-প্রতিনিধি সোহেল তাতে আপত্তি করলে নবীজী সেটা বদলে শুধু "আল্লাহ'র নামে" লিখতে বলেন। এটা লেখার পরে লেখা হলো, "এই চুক্তি করা হলো মুহাম্মদ-উর রসুলুল্লাহ এবং কোরেশদের মধ্যে"। সোহেল "আল্লাহ'র রসুল" কথাটায় আপত্তি করলে নবীজী তা কেটে "আবদুল্লা'র পুত্র মুহাম্মদ" লিখতে বলেন। কিন্তু হজরত আলী তাতে রাজী হলেন না। তখন নবীজী নিজের হাতে সেটা কেটে দিলেন এবং "আবদুল্লা'র পুত্র মুহাম্মদ" লিখতে বললেন। এভাবে সেই শান্তিচুক্তি কার্যকর হলো, যার মধ্যে কিছু ধারা মুসলমানদের জন্য অসম্মানজনক ছিল যার জন্য প্রতিটি সাহাবী ইতিহাসে ঐ একবারই নবীজীর সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করেছিলেন। তারপরেও তিনি চুক্তি মোতাবেক হজ্ব না ক'রেই ফিরে গেলেন ৫০০ কিলোমিটার দূরের মদিনায় যেখান থেকে এত কষ্ট ক'রে এসেছিলেন। মরুভূমিতে এক হাজার কিলোমিটার চলা কম কথা নয়। এত যুদ্ধের পরেও নবীজী শুধু মুখের কথায় নয় দলিলের প্রমাণে ইসলামের দু-দু'টো মূল বাক্যের মূল্য দিলেন এবং কোরেশদের অন্যায় দাবী মেনে নিলেন। ফলে কি হলো ? পরের বছর তিনি তিন হাজার মুসলিম নিয়ে বিনা যুদ্ধে বিনা রক্তপাতে মক্কা জয় করলেন (সেদিন বিশেষ অপরাধের জন্য যে আটজনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল তাদের চারজন ক্ষমাও পেয়েছিল)। এরই নাম নেতৃত্বের প্রজ্ঞা। কাবা'য় আরাধনা-ইবাদতের অধিকার আরবের প্রতিটি সম্প্রদায়ের ছিল, মুসলমানদেরও ছিল। কিন্তু অধিকার কখন কোথায় খাটাতে হয় এবং কখন কোথায় খাটাতে হয় না তা তিনি জানতেন।

২। **১৫৮৮ সাল**। ভারতের শিখদের ধর্মগুরু অর্জুনদেব। আমাদের যেমন কাবা শরীফ, ক্যাথলিকদের যেমন ভ্যাটিক্যান, শিখদের তেমনি স্বর্ণমন্দির। সেটা বড়ো ক'রে বানানো হচ্ছে। গুরু'র আদেশ এলো – "লাহোর থেকে মুসলিম সুফি শেখ মিয়া মীরকে নিয়ে এসো, তাঁর হাতে এই স্বর্ণমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হবে।" সবাই অবাক। কেন তা হবে ? আমাদের সর্বোচ্চ গুরু বেঁচে থাকতে আমাদের সর্বোচ্চ উপাসনালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর অন্য ধর্মের লোকের হাতে হবে কেন ? গুরু'র আদেশ এলো, "যা বলছি করো। ভবিষ্যতের মানুষকে ধর্মীয় ভক্তির শক্তিতে ধর্মীয় বিভক্তিকে অতিক্রম ক'রে যাবার পথ দেখিয়ে যাব আমরা।" এক ধর্মের কেন্দ্রীয় উপাসনালয় আজো সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে অন্য ধর্মবিশ্বাসীর হাতে স্থাপিত ভিত্তিপ্রস্তরের ওপরে, এ-নিয়ে বিশ্বাসীরা তর্ক করতে পারেন কিন্তু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ক্ষেত্রে এই হলো নেতৃত্বের অতুলনীয় প্রজ্ঞা।

৩। **৬ই ডিসেম্বর ১৯৯২,** অযোধ্যা। কিছু ধর্মোন্মাদ নেতার নেতৃত্বে ধর্মোন্মাদ হিন্দুর দল ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলো ৪৭৬ বছরের ঐতিহ্যবাহী বাবরী মসজিদ। ওটা নাকি মন্দির ভেঙে বানানো হয়েছিল, ওখানে তারা আবার মন্দির বানাতে চায়। পরের বছরগুলোতে ভয়াবহ হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় খুন হলো হাজারো নিরপরাধ মানুষ, প্রধানতঃ মুসলিম। উজাড় গ্রাম, জ্বলন্ত ঘরবাড়ী, অসংখ্য বিধবা আর এতিমের আর্তনাদে কেঁপে উঠলো ভারতবর্ষ। ২০০২ সালের ৩রা মার্চে হিন্দুস্তান টাইম্‌স্‌ জনমত জরীপ করলো ওখানে জনতা মন্দির চায় নাকি মসজিদ। শতকরা ৬৯.১৩ জন জানিয়ে দিলেন মসজিদটা যদি মন্দির ভেঙে বানানো হয়েও থাকে তবু এত রক্তারক্তি ক'রে মানুষ খুন ক'রে মন্দির বানাবার কোনো দরকার নেই, মসজিদের জায়গায় মসজিদই থাকুক। এরই নাম ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, এরই নাম আলোকিত মানস যা আজকের ধর্মীয় হিংস্রতার প্রেক্ষাপটে অবিশ্বাস্য মনে হবে।

আইনি অধিকারের চেয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অনেক বড় ব্যাপার এবং প্রজ্ঞার সাথে সেই অধিকার প্রয়োগ করাটাই সঠিক নেতৃত্ব। গ্রাউণ্ড জীরো মস্ক-এর জনমত জরীপে আমরা কি দেখি ? নয়-এগারোর মুসলিম ভুক্তভোগী সহ অন্যান্য মুসলিম, মুসলিম সংগঠন (যেমন সেন্টার ফর্ ডেমোক্রেসি অ্যাণ্ড হিউম্যান রাইট্স্ ইন সৌদি অ্যারাবিয়া সংগঠনের ডঃ আলী আলিয়ামী) সহ শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ আমেরিকান এবং শতকরা ৬১ ভাগ নিউ ইয়র্কবাসী এর বিরোধীতা করেছেন (সি.এন.এন. ১৭ই আগষ্ট ২০১০)। মুসলিম-অমুসলিমের এই বিপুল জনমত উপেক্ষা ক'রে শুধুমাত্র আইনি শক্তিতে এগুলে সমাজ অবধারিতভাবে ঘৃণাভিত্তিক সামাজিক বিভক্তির মধ্যে পড়বে বুঝেই মরিয়া হয়ে ঐ জায়গার বদলে সরকারী অন্য জায়গা দেবার প্রস্তাব করেছেন নিউ ইয়র্কের গভর্নর ডেভিড পিটারসন। কিন্তু সেটা প্রত্যাখ্যান ক'রে ইমাম রউফ জাতিকে ঠেলে দিয়েছেন সংঘর্ষের পথে।

গ্রাউণ্ড জিরো হলো গণহত্যার জায়গা, বিশ্বের শুভবুদ্ধির অশ্রুর জায়গাগুলোর অন্যতম। নিউ ইয়র্কে ৩০টি মসজিদ তো আছেই, ঠিক ঐ স্পর্শকাতর জায়গায় আরেকটা মসজিদ বানিয়ে অধিক কি লাভ হবে যা অন্য মসজিদে হবে না ? পশ্চিমা দেশে জনমতের দেশ। এভাবে জাতিকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঁড় করালে চাকরি ব্যবসা থেকে শুরু ক'রে বিভিন্নধরনের মুসলিম-বিরোধী সন্ত্রাস হবে, তার দায় নেবেন এইসব গোঁয়ার মুসলিম নেতারা ? নেবেন না। তাঁরা বুঝতে চান না এই সজ্ঞাত ভবিষ্যতে আরো ভয়াবহ হতে পারে, এর মধ্যেই নিউ ইয়র্কে এক বাংলাদেশী ট্যাক্সী ড্রাইভার মারাত্মকভাবে ছুরিকাহত হয়েছেন শুধুমাত্র মুসলমান হবার কারণে (ক্যানাডা বিডি নিউজ ২৮ আগষ্ট)। শারিয়া আইনের মতো ইসলাম-বিরোধী নারী-বিরোধী আইনের যাঁরা ঘোর সমর্থক সেই ইমাম রউফ এবং তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে অধিকার বনাম প্রজ্ঞার ভারসাম্য আশা করা বৃথা। যাঁকে পুলিশ ১৯৯৪ সালে গ্রেপ্তার করেছিল বেশ্যা-সংশ্লিষ্ট ঘটনায়, যাঁর ট্যাক্স ফাঁকির ঘটনা আছে, হিংস্র স্বভাবের যিনি অন্যকে মারপিট ক'রে মামলায় পড়েছিলেন, ক'বছর আগের রেস্টুরেন্ট ওয়েটার বর্তমানে বিলিয়ন ডলারের মালিক সেই শরীফ জামাল হঠাৎ জেগে উঠে বায়তুল মুকাদ্দাস উদ্ধারে সালাউদ্দীনের মতো প্রবলবেগে ইসলাম উদ্ধারে অবতীর্ণ হবেন, তাঁর জমিতে মসজিদ উঠে সাম্প্রদায়িক শান্তি আনবে এসব আষাঢ়ে গালগল্পের ঠকবাজীতে ভোলার জাতি আমেরিকা নয়।

http://www.thedailybeast.com/blogs-and-stories/2010-08-30/sharif-el-gamal-and-the-ground-zero-mosque/?cid=hp:mainpromo2

মুখমিষ্টি কথায় ইন্টারফেথ ডায়ালগের জন্য আমাদের কিছু ইসলামী নেতাদের তৎপরতার অভাব নেই অথচ তাঁদের হঠকারী ইন্টারফেথ অ্যাকশন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে চরমভাবে নষ্ট করে। এর সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিক নাচুনে বুড়িদের সামনে ঢোলের বাড়ি দেবার লোকেরও অভাব নেই। এর মধ্যেই কথা উঠে গেছে মক্কা মদীনাতে মন্দির-গীর্জা বানাতে দিলে তবেই এখানে মসজিদ বানাতে দেয়া হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। দাবীটা যদিও বৈধ তবু এই পরিস্থিতিকে সেটা আরো জটিল ক'রে তুলবে।

আমাদের মুসলিম পরিচিতি, ভাবমূর্তি ও অধিকার কোনো গোঁয়ার নেতৃত্বের খেলার পুতুল নয় ! দালানের বিনিময়ে সাম্প্রদায়িক শান্তি বিক্রী করার মূর্খতা আমরা কেন করবো। যে দালান রাজনৈতিক দাবাখেলার বোড়ে, যাকে একটা জাতির ৭০% নাগরিক অভিশাপ দেবে তা ইসলামী হতে পারে না। কোরাণ-রসুলেও আমরা দেখি সব মসজিদ ইসলামী মসজিদ নয়। সে-জন্যই আল্লাহ্ তাঁর রসুলকে অনৈসলামিক মসজিদ সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন (সুরা তওবা আয়াত ১০৭) এবং নবীজী সেই মসজিদ ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন (মওলানা মুহিউদ্দিনের অনুদিত কোরাণ, পৃঃ ৫৯২)।

এই মসজিদ বানানোর বিরোধীতা করার জন্য রক্ষণশীল মুসলিমেরা প্রগতিশীল মুসলিমদেরকে ইসলাম-বিরোধী বলেন, অন্যান্য বাহানাতেও সর্বদাই বলেন। কিন্তু প্রগতিশীলদের প্রাণান্ত চেষ্টাতেই মুসলিম সমাজ ধীরে ধীরে এগোচ্ছে এবং রক্ষণশীলেরাও ধীরে ধীরে চোখ খুলছেন। বাংলাদেশের শাহ্ আবদুল হান্নানের মতো জামাতী ও শারিয়া-তত্ত্বগুরুও এখন মুরতাদ হত্যা বা স্ত্রী প্রহারের শারিয়া আইনের বিরোধী। গ্রাউণ্ড জিরো মস্ক-এর ব্যাপারে খোদ জামাতের মতামত দেখুন তার দলীয় পত্রিকা "দৈনিক সংগ্রাম"-এর ২৬ আগষ্টের সম্পাদকীয়তে (সারাংশ) ঃ
"গ্রাউণ্ড জিরোতে ইসলামিক সেণ্টার ও মসজিদ নির্মাণের সপক্ষে বক্তব্যদাতাদের উচিত বিষয়টির ব্যাপারে প্রতিপক্ষের যে ভুল ধারণা রয়েছে সেই ভুলের অপনোদন করা। কেননা তাদের উপরোক্ত বক্তব্য থেকে মুসলমানদের ব্যাপারে যে মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে, সেটা দূরীকরণ না হওয়া পর্যন্ত পরিবেশকে স্বাভাবিক বলা যাবে না। আর ঐ পরিস্থিতিতে সেখানে কিছু করা হলেও ইসলামের কল্যাণ কতদূর হবে তা প্রশ্নবিদ্ধ

... মুসলমানদের এমন কোনো জেদের আশ্রয় নেয়া সঙ্গত নয়, যা ইসলামের লক্ষ্যের জন্য অশোভনীয় হবার সম্ভাবনা থাকে।"

আমিও হুবহু ঠিক ঐ কথাই বলছি। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সাম্প্রদায়িক শান্তি বিশাল ব্যাপার কিন্তু ইন্টারফেথ অ্যাকশন দিয়ে তার মূল্য দিতে হয় যা নবীজী ও অন্যান্য নেতারা দিয়েছিলেন। জনগণ তো বোকা নয়, সে মূল্য না দিলে জাতির চোখে ইন্টারফেথ ডায়ালগ শুধুমাত্র মুখমিষ্টি কথার ঠকবাজী হয়েই চিহ্নিত হবে। চালাকি ধূর্তামি দিয়ে কোনোদিনই সমাজের মঙ্গল করা যায়নি, যাবেও না ॥

লাব্বায়েক্ !

দুই ছেলে হজ্বে যাবে তাই নিয়ে মাহবুব সওদাগরের বাড়ি খুব ব্যস্ত। নূতন বিয়ে ওদের। এখনি সময় হজ্ব করার, পরে বাচ্চাকাচ্চা হয়ে গেলে কঠিন হয়ে পড়বে। লোকে মনে করে হজ্বটা বুড়োবয়সের ব্যাপার – বড্ড ভুল ধারণা কারণ হজ্বে খুবই শারীরিক পরিশ্রম হয়। বড়ছেলে ছোটাছুটি করে জোগাড়যন্ত্র করছে কিন্তু ছোটকে নিয়ে মহা সমস্যা। ছোটবেলা থেকেই তার রহস্যের শেষ নেই, তার রঙ্গরসের পাল্লায় পড়ে চিরকাল সবাই অস্থির। বাবা প্রস্তুতির কথা জিজ্ঞেস করলেই সে বলে, 'হচ্ছে বাবা হচ্ছে, চিন্তা কোর না। এ-বছর যদি একজনের হজ্বও কবুল হয় তো আমারই হবে ইন্‌শা আল্লাহ্।'

বাবা আশ্বস্ত হন কিন্তু ছোটবৌ হয় না। তার বাবাও হজ্ব করেছে, সে জানে হজ্বে যেতে হলে কি হুলুস্থুল আয়োজন করতে হয়, কত জায়গায় কত ছোটাছুটি করতে হয়। সে দিব্যি দেখতে পাচ্ছে স্বামী তার কিছুই করছে না। মহা আরামে সে গা' এলিয়ে আছে, যোগাড়যন্ত্রের কোন খবরই নেই। জিজ্ঞেস করলেই হেসে বলে, 'আমারটা আমি করছি, তুমি তোমারটা গুছিয়ে নাও তো, শেষে তোমার জন্য দেরি না হয়।' বৌ ত্রস্তে এটা-ওটা গোছায় কিন্তু মনে গেঁথেই থাকে সন্দেহটা। তার ওপর সেদিন স্বামী মাহবুব সওদাগরের কাছ থেকে হজ্বের নাম করে আরো এক লাখ টাকা চেয়ে নিল।

কেন নিল ?

তারপর একদিন বড় চলে গেল হজ্বের ক্যাম্পে বৌয়ের হাত ধ'রে। বাবা ছোটকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর হজ্ব-ক্যাম্প, ফ্লাইট, এসবের কিছুই তো বললি না।'
ছোট হেসে বলে, 'ক্যাম্পে কেন যাব। বাড়ি থেকে সোজা হজ্বে যাব, ব্যবস্থা সবই হচ্ছে, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো তো বাবা।'

রওনা হবার দিন এল। বাবা বুকে জড়িয়ে দোয়া করলেন, মা অশ্রুসিক্ত চোখে ছেলে-বৌয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে কি বললেন বুঝা গেল না। ড্রাইভার গাড়ির ডিগ্গি'র মধ্যে স্যুটকেস পুরে দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে। মা'কে জড়িয়ে ধরে ছোট বলল,
'মা, দশদিন পর ফিরে আসব। দোয়া কোর আর শুটকি রান্না করে রেখো।'
বাবা অবাক হলেন।
'দশদিন পর ফিরবি ?'
'ফিরব বাবা, কথা দিচ্ছি হজ্ব করেই ফিরব। ঠাট্টা নয় বাবা, সত্যি বলছি।'

বৌয়ের কানে গেল কথাটা। সে জানে দশদিনে হজ্ব করে ফেরা যায় না। কিন্তু সে এ'ও জানে স্বামী যে দৃঢ় আত্মবিশ্বাসে কথাটা বলেছে নিশ্চিন্ত হয়েই বলেছে। যা বলেছে তা সে করবে। কিন্তু কি করে করবে ? এমনিতে স্বামী তাকে ছাড়া চোখে অন্ধকার দেখে, তার সান্নিধ্যে শক্তি পায় এগুলো নিয়ে মনে মনে তার ভারী স্বামীগর্ব। পেছনের সিটে বসল দু'জন, গাড়ি চলা শুরু করলে সে স্বামীর কানে কানে জিজ্ঞেস করে,
'আমরা কোথায় যাচ্ছি গো ? হ্যাঁ ?'
'কোথায় আবার, হজ্বে যাচ্ছি।'
'এভাবে কেউ হজ্বে যায় ? আসলে কোথায় যাচ্ছি সত্যি করে বলো না !'
ছোট হেসে বলে, 'হজ্বেই যাচ্ছি। সবুর করো, একটু পরেই দেখতে পাবে।'
বৌ খুব সবুর করল। তারপর আর পারল না। একটু পরে আবার বলল,
'বাবার কাছ থেকে এক লাখ টাকা বেশি নিলে কেন ?'
ছোট আবারও হেসে বলল, 'সবুর করো, সেটাও দেখতে পাবে।'
বৌ আবারও সবুর করল। গাড়ি এসে দাঁড়াল বাস স্টেশনে। বৌ বলল,
'এ তো বাস স্টেশন !'
'হ্যাঁ, বাস স্টেশনই তো !'
'বাসে করে হজ্বে যাচ্ছি ?'
'হ্যাঁ। পথে কিছু কষ্ট করতে হবে, পারবে তো ?'
'আমরা হজ্বে যাচ্ছি না। বাসে করে কেউ হজ্বে যায় না। বাবাকে এভাবে ঠকালে ?'

'কাউকে ঠকাইনি। এ-বছর যদি কারো হজ্ব কবুল হয় তো আমাদেরই হবে ইন্‌শা আল্লাহ্। ওখানে গিয়ে বলবে লাব্বায়েক্।'
'মানে কি ?'
'লাব্বায়েক মানে হল আমি হাজির। অর্থাৎ হে আল্লাহ্, তুমি ডেকেছ, এই যে আমি হাজির হয়েছি।'

ড্রাইভার ডিগ্গি থেকে স্যুটকেসগুলো বাসে তুলে দিয়ে মৃদুহেসে বলল,

'আপনেরে হাজার সালাম সার। আপনেরে হাজার হাজার সালাম সার। অ্যাম্‌তেই ধীরে ধীরে মুসলমানের চৌক্ষু খুইলা দিব আল্লায়।'
গম্ভীর স্বরে ছোট বলল,
'সব রওনা হয়ে গেছে ঠিক মতো ? পরের এক লাখ টাকারটাও ?'
ড্রাইভার বলল, 'হ সার। শ্যাষের চালান নিজের হাতে রওনা করাইয়া দিছি পরশু।'

এসব শুনে রমণীয় কৌতূহলের চাপে বৌয়ের অজ্ঞান হবার অবস্থা কিন্তু স্বামীকে মনে হচ্ছে অচেনা। ওই বুকে কি এক অস্থির ঝড় চলছে তা তার চোখ দেখলে বুঝা যায়। তার সদা-দুরন্ত কৌতুকময় চোখ দু'টো এখন যেন ফ্রেমে বাঁধা ঝড়ের ছবি। বাস চলা শুরু করলে বৌ বলল,
'কোথায় যাচ্ছি আমরা ?'
'রংপুর।'
'রং–পু–র ?' আঁতকে উঠল বৌ, – 'রংপুর কেন ? ওখানে তো আমাদের কেউ নেই !'

স্বামী শক্ত করে চেপে ধরল বৌয়ের হাত । গভীর নিঃশ্বাসে শুধু বলল, 'আমার হাত ধরে থাকো।'

এবার বৌয়ের হাতও আঁকড়ে ধরল স্বামীর হাত, বুঝল কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে যা আগে কখনো ঘটেনি। বাস চলছে সাভার পার হয়ে। স্বামী হাতের ব্যাগ খুলে বের করল মাস খানেক আগের কিছু পুরনো খবরের কাগজ। মোটামুটি একই তারিখের এতগুলো কাগজ - বৌ যেন কিছু একটা বুঝেও বুঝতে পারছে না। আড়চোখে দেখল স্বামী কাগজগুলো একটা একটা করে খুলছে, সেইসাথে শক্ত দৃঢ় হয়ে আসছে তার চিবুক, ঠোঁটে শক্ত হয়ে চেপে বসছে ঠোঁট আর ঘন হয়ে আসছে তার নিঃশ্বাস।

দুপুরে রংপুরে বাস থেকে নেমে ঘটঘটে বেবিট্যাক্সীতে চেপে গ্রামের পথ। বিকেলে দূর গ্রামের কাছাকাছি আসতেই কানে এল জনতার হৈ হৈ। কাছে এসে বৌ দেখল দাঁড়িয়ে আছে চাল-ডাল-আলু-পেঁয়াজ ভর্তি তিনটে ট্রাক। ট্রাকের ওপর থেকে তরুণ-কিশোরের দল মহা উৎসাহে ক্ষুধার্ত লোকজনের মধ্যে বিতরণ করছে চাল-ডাল আলু-লবণ আর পেঁয়াজ-মরিচ। ওড়নাটা কোমরে আচ্ছা করে পেঁচিয়ে মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম নিয়ে ট্রাকের ওপরে দাঁড়িয়ে তাদের নেত্রীত্ব দিচ্ছে পাড়ার আপামণি। তদারকিতে ব্যতিব্যস্ত গ্রামের মাতব্বর আর মসজিদের ইমাম। ভয়ঙ্কর মঙ্গা দুর্ভিক্ষ চলছে উত্তরবঙ্গে, ক্ষুধার দাউ দাউ আগুনে পুড়ে যাচ্ছে কোটি মানুষ। চোখে শুকিয়ে যাওয়া অশ্রু নিয়ে লুটিয়ে ঘুমিয়ে আছে হাড্ডিসার শিশুকন্যা, হাড্ডিসার বালক। কঙ্কালসার মৃতদেহ রাস্তায় চিৎ হয়ে বীভৎস মুখে আকাশকে ভেংচি কাটছে। অন্য এক ভয়ঙ্কর আতঙ্কে আতঙ্কিত ক্ষুধার্ত যুবতি – গত মঙ্গায় দু'টো নুন-ভাতের জন্য নোংরা ফড়িয়ার বিছানায় শরীর বিক্রি করার দুঃসহ স্মৃতি আবার তার সামনে কালনাগিনীর ছোবল তুলে এদিক-ওদিক দুলছে। অনাহার জর্জরিত বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, অনাহার জর্জরিত নিরুপায় যুবক। খবরের কাগজে সে-সব পড়ছে আর ছবি দেখছে দেশের মানুষ কিন্তু চিনতে পারছে না। সরকারও চিনতে পারছে না। ওরা এ দেশের নয়। ওরা পরিত্যক্ত, ওদের কেউ নেই।

পলকের জন্য টলে উঠল বৌয়ের মাথার ভেতর।

কিন্তু এখন জনতার ক্ষুধিত আর্তনাদ বদলে হয়েছে উৎসবের চিৎকার। বৌ মুগ্ধ চোখে দেখল মানুষের আনন্দ, তারপর দুষ্টুমি করে বলল,
'ও ! হজ্বের টাকায় দান-ধ্যান হচ্ছে তাহলে ?'
'দান ?' চকচক করে উঠল স্বামীর দু'চোখ – 'কিসের দান ? কাকে দান ? আশরাফুল মাখলুকাত ওরা, আপাতত একটু কষ্টে পড়েছে। আমি তো শুধু উপহার দিচ্ছি, মানুষের প্রতি মানুষের উপহার।'
মুগ্ধ বৌয়ের মুখ ফসকে বেরিয়ে এল, 'তুমি একটা ফেরেশতা।'
'না। আমি ফেরেশতার চেয়েও বড়, আমি বনি আদম। কোরাণ পড়ে দেখ।'
তারপর স্বামী তার সেই পুরনো পরিচিত দুষ্টুমিভরা চোখে বলল, 'আসলে কি জানো ? ব্যবসায়ীর ছেলে জাত-ব্যবসায়ী তো আমি। উপহারের নামে আমি আসলে ব্যবসা করছি। ধারের ব্যবসা – স্‌স্‌স্‌ ... কাউকে বলো না যেন !'
'ধারের ব্যবসা ? এই দুর্ভিক্ষের দেশে ?'

বিস্ময়ে বৌয়ের কথা আটকে গেল গলায়। বাক্‌চাতুরিতে আর দুষ্টুমিতে স্বামী তার অনন্য, কিন্তু একের পর এক এত বিস্ময়ের ধাক্কা সে আর সামলাতে পারছে না।
'কিসের ধার ? কাকে ধার ?'
'বুঝলে না ? আল্লাকে ধার দিচ্ছি, প্রচুর লাভ হবে বৌ, গ্যারান্টিড। !'
'আল্লাকে ধার দিচ্ছ ? তওবা তওবা !'
'তওবা মানে ? আল্লা তো নিজেই আমাদেরকে ডেকে ডেকে ধার চাচ্ছেন !'
'আল্লা ডেকে ডেকে ধার চাচ্ছেন ? তওবা তওবা !'
'কিসের তওবা বৌ ? খুলে দেখ কোরাণ শরীফ -"এমন কে আছে যে আল্লাহকে দেবে উত্তম কর্জ, আর আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ বহুগুণ বেশি করে দেবেন।" '
'কি বললে ? আবার বলো তো ??'

"এমন কে আছে যে আল্লাহকে দেবে উত্তম কর্জ, আর আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ বহুগুণ বেশি করে দেবেন" – সুরা বাকারা ২৪৫ ।

'কি আশ্চর্য !! এই দুর্ভিক্ষের সময়ে কেউ কোরাণের এ-কথা দেশের সবাইকে বলে না কেন ?'

'বলা দরকার, রেডিও-টিভি-খবরের কাগজ, সব জায়গায় বলা দরকার । ঢাকায় ফিরে পড়ে দেখো সুরা হাদীদ আয়াত ১১, সুরা মুয্যাম্মিল আয়াত ২০ আর আত্ তাগাবুন আয়াত ১৭ – "আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও ... যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও তিনি তোমাদের জন্য তা দ্বিগুণ করে দেবেন ।" এই দশ ট্রাকের ধার দিচ্ছি, রোজ হাশরে বিশ ট্রাকেরও বেশি সওয়াব পাব । তার সবটাই তোমাকে দিয়ে দেব যাও !'

হেসে ফেলল বৌ - মনে মনে আবার স্বামীগর্বে গরবিনী হল সে । ছোটকে দেখে ছুটে এল মাতবর আর ইমাম, অনেক কথা হল তাদের মধ্যে । বৌ মুগ্ধ চোখে দেখতে লাগল মানুষের আনন্দ । ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন তুলে দেবার মতো আনন্দ আছে ? ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন তুলে দেবার মতো ইবাদত আছে ? দিগন্তে তখন সূর্য ডুবুডুবু, মন্দ মন্থরে সন্ধ্যা নামছে । চমক ভাঙল যখন স্বামী এসে বলল ঃ

'জানো, আমার দেখাদেখি অন্যেরাও কিছু পাঠাচ্ছে ।'

'আমার কিছু গয়না আছে । তা থেকে কিছু নাহয় ... ।'

'আচ্ছা, খুব ভালো হবে । এই না হলে আমার বৌ ! অন্য ট্রাকগুলো অন্যান্য গ্রামে গেছে – কাল আমরা সেসব জায়গায় যাব । আমি চাই আমার বৌ নিজের হাতে খাবার বিলোবে আর বাচ্চাদের কোলে বসিয়ে মুখে তুলে খাওয়াবে । ক্যামেরা এনেছি, তোমার বাচ্চা-খাওয়ানোর ছবি তুলব ।'

'না, ছবি তুলবে না ।'

'কেন ? ছবি তুলবে না – আশ্চর্য মেয়েমানুষ তুমি !'

'এ-সব ছবি তারাই তোলে যারা পত্রিকায় ছাপে প্রচারের জন্য । ছবি তুললে তোমারও সেই ইচ্ছে হবে ।'

'তথাস্তু । প্রচারের জঞ্জাল আমাদের দরকার নেই, ছবি ক্যান্সেল । যা হোক, রাতটা কাটাতে হবে ইমাম বা মাতবরের বাসায়, তোমার কষ্ট হবে না তো ?'

'না, কষ্ট হবে কেন ।'

'শোন । মন দিয়ে শোন ।'

বৌ মন দিয়ে শুনল, – এত মন দিয়ে সে কোনদিনই কারো কথা শোনেনি । অশরীরী এক দৃঢ়কণ্ঠে স্বামী ফিসফিস করে উঠল – 'আমাদের ঘরে দানাপানি থাকা পর্যন্ত মানুষের বাচ্চাকে না খেয়ে মরতে দেব না আমি ।'

কথাগুলো যেন বৌ-এর কল্জের ভেতরে ঢুকে গেল – শিউরে কাঁটা দিয়ে উঠল তার শরীর । স্বামীর হাত ধরে ফিসফিস করে বলল, 'মঙ্গা ফি'বছর থাকবে না । মানুষ আবার উঠে দাঁড়াবে, ফসল ফলাবে, আবার দু'বেলা দু'মুঠো খেয়েপরে ভালই থাকবে । তখন আবার আমরা হজ্ব করতে যাব ।'

"নিশ্চয়ই, অবশ্যই, ইন্শা আল্লাহ্ । হজ্বের তো বিকল্প নেই, সামনে বছরের বুকিং আমি দিয়েই এসেছি ।'

সুদৃঢ় কঠিন পদক্ষেপে স্বামী চলে গেল ট্রাকের কাছে । সামনে ধু-ধু খরা বন্ধ্যা জমি – ওপরে অবারিত আকাশ । ঝোপের ডালে উড়োউড়ি করছে একটা ফড়িং, মাটিতে ঘোরাঘুরি করছে নামহীন দু'টো পোকা আর পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে একদল পিঁপড়ে । কি যেন কি নিয়ে ওরা সবাই খুব ব্যস্ত ।

কোনদিন কি কোন পিঁপড়ে না খেয়ে মরেছে ? কোন ফড়িং বা পোকা ?

বৌ কল্পনায় দেখল এয়ারপোর্টে দুধ-রং ধবধবে সাদা কাপড়ে হাজার হাজার আনন্দিত হজ্বযাত্রী হুড়োহুড়ি করে প্লেনে উঠছে আর বুকভরা তৃপ্তিতে বলছে শুকুর আল্ হামদুলিল্লাহ !! ওদিকে দূরে দাঁড়িয়ে ছোট্ট দু'টো ক্ষুধার্ত ভাই-বোন হাত ধরাধরি করে করুণ চোখে তা দেখছে । ভাইটা আস্তে করে বলল – 'বড় হইয়া ত'রে হজে লইয়া যামু ।" দ্বিধাগ্রস্ত ছোট্ট বোনটা কি যেন ভাবল । তারপর ফিসফিস করে যেন নিজেকেই প্রশ্ন করল – "ওইহানে ভাত আছে ?"

পলকের জন্য আবারও তার মাথাটা টলে উঠল ।

মায়াময় গ্রামবাংলার প্রান্তে নেমে আসছে গ্রামবাংলার মায়াময় সন্ধ্যা । চমক ভাঙল যখন পেছন থেকে স্বামী এসে তার হাত ধরল । বৌ চোখ তুলে দেখল স্বামীর দু'চোখে জ্বলছে হাজার জোনাকি । সেই চোখ বৌয়ের দু'চোখে গেঁথে স্বামী বলল, 'জানো, নবীজী বলেছেন যার প্রতিবেশী না খেয়ে থাকে সে মুসলমান নয় । যে মুসলমানই নয় তার আবার হজ্ব কি ?'

তারপর বৌয়ের হাত ছেড়ে সে থমকে দাঁড়াল । পুরো নিঃশ্বাস বুকের ভেতরে টেনে একটু আটকে নিল যেন । তারপর দু'হাত সোজা ওপরে তুলে আকাশের দিকে মুখ তুলে সর্বশক্তিতে চিৎকার করে উঠল – 'লাব্বায়েক ... !!'

বৌয়ের ভেতরটা কেঁপে উঠে চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল অশ্রুধারা, মুখ দিয়ে অস্ফূটস্বরে বের হল – "লাব্বায়েক ! লাব্বায়েক !!"

সুদূর পশ্চিমে দিগন্তবিস্তৃত মরুকেন্দ্রে তখন কাবা শরীফের চারধারে জলদমন্দ্রে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে লক্ষ কণ্ঠের আকুতি – "লাব্বায়েক ... !!"

****

"যাহারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে আমি তাহাদিগকে ক্রমান্বয়ে পাকড়াও করিব এমন জায়গা হইতে যাহা তাহারা ধারণাও করিতে পারিবে না" (আল্ আরাফ ১৮২)।